৫ম খণ্ড

ইসলামপূর্ব যুগ থেকে নিকট অতীত

ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

অনুবাদ : আবু তালহা সাজিদ
শিহাবুদ্দীন খান



ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

[ইসলামপূর্ব যুগ থেকে নিকট অতীত]

পঞ্চম খণ্ড

ককেশাস

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

আফ্রিকা

মাকতাবাতুল হাসান

ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ (৫ম খণ্ড)
প্রথম প্রকাশ : মুহাররম-১৪৪২/সেপ্টেম্বর-২০২০
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.com
ISBN : 978-984-8012-60-4
Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ৩১০০/- টাকা মাত্র [৫ খণ্ড একত্রে]

Islami Itihash Sonkhipto Bissokosh (5th Part)
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, পঞ্চম খণ্ডের

সম্মানিত অনুবাদপর্ষদ—

- মাওলানা আবু তালহা সাজিদ
- মাওলানা শিহাবুদ্দীন খান

এবং সম্মানিত সম্পাদনা পর্ষদ—

- মুফতি তারেকুজ্জামান
- মাওলানা ইমরান রাইহান
- মাওলানা আব্দুর রহীম আল-আজহারী
- মাওলানা সদরুল আমীন সাকিব

সংক্ষিপ্ত সূচি

সূ চি প ত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-২৩

আরব দেশ

বিষয় | পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-৯১

বলকান

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ-১১৩

ককেশাস

অষ্টম অধ্যায়
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

নবম অধ্যায়
আফ্রিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ-১৫৫
ক্রুসেডার ঔপনিবেশকদের আগমনের পূর্বে ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-১৬৯

আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের অন্যায় দখলদারি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-১৭৫

আফ্রিকায় স্বাধীন রাষ্ট্র

এক. মুসলমান শাসিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহ

দুই. অমুসলিম শাসীত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহ

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

মানচিত্র সূচি

আরব দেশ

আরব জাতি টুকরো টুকরো হয়ে একুশটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। একুশটি রাষ্ট্র আরব ভূখণ্ডের সীমানা নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিয়েছে। আর আজ প্রয়োজনের সময় শত্রুরা সেই সীমানা কাজে লাগাচ্ছে।

উসমানি খিলাফতের পাঠ চুকতেই আরববিশ্ব ব্রিটিশ, ফরাসি ও ইতালিয়ান উপনিবেশের শিকার হয়। আরবরা তখন ঔপনিবেশের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রতিরোধের মুখে ঔপনিবেশিকরা পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয়। সে সময়ের আরবদের মাঝে ভাষা, জাতি, আকিদা-বিশ্বাসসহ আরও অনেক কারণে ঐক্য ছিল। ঔপনিবেশিকরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, আরবদের ঐক্যের কারণে আরববিশ্বে উপনিবেশ অব্যাহত রাখা, এমনকি দখলপদ্ধতি পরিবর্তনের ইচ্ছে করাও অসম্ভব। তারা নিশ্চিতভাবে জানত, এই ঐক্য মুসলিমদেরকে এক মহাশক্তিতে পরিণত করবে, যে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মুসলিমরা তাদের হারানো প্রভাব-প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে।

কারণ, প্রকৃতপক্ষে আরবরাই প্রথম ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেছিল, ইসলামকে ছড়িয়ে দিয়েছিল দিকে দিকে। আরবদের ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছিল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এসব কারণে ইসলামের শত্রুরা আরবজাতিকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। কিছু আরবদেশকে ছোট্ট পরিসরে, আর কিছু দেশকে বড় করে ভাগ করে ফেলে তারা। আরব উপসাগরের উপকূলীয় অধিকাংশ রাষ্ট্রের মতো ছোট দেশগুলোতে ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত করে, যাতে আরবজাতির মধ্য হতে কিছু সংখ্যক মানুষ অঢেল সম্পদের অধিকারী হয়, আর অন্য দেশগুলো হয় বড় আয়তন ও স্বল্প সম্পদের অধিকারী। ফলে আরবদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ও

জাতিবৈষম্য বাড়তে থাকে। এই হিংসা-বিদ্বেষ ও জাতিবৈষম্যই যুদ্ধের সূচনা ঘটায় ও আরবদেরকে ছিন্নভিন্ন করে।

শত্রুরা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি; আরববিশ্বের রক্ত ঝরানোর জন্য ঘাড়ের ওপর বিষফোঁড়ার মতো ইসরাইলকে এনে ঢোকায় ফিলিস্তিনে। ফিলিস্তিনকে পরিণত করে এক চির-অস্থিতিশীল জ্বলন্ত ভূখণ্ডে। ইসরাইল তার রাজধানীতে বসে আরববিশ্বে মোড়লগিরি শুরু করে। যারা ইসরাইলের অবাধ্য হয় কিংবা মতের বিরুদ্ধে চলে, তাদের ভাগ্যে নেমে আসতে থাকে চরম দুর্ভোগ।

জাজিরাতুল আরব

সৌদি আরব

প্রথম সৌদি সাম্রাজ্য

(১১৩৭-১২৩৩ হি./১৭২৫-১৮১৮ খ্রি.)

সৌদিদের বংশ-পরম্পরার মূলে রয়েছেন সউদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুকরিন। সউদের দাদা মুকরিন নাজদের হানিফা নামক অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। সউদরা সিরিয়ার দারাইয়া থেকে আরব সাগর হয়ে হানিফায় আগমন করেছিল। হানিফায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর তারা হানিফা উপত্যকাকে দারাইয়া নামে ডাকতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে এই দারাইয়া দিরিইয়াহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বাদশাহ সউদ আদ-দিরিইয়াহর[১] চারপাশে সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করতে শুরু করেন। সউদের পর তার ছেলে মুহাম্মাদ বিন সউদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ বিন সউদকেই সৌদি রাষ্ট্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। মুহাম্মাদ বিন সউদের শাসনকালেই শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। ইসলামি শরিয়ার বাস্তবায়ন ও মুসলিমবিশ্বে ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়া বিদআতের মূলোটপাটনের জন্য সালাফে সালেহিনের অনুসরণের আহ্বান জানান তিনি। মুহাম্মাদ বিন সউদ শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাবের দাওয়াতের ইসলামি নীতিমালাকে স্বাগত জানান এবং জাজিরাতুল আরবে এই আহ্বান ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ শুরু করেন। এজন্যই সৌদি রাষ্ট্রের দুটি দিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয়। তার পূর্বের চিন্তা, পরিবর্তন হয়ে ইসলামি চিন্তা রূপ নেয়।

সউদরা জাজিরাতুল আরবের অনেক অঞ্চলকে তাদের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়। শাইখ আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ বিন সউদ তার

---

১. আদ-দিরিইয়াহ : সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের নিকটবর্তী শহর। -সম্পাদক

পিতার রেখে যাওয়া ধারা অব্যাহত রাখেন। তার শাসনকালে রাষ্ট্রের সীমা বৃদ্ধি লাভ করে। আবদুল আজিজের পর সউদ বিন আবদুল আজিজের শাসনামলে সৌদি আরব অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সউদ বিন আবদুল আজিজের উপাধি সউদ আল-কাবির বা বড় সউদ। তার শাসনামলেই ওমান, ইয়ামেন, হিজায ও সমগ্র জাজিরাতুল আরব সৌদি আরবের অন্তর্ভুক্ত হয়। সৌদি আবরের সীমারেখা পৌঁছে যায় সুদূর সিরিয়ায়।

সউদ বিন আবদুল আজিজের শাসনামলের শেষদিকে উসমানি খলিফা মুহাম্মাদ আলি পাশা (মৃত্যু : ১৮১৯ খ্রি.) জাজিরাতুল আরবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সৌদি আরবে আক্রমণের নির্দেশ দেন। প্রথম আবদুল্লাহর শাসনকালে এই অভিযান পরিচালিত হয়। ১২৩৩ হিজরিতে (১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে) মুহাম্মাদ আলি পাশার বাহিনীর আদ-দিরিইয়াহয় প্রবেশের মধ্য দিয়ে প্রথম সৌদি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

দ্বিতীয় সৌদি সাম্রাজ্য

(১২৩৪-১২৮৯ হি./১৮১৯-১৮৭২ খ্রি.)

জাজিরাতুল আরবে মিশরীয় কর্তৃত্বের প্রভাব কমতে শুরু করে। একসময় মিশরীয় প্রভাব হিজাযের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। নাজদ থেকে প্রত্যাহৃত হয় তারা। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে কেবল নামকাওয়াস্তে মিশরীয় শাসন জারি থাকে। অবশেষে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে মিশরীয় বাহিনী হিজায ছাড়তে বাধ্য হয়। হিজাযের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে উসমানি শাসকদের অনুসারী অভিজাত পরিবারের ব্যক্তিরা। এরই মাঝে সৌদি আমিররা নাজদের ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি হতে শুরু করে। সৌদিদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে বিন রশিদ পরিবার তাদের রাষ্ট্র দখল করে নেয়। সৌদি পরিবারের যারা বেঁচে ছিল, তারা কুয়েতের সাবাহ-পরিবারের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিন রশিদের পরিবারের হাতে পরাজয় বরণ করার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় সৌদি সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় সৌদি সাম্রাজ্য

(১৩১৯ হি./১৯০১ খ্রি.)

দ্বিতীয় আবদুল আজিজ

সৌদি আমির দ্বিতীয় আবদুল আজিজ পুনরায় সৌদি কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার সংকল্প করেন। সে সময় জাজিরাতুল আরবের কর্তৃত্ব ছিল উসমানি ও ইংরেজদের হাতে। ইংরেজরা কুয়েত, বাহরাইন ও আরব সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণ করত। আর ইয়ামেন, হিজায ও নাজদ পরিচালিত হতো উসমানিদের আদেশে।

ইংরেজরা সৌদিদের সাহায্য করতে শুরু করে। এর বেশকিছু কারণ ছিল। তার মধ্যে একটি কারণ হলো, বিন রশিদ পরিবার—যারা ইতিপূর্বে সৌদিদের অধিকাংশ রাষ্ট্র দখল করে নিয়েছিল—উসমানি সালতানাতের আনুগত্য করত। আর সাবাহ-পরিবার আনুগত্য করত ইংরেজদের। এই সাবাহ-পরিবারের কাছেই সৌদিরা আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং সাবাহ-পরিবার সৌদিদের সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয় আবদুল আজিজ রিয়াদে আক্রমণ করেন এবং বিন রশিদ পরিবারের হাত থেকে রিয়াদ ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হন। সবকিছু বিন্যস্ত করে তিনি ১৩৩২ হিজরিতে (১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে) আল-আহসা[২] পর্যন্ত সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করেন। এরপর হাইলে[৩] বসবাসরত বিন রশিদ পরিবার ও তাদের সহযোগী উসমানিদের সাথে জোটবদ্ধ হয়।

এরই মাঝে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল বেজে ওঠে। উসমানিরা আবরদেশ ত্যাগ করে। ফলে বিন রশিদ পরিবার দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৩৪০ হিজরিতে দ্বিতীয় আবদুল আজিজ হাইলকে সৌদি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। সেই সাথে ইদরিসি ও গাইজ পরিবার কর্তৃক শাসিত আসিরসহ[৪] অন্যান্য অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হন।

---

২. **আহসা :** সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় একটি জেলা শহর। রাজধানী রিয়াদ থেকে দূরত্ব ৩২৮ কিলোমিটার। -সম্পাদক

৩. **হাইল :** নজদের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত সৌদি আরবের একটি শহর। -সম্পাদক

৪. **আসির প্রদেশ :** সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রদেশ। -সম্পাদক

১৩৪৯ হিজরিতে ইদরিসিদের আমির বাদশাহ আবদুল আজিজের কাছে সৌদি সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবেদন জানায়। সৌদি বাহিনী গাইজ পরিবারের শাসনাধীন অঞ্চলগুলোকেও সৌদি সাম্রাজ্যের অধীন করে নেয়। এ সময় হিজাযের শাসকশ্রেণি ও সৌদিদের মাঝে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। উসমানি খিলাফতের পতনের পর হিজাযের শরিফ হুসাইন নিজেকে খলিফাতুল মুসলিমিন দাবি করে। প্রথমে তার সাথে ইংরেজদের ভালো সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের সুবাদে শরিফ হুসাইন তার ছেলে আবদুল্লাহকে পূর্ব জর্দানের শাসক ও ফয়সালকে ইরাকের বাদশাহ বানাতে পেরেছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তার সাথে ইংরেজদের বিরোধ দেখা দেয়। অতঃপর সে আবদুল আজিজ আলে সউদকে তার হাতে বাইআত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠায়। এতে তার ও সৌদিদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সৌদিদের বিজয় ও সৌদি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। ১৩৫১ হিজরিতে রাজকীয় সৌদি আরব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়।

বাদশাহ আবদুল আজিজ তার শাসনামলে ইখওয়ানকেন্দ্রিক[৫] সমস্যার মুখোমুখি হন। ইখওয়ান ছিল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী একটি দল, যারা কট্টরপন্থা অবলম্বন করত। এই দলটি শহরের; এমনকি গ্রামেরও অনেক মুসলিমকে কাফের বলত এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। তারা আধুনিক সবকিছু; এমনকি আল্লাহ যা হারাম করেননি, সেসব জিনিসকেও প্রত্যাখ্যান করত। বাদশাহ আবদুল আজিজ তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, তাদের সব শক্তি গুঁড়িয়ে দেন। তারপর থেকে এই দলটি সৌদি আরবের নিয়মিত সীমান্তরক্ষী হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে।

বাদশাহ আবদুল আজিজ ১৩৭৩ হিজরিতে (১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে) ইনতেকাল করেন। ইনতিকালের পর তার ছেলে বাদশাহ সউদ বিন আবদুল আজিজ ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

সউদ বিন আবদুল আজিজ

সউদ বিন আবদুল আজিজের শাসনামলে তার ভাই ফয়সাল বিন আবদুল আজিজের উত্থান ঘটে। ফয়সাল বিন আবদুল আজিজকে কয়েকবার মন্ত্রিপরিষদ গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি

---

৫. এই ইখওয়ান রাজনৈতিক দল 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন' নয়। -সম্পাদক

তার ভাই বাদশাহ সউদের চেয়েও দক্ষ প্রমাণিত হন। একপর্যায়ে উলামায়ে কেরাম ও সউদ পরিবারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বাদশাহ সউদ বিন আবদুল আজিজকে পদচ্যুত করে তার ভাই বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আজিজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বাদশাহ সউদের শাসনামলেই আরবলিগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সৌদি আরবকে আরবলিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ

বাদশাহ ফয়সালের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। পেট্রোলই যেন সৌদি আরবের অর্থোপার্জনের একমাত্র উৎস না হয়, সেজন্য তিনি শিল্পায়নের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনেও কাজ করেছেন। অনেক স্কুল ও ভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত আরব-ইসরাইল যুদ্ধে বাদশাহ ফয়সাল বড় ধরনের অবদান রাখেন। বিশেষত যখন তিনি মুসলিম দেশগুলোর প্রতি পশ্চিমাদেরকে পেট্রোল না দেওয়ার আহ্বান জানান তখন ইরান ও পাশ্চাত্যের প্রভাবাধীন দেশ ব্যতীত, সবাই তার এই আহ্বানে সাড়া দেয়। আরব-ইসরাইল যুদ্ধ ও ইসরাইল কর্তৃক আরব ভূখণ্ড দখলের কারণে পাশ্চাত্যের রাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব পড়ে।

১৩৯৫ হিজরিতে (১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) বাদশাহ ফয়সাল তার ভাতিজা ফয়সাল বিন মুসাইদ বিন আবদুল আজিজের হাতে নিহত হন। তার মৃত্যুতে সমগ্র মুসলিমবিশ্বে শোকের ছায়া নেমে আসে। সে বছরই বাদশাহ ফয়সালের হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

বাদশাহ খালিদ বিন আবদুল আজিজ

১৩৯৫ হিজরিতে (১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) ফয়সাল বিন আবদুল আজিজের মৃত্যুর পর তার ভাই খালিদ বিন আবদুল আজিজ রাজ-ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি বেশিদিন দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। ১৪০২ হিজরিতে (১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে) অসুস্থ হওয়ার পরই তিনি ইনতেকাল করেন।

বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ

১৪০২ হিজরিতে (১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে) বাদশাহ খালিদ বিন আবদুল আজিজের মৃত্যুর পর তার ভাই ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। বাদশাহ ফাহাদ ক্ষমতায় আসার পর আবদুল্লাহ বিন আবদুল

আজিজকে ক্রাউন যুবরাজ ঘোষণা করা হয়। বাদশাহ ফাহাদই প্রথম 'সাহিবুল জালালাহ' বা 'মহামান্য বাদশাহ'-এর পরিবর্তে 'খাদিমুল হারামাইন শারিফাইন' বা দুই সম্মানিত স্থানের সেবক উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি দেশের নানা স্থানে নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটান এবং হারামাইন শারিফাইনের সীমানা বৃদ্ধি করেন।

ওমান সাম্রাজ্য

১১৫৪ হিজরি (১৭৪১ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে আজ পর্যন্ত ওমান শাসন করছে আবু সাইদ পরিবার। ওমানিরা ইতিহাসের নানা বাঁকে ইসলামের জন্য অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। চরম ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী পর্তুগিজদেরকে কঠিনভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। এ ছাড়াও পূর্ব-আফ্রিকার বিজয়সমূহ ও আফ্রিকার নানা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কারণে আজও মুসলিমরা তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে।

ওমানে ইসলামি বিজয়ের পর চারটি কাল অতিবাহিত হয়েছে। ১৩৫ হিজরি থেকে ৯১৪ হিজরি (৭৫৩-১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত ইবাদিরা[৬] ওমান শাসন করে। তারপর ৯১৩ হিজরি থেকে ১০৩৪ হিজরি (১৫০৭-১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত ওমানে পর্তুগিজদের দখলদারি বহাল থাকে। তারপর ইয়ারিবিরা পর্তুগিজদেরকে ওমান থেকে বিতাড়িত করে। তাদের বিরুদ্ধে ইমাম নাসির বিন মুরশিদের নেতৃত্বে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারপর নাসিরের চাচাতো ভাই সুলতান বিন সাইফ এসে পর্তুগিজদেরকে ওমান থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করেন। তারা কেবল পর্তুগিজদেরকে ওমান থেকে বিতাড়িত করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং পর্তুগিজ উপনিবেশিত পূর্ব-আফ্রিকা ও হিন্দুস্তান পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে। ইয়ারিবিরা পর্তুগিজদেরকে জানজিবার আইল্যান্ড, পেম্বা আইল্যান্ড ও সোমালিয়া থেকেও উৎখাত করতে সক্ষম হয় এবং হিন্দুস্তানের দেওদামান নামক স্থানে পর্তুগিজদের ওপর অর্তকিত হামলা চালিয়ে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ

---

৬. **ইবাদি বা ইবাদিয়্যাহ :** খারেজিদের একটি দল। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ বিন ইবাদ আত-তামিমির দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে ইবাদিয়্যাহ বলা হয়। ইবাদিয়্যাহরা নিজেদেরকে খারেজি হিসেবে মেনে নিতে চায় না। তবে বেশ কয়েকটি মাসআলায় খারেজিদের সাথে তাদের মিল রয়েছে। -সম্পাদক

সম্পদ নিয়ে ফিরে আসে। তারপর সুলতানের ছেলে সাইফ বিন সুলতান এসে পর্তুগিজদের থেকে মোম্বাসা[৭] শহর ছিনিয়ে নেন। সে সময় মোম্বাসা পূর্ব-আফ্রিকায় পর্তুগিজ উপনিবেশের রাজধানী ছিল। এ ছাড়া নব্বই হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী গঠন, বিশাল নৌবহর, নগর প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন দুর্গ ও কেল্লা নির্মাণ এবং জাবরিনে তালিবুল ইলমদের জন্য একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ছিল ইয়ারিবিদের নানা কীর্তির মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইয়ারিবিদের শাসনকালের শেষদিকে তারা দুর্বল হতে শুরু করে। একপর্যায়ে ফরাসিরা ওমানের শাসন-ক্ষমতা দখল করে নেয়। এরপর ১১৫৪ হিজরিতে (১৭৪১ খ্রিষ্টাব্দে) আবু সাইদ পরিবারের আগমন ঘটে। আবু সাইদ পরিবার ফরাসিদের হাত থেকে ওমানকে মুক্ত করেন। আবু সাইদ পরিবারের শাসনামলেই ওমানে ইংরেজ ও অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের আগমন ঘটে। সবশেষে ১৩৯০ হিজরিতে (১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে) ওমান স্বাধীনতা লাভ করে।

আবু সাইদ পরিবার ও আহমাদ আবু সাইদ

আবু সাইদ পরিবার ইয়ামেন থেকে হিজরত করে ওমানে এসে স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছিল। সাইফ ইবনে সুলতান তার এক ছেলেকে উপদেষ্টা হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। এই ছেলেই ছিলেন আহমাদ আবু সাইদ। সাইফ বিন সুলতান তাকে সোহার প্রদেশের প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। ফরাসিরা ওমান পর্যন্ত কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিল। তখন আহমাদ আবু সাইদ ওমানিদের মনোবল জাগিয়ে তোলেন। ওমানিরা কখনো কৌশল অবলম্বন করে, কখনো-বা যুদ্ধ করে ফরাসিদের দেশছাড়া করে। এভাবে ওমানে আবু সাইদদের শাসন শুরু হয়েছিল। কিন্তু তখন নানা দেশে বিভক্তি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন শাসকশ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল। (পরবর্তী এসব শাসনব্যবস্থা মিলেই সংযুক্ত আরব-আমিরাত গঠিত হয়।) এভাবে ওমানের শাসনব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। অবশেষে ইংরেজরা এসে সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

---

৭. **মোম্বাসা :** কেনিয়া উপকূলের একটি শহর। রাজধানী নাইরোবির পর এটি দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। -সম্পাদক

আবু সাইদ পরিবারের শাসনামলে পূর্ব-আফ্রিকায় ওমানিদের বড় ধরনের প্রভাব ছিল। এশিয়া অংশের ভূখণ্ড যখন হাতছাড়া হলো, তখন ওমানিরা সর্বশক্তি নিয়ে আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হয়। আফ্রিকা শিরোনামের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

১২৭২ হিজরিতে (১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) সাইয়িদ সাইদ বিন সুলতানের মৃত্যুর পরে ওমান সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক ভাগ ছিল বর্তমানের ওমান, আর দ্বিতীয় ভাগটি ছিল পূর্ব-আফ্রিকা। সাইদ বিন সুলতানের দুই ছেলে তিওয়াইনি ও মাজিদের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। তিওয়াইনি ওমান পরিচালনা করত, আর মাজিদ শাসন করত পূর্ব-আফ্রিকা। এই দ্বন্দ্ব ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের ওমান ও ওমানশাসিত আফ্রিকা অঞ্চলে কর্তৃত্ব বিস্তার করার সুযোগ করে দেয়। ইংরেজরা কিছু চুক্তি করতে শুরু করে, যার প্রেক্ষিতে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে কর্তৃত্ব বিস্তারে সক্ষম হয়।

এরচেয়েও মন্দ বিষয় ছিল, আবু সাইদরা দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর ১৩৩১ হিজরিতে ওমানে ইমাম পরিবার ফিরে আসতে শুরু করে। আবু সাইদ পরিবারের শাসনামলে যাদের আলো ছিল নিভুনিভু। এ সময় ওমানের এক অংশে কর্তৃত্ব করতে শুরু করে ইমামরা, আরেক অংশ আবু সাইদ পরিবারের নামে পরিচালিত হতে থাকে। ওমানে যাদের উপর কর্তৃত্ব চালাত ইংরেজরা।

ইংরেজরা একসময় আবু সাইদ পরিবারকে ইমামদের শাসিত অঞ্চল পর্যন্ত কর্তৃত্ব বিস্তৃত করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আবু সাইদ পরিবারকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে, যার মাধ্যমে আবু সাইদ পরিবার ইমামদের শাসিত ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আর এর মাধ্যমে ইংরেজরাও ওমানে পূর্ণরূপে কর্তৃত্ব বিস্তার করে। এরপর ১৩৯০ হিজরিতে (১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে) ওমান ইংরেজদের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

তারপর সুলতান কাবুস বিন সাইদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং সব ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের পথ তৈরি করতে শুরু করেন। ১৩৯১ হিজরিতে (১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে) ওমান আরবলিগে যোগদান করে। সুলতান কাবুসের পিতা সুলতান সাইদের শাসনামলের শেষদিকে দোহার প্রদেশে কম্যুনিজম আন্দোলন শুরু হয়। কম্যুনিস্টরা সারা পৃথিবীতে সে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল।

ওমানে লাগাতার আক্রমণ, নিরপরাধ মানুষ হত্যা এবং দোহারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য দোহারের বিদ্রোহীরা দক্ষিণ ইয়ামেনে ঘাঁটি বানিয়ে নিয়েছিল। প্রথমে সুলতান কাবুস বিদ্রোহীদের সঠিক পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান। কিন্তু বিদ্রোহীরা সুলতানের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, সারা বিশ্বের কম্যুনিস্টরা আরব উপসাগরে সমাজতান্ত্রিক কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য বিদ্রোহীদেরকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত। এই আন্দোলনের নাম শুরুতে ছিল 'দোহার লিবারেশন ফ্রন্ট'। পরবর্তী সময়ে কম্যুনিস্টরা এর নাম পাল্টে রাখে 'অ্যারাবিয়ান গালফ লিবারেশন ফ্রন্ট'। শেষপর্যন্ত ওমানের সেনাবাহিনী বিদ্রোহিদেরকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়।

ইয়ামেন

উসমানিরা ইয়ামেনের বিস্তৃত অঞ্চল তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব স্থায়ী হয়নি। ইয়ামেনের উত্তরাঞ্চল উসমানিদের অধীনে থাকা অবস্থাতেই উসমানি খিলাফতের পতন ঘটে।

ইয়ামেনের উত্তরাঞ্চল

ইমাম ইয়াহইয়া

ইয়ামেনে যখন উসমানিদের আগমন ঘটে, তখন জাইদি নামে একটি শিয়া দল সেখানে কর্তৃত্ব করত।

১৩২২ হিজরিতে (১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে) ইমাম ইয়াহইয়ার উত্থান ঘটে। তিনি ছিলেন কাসিম জাইদি পরিবার থেকে উদ্ভূত আলে হামিদুদ্দিনের উত্তরপুরুষ। ইমাম ইয়াহইয়া উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং বেশকিছু যুদ্ধে উসমানিদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করেন। ১৩২৯ হিজরিতে (১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানিরা সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য হয় এবং সন্ধিচুক্তিতে ইয়ামেনের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়। সন্ধির পর ইয়ামেনের সাথে উসমানি খিলাফাতের সম্পর্কের নিদর্শনস্বরূপ সানআয় একটি ছোট প্রতিরক্ষা ঘাঁটি টিকে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইয়ামেনে নির্মিত সেই প্রতিরক্ষা ঘাঁটিও পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

আসির ও নাজরানকে কেন্দ্র করে সৌদি ও ইয়ামেনের মাঝে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। উভয় দেশ আসির ও নাজরানে কর্তৃত্বের অধিক হকদার বলে দাবি করে। এই দাবিকে কেন্দ্র করে সৌদি ও ইয়ামেনের মাঝে

কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সৌদির বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। সৌদি বাহিনী ইয়ামেনের হাদিদা শহর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর সৌদি ও ইয়ামেনের মাঝে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়, নাজরান ইয়ামেনের অধীনে থাকবে, আর আসির থাকবে সৌদির অধীনে। চুক্তি অনুযায়ী যেসব অঞ্চল ইয়ামেনের দখলে এসেছিল, সৌদিরা সেসব অঞ্চল ত্যাগ করে।

ইমাম ইয়াহইয়া ১৩৬৭ হিজরি (১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত ইয়ামেন পরিচালনা করেন। একই বছর তিনি আবদুল্লাহ বিন আহমাদের ষড়যন্ত্রে গুপ্তহত্যার শিকার হন। আবদুল্লাহ বিন আহমাদ ছিল ইমাম বোর্ডের সদস্য। সে ক্ষমতার জন্য লালায়িত ছিল। আবদুল্লাহ বিন আহমাদ যুবরাজ ইমাম আহমাদকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু ইমাম আহমাদ তার হাত থেকে রক্ষা পান। তারপর ইমাম আহমাদ ও মন্ত্রী আবদুল্লাহর মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ইমাম আহমাদের বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

ইমাম আহমাদ

ইমাম আহমাদ আরব আন্দোলন সমর্থন করেন। ১৩৭৬ হিজরিতে (১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) মিশর ও সৌদি আরবের সাথে ইমামের ত্রিপাক্ষিক মৈত্রীচুক্তি হয়। ১৩৭৮ হিজরিতে (১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে) মিশর ও সিরিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র'-এর সাথে ইমাম আহমাদ একাত্মতা প্রকাশ করেন। ১৩৮১ হিজরিতে (১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে) সিরিয়া 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় এই মৈত্রীচুক্তি শেষ হয়ে যায়।

তার শাসনামলে ১৩৭৪ হিজরিতে (১৯৫৫ খিষ্টাব্দে) তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার বিদ্রোহ মাথাচাড়া দেয়। একপর্যায়ে তিনি তার ভাই আবদুল্লাহর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তার ভাই আবদুল্লাহ ছিল সেনাবাহিনী কর্তৃক সমর্থিত। তারপর কিছুদিন যেতেই ইমাম আহমাদের সমর্থনকারী ও তার ছেলে বদরের শক্তি একজোট হয়ে তাকে পুনরায় ক্ষমতায় নিয়ে আসে। বিদ্রোহে নেতৃত্ব দানকারীদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) ইমাম আহমাদ গুপ্তহামলার শিকার হন এবং আহত হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। সেই আঘাতের প্রভাবেই ১৩৮২ হিজরিতে (১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম আহমাদের ছেলে বদর তার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু বদরের শাসনকালের একসপ্তাহ না পেরুতেই বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ ২৬ সেপ্টেম্বরের 'ইমামত বাতিলকরণ ও গণতন্ত্র ঘোষণা বিপ্লব' নামে প্রসিদ্ধ।

একপর্যায়ে বিদ্রোহীদের মাঝে ব্যর্থতার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন বিদ্রোহীরা জামাল আবদুন নাসিরের কাছে সাহায্য চায়। জামাল আবদুন নাসির বিদ্রোহীদের প্রয়োজনীয় লোকবল ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। মিশরীয় বাহিনী ইয়ামেনের ভূমিতে আক্রমণ করে। ইমাম বদর তার সমর্থক গোত্রগুলোকে একত্র করেন। সৌদি আরবও ইমাম বদরকে সাহায্য করে। সে সময় মিশরের সাথে সৌদির সম্পর্ক ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। কারণ, জামাল আবদুন নাসির রাজতন্ত্র উৎখাত করে তার পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিল। রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার জন্যই সৌদি আরব ইমাম বদরকে সাহায্য করছিল।

ইয়ামেনি বাহিনী ইয়ামেনের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে অবগত থাকায় যুদ্ধে অনেক মিশরীয় সৈন্য নিহত হয়। ইয়ামেন প্রজাতন্ত্রের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি না থাকলে ইমাম বদর পুনরায় তার ক্ষমতা ফিরে পেত। কিন্তু এর মাঝে সৌদি সাহায্য বন্ধ হয়ে। ঠিক সেই সময়ে ১৩৮৭ হিজরিতে মিশরীয় বাহিনী চরমভাবে পরাজিত হওয়ায় এবং আরবভূমি দখলে ইসরাইলি আক্রমণের ফলে জামাল আবদুন নাসির ইয়ামেন থেকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

বিদ্রোহীরা ইয়ামেনের নেতৃত্বে আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। আবদুল্লাহ আস-সালাল উত্তর ইয়ামেন প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু ১৩৮৭ হিজরিতে (১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং বিচারপতি আবদুর রহমান রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৩৯৪ হিজরিতে (১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) ইয়ামেনে পুনরায় বিদ্রোহ শুরু হয়। আক্ষরিক অর্থে বলা যায়, সেনা-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাচ্যুত হয়। ইবরাহিম আল-হামিদি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করে চার বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। ১৩৯৮ হিজরিতে (১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) দক্ষিণ ইয়ামেনের রাষ্ট্রপতি সালিম রাবির ষড়যন্ত্রে ইবরাহিম হামিদি গুপ্তহত্যার শিকার হয়।

সালিম রাবি বিশেষ দূতের মাধ্যমে প্রাইভেট বিমানযোগে এডেন থেকে উত্তর ইয়ামেনের রাষ্ট্রপতির কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। সেটি ছিল একটি ব্যাগে। দূত ব্যাগটি খুলতেই বিস্ফোরিত হয়। ইবরাহিম আল-হামিদি ও দূত ঘটনাস্থলেই মারা যায়। উত্তর ইয়ামেন এই ঘটনার জন্য দক্ষিণ ইয়ামেনকে দায়ী করে এবং তাদের সাথে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করে। এরপর কর্নেল আলি আবদুল্লাহ সালিহ উত্তর ইয়ামেনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৪০৬ হিজরিতে (১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) নির্মিত মারিব বাঁধ ছিল আবদুল্লাহ সালিহের অন্যতম কীর্তি।

ইয়ামেনের দক্ষিণাঞ্চল

তিনটি অঞ্চল তথা এডেন, পশ্চিম প্রদেশ ও পূর্ব প্রদেশ মিলে দক্ষিণ ইয়ামেন। একসময় দক্ষিণ ইয়ামেন ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল। পরবর্তী সময়ে যখন উত্তর ইয়ামেন উসমানিদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, তখন এডেনও দখল করে নেয় উসমানিরা। কিন্তু উসমানিদের অবস্থান শক্ত হওয়ার আগেই ইংরেজরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নাম করে এডেন দখল করে নেয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল ইংরেজদের এডেন দখলের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অজুহাত। এডেন দখলের পর ইংরেজরা দক্ষিণ ইয়ামেনের গোত্রগুলোর মাঝে বিশৃঙ্খলা উসকে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে দক্ষিণ ইয়ামেনের পূর্ব ও পশ্চিম প্রদেশ পর্যন্ত কর্তৃত্ব বিস্তার করে ইংরেজরা।

একটি অবিভক্ত উপনিবেশ (ইউনাইটেড কলোনি) গড়ে তোলার জন্য ইংল্যান্ড দক্ষিণ ইয়ামেনের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের বেশকিছু প্রদেশ এক করে ফেলে। এই উপনিবেশ শুরুতে পরিচালিত হতো এডেন থেকে। পরবর্তী সময়ে ভারতের ইংরেজ শাসকের অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। তারপর ইংল্যান্ড থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের মনোভাব লক্ষ করে ১২৫৬ হিজরিতে (১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে) রয়েল কলোনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। তারপর ১৩৭৮ হিজরিতে (১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে) দক্ষিণ ইয়ামেনে ইংল্যান্ডের অধীনে সম্মিলিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। কিন্তু ইয়ামেনিরা এই শাসনব্যবস্থা মেনে নিতে পারেনি। উত্তর ইয়ামেনে সংঘটিত ১৩৮২ হিজরির (১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের) বিদ্রোহ ও জামাল আবদুন নাসিরের পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তি ইয়ামেনিদেরকে সম্মিলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে সাহস জোগায়।

১৩৮৭ হিজরিতে (১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) ইংরেজ দক্ষিণ ইয়ামেনকে স্বাধীনতা দেয়। আবদুল কাবি-মুকাবি এর প্রেসিডেন্ট হন। তারপর সালিম রাবির আগমন ঘটে। এই সালিম রাবিই উত্তর ইয়ামেনের শাসক হত্যায় জড়িত ছিল। ১৩৯৮ হিজরিতে (১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) পুনরায় বিদ্রোহ হয় এবং বিদ্রোহে সালিম রাবি ক্ষমতাচ্যুত হয়। বিদ্রোহের নেতৃত্বদানকারী আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ক্ষমতা গ্রহণে সহায়তা করে এবং রাশিয়ান বিমান তার অবস্থানকে শক্তিশালী করে তোলে।

তারপর ইয়ামেনে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। অভ্যুত্থানে আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল ক্ষমতাচ্যুত হন। আলি নাসির তার স্থলাভিষিক্ত হন। এভাবে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে থাকে ইয়ামেনে। অবশেষে ১৪০৬ হিজরিতে (১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে) আবু বকর আস-সাক্কাফ ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

ইয়ামেনের ঐক্য

দক্ষিণ ইয়ামেন স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই উত্তর ইয়ামেনের সাথে সংযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। স্বয়ং উত্তর ইয়ামেনও এই আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৩৯২ হিজরিতে (১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে) উত্তর ও দক্ষিণ ইয়ামেনকে সংযুক্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়, কিন্তু উভয় দেশের নেতৃবৃন্দ একমত হতে পারেন না। তারপর ১৪১০ হিজরিতে (১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে) উভয় দেশ এক হয়ে যায় এবং সানাকে নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী করা হয়। আলি আবদুল্লাহ সালিহ রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন আর আবু বকর আস-সাক্কাফ প্রধানমন্ত্রী হন। তারপর আবু বকর আস-সাক্কাফ পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চান। তারপর বিচ্ছিন্নতার দাবিকারী (যাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবু বকর আস-সাক্কাফ) এবং বিচ্ছিন্নতা প্রত্যাখ্যানকারী রাষ্ট্রপতি আলি আবদুল্লাহ সালেহের মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। আলি আবদুল্লাহ সালেহের বাহিনী জয় লাভ করে এডেনে ঢুকে পড়ে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ইয়ামেন সংযুক্ত হয়ে আছে।

হানিশ দ্বীপপুঞ্জকেন্দ্রিক[৮] জটিলতা

ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়া থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর আরব ভূখণ্ড ও আফ্রিকার স্থিতিশীলতা ধ্বংস করার জন্য ইসরাইল ও পাশ্চাত্য ইরিত্রিয়াকে সাহায্য করে। একদিকে তারা সুদানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহযোগিতা করতে থাকে, অন্যদিকে লোহিত সাগরে তাদের কর্তৃত্ব বিস্তার করার পরিকল্পনা করে। অর্থাৎ, ইরিত্রিয়াকে যেসব রাষ্ট্র নিজেদের প্রতিনিধি মনে করে, সেসব রাষ্ট্রের প্রভাব বৃদ্ধি করাই ছিল এর আসল উদ্দেশ্য। ইহুদি পরিকল্পনা, ইহুদি ও আমেরিকার অস্ত্র, ইহুদি সেনাবাহিনীর সরাসরি অংশগ্রহণে ইরিত্রিয়া হানিশের সবচেয়ে বড় দ্বীপটি দখল করে নেয়। বাবুল মান্দিব প্রণালি হয়ে ইরিত্রিয়া আরও কয়েকটি দ্বীপের দিকে অগ্রসর হয়, যে দ্বীপগুলো ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী ইয়ামেনের অন্তর্ভুক্ত।

বাবুল মান্দিব দখলের ঘটনায় সারাবিশ্ব মুখে কুলুপ এঁটে ছিল, যেন সবাই ইয়ামেনের ওপর ইরিত্রিয়ার এই আগ্রাসনের সমর্থন করছে। আমেরিকা ও ইসরাইল আন্তর্জাতিক সমঝোতাকারী হিসেবে বাবুল মান্দিব প্রণালির দ্বীপগুলোর ব্যাপারে ইরিত্রিয়ার পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আদালত রায় প্রদান করে ইয়ামেনের পক্ষে।

বাহরাইন

কাতার থেকে বসরা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে বাহরাইন বলা হতো। বর্তমানে যেসব দ্বীপ বাহরাইন নামে পরিচিত, সেই দ্বীপগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপর বাহরাইনের ভূখণ্ড সংকুচিত হতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত শুধু সেই দ্বীপগুলোই বাকি থাকে, যা নিয়ে আজকের বাহরাইন গঠিত হয়েছে।

হিজরির দশম শতাব্দীতে বাহরাইনে পর্তুগিজ দখলদারি শুরু হয়। পর্তুগিজ কর্তৃত্ব পৌঁছে যায় আরব সাগরে। উসমানিরা জাজিরাতুল আরবে তাদের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয়। আরব্য, উসমানি কিংবা পারসিক মুসলিমদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পর্তুগিজরা কখনো তাদের ভিত মজবুত করতে পারেনি। শুধু এতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং পর্তুগিজদের সাথে ইংরেজ এবং ড্যানিশরাও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। জাজিরাতুল আবর থেকে পর্তুগিজদের উৎখাত করার পেছনে বড় ধরনের ভূমিকা ছিল ওমানিদের।

---

৮. **হানিশ দ্বীপপুঞ্জ :** ইয়ামেনের অন্তর্গত একটি দ্বীপপুঞ্জ। -সম্পাদক

ওমান থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর যেসব অঞ্চলে পর্তুগিজ শাসন ছিল, সেসব অঞ্চল থেকেও তাদেরকে উৎখাত করা হয়।

১০১১ হিজরিতে (১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে) পর্তুগিজরা বাহরাইন থেকে বিতাড়িত হয়। পর্তুগিজ শাসন উঠে যাওয়ার সাথে সাথে বাহরাইনে পারসিক শাসন কায়েমের জন্য ইংরেজরা পারস্যকে সাহায্য করে। পারস্য তাদের আরব প্রতিনিধি হিসেবে বাহরাইনকে সাহায্য করতে শুরু করে। তারপর আস্তে আস্তে পারস্য দুর্বল হয়ে পড়ে। ১১৯৭ হিজরিতে (১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে) জুবারার যুদ্ধে আলে খলিফা বাহরাইনে অবস্থানরত পারসিক গভর্নরকে পরাজিত করে বাহরাইনের দ্বীপে প্রবেশ করে। ১২১৫ হিজরিতে (১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে) ওমানিরা বাহরাইনকে ওমানের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। বাহরাইনের শাসক শাইখ সুলাইমান বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন খলিফা সৌদি আরবের কাছে সাহায্য চান। তখন সৌদি আরব ইবনে আফিসানের নেতৃত্বে বাহিনী দিয়ে তাকে সাহায্য করে। শাইখ সুলাইমান বাহরাইন থেকে ওমানিদেরকে উৎখাত করেন। কিন্তু ইবনে আফিসান সাহায্য করতে এসে নিজেই বাহরাইন দখল করে বসে। তখন আলে খলিফা তার সৈন্যবাহিনী একত্র করে ইবনে আফিসানকে বাহরাইন থেকে তাড়াতে সক্ষম হয়। ইবনে আফিসান পালিয়ে কাতারে চলে যায়। পুনরায় বাহরাইনের ক্ষমতা ফিরে আসে আলে খলিফার হাতে।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন খলিফা বিন সালমানের শাসনামলে বাহরাইনে ইংরেজ কর্তৃত্ব বিস্তার লাভ করে। এমনকি ইংরেজরা শাসক নিয়োগ ও বরখাস্ত করার মতো বিষয়ও নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। শাইখ মুহাম্মাদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে তারা খলিফা পরিবারের ইসা বিন আলিকে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করে। ১৩৯১ হিজরিতে (১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে) স্বাধীনতা লাভ করার আগ পর্যন্ত বাহরাইনে ইংরেজ কর্তৃত্ব বহাল থাকে। শাইখ ইসা বিন সালমান বিন হামদ আলে খলিফার শাসনামলে বাহরাইন স্বাধীন হয় এবং আরবলিগে যোগদান করে।

ইরান বাহরাইন দখলের চেষ্টা চালায়। বাহরাইনে শিয়াদের আধিক্য থাকায় ইরান বাহরাইনকে ইরানেরই একটি অংশ বলে মনে করে। কিন্তু ইংরেজরা তা প্রত্যাখ্যান করে। যাতে আরবের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন না হয়ে যায়। বাহরাইনে ইরানের মাতৃভাষা প্রচার, ফারসি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং পরস্পরে দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও বাহরাইনের ছেলেদের ইরানে

পড়ার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আজও ইরান বাহরাইনকে নিজেদের দখলে নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু আরব দেশগুলো বাহরাইনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। বাদশাহ ফাহাদ সেতু এই সম্পর্ক উন্নয়নের অন্যতম নিদর্শন, যা সৌদি ও বাহরাইনের মাঝে সংযোগ তৈরি করে দিয়েছে। অনুরূপ 'অ্যারাবিয়ান গালফ ইউনিভার্সিটি' প্রতিষ্ঠা, যা সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত ও ওমানের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করেছে এবং বাহরাইনের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। বর্তমানে বাহরাইন একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

কাতার

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কাতার বাহরাইনেরই একটি অংশ ছিল। তারপর হিজরি অষ্টম শতাব্দীতে কাতার ওমানিদের পদানত হয়। তারপর ৯২২ হিজরিতে (১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে) পর্তুগিজরা কাতার দখল করে নেয়। পর্তুগিজ উপনিবেশের কিছুদিন অতিবাহিত হতেই উসমানি খলিফা সুলাইমান কানুনি সেনাপতি সুলাইমান পাশার নেতৃত্বে একটি নৌবহর প্রেরণ করেন। সুলাইমান পাশা পর্তুগিজদের কাতার থেকে বিতাড়িত করে কাতারসহ আরব উপসাগরীয় আরও কিছু অঞ্চল উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তারপর উসমানিদের প্রতিপত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ১০৮০ হিজরিতে (১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) তারা কাতার ত্যাগ করে।

তারপর আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মাদের শাসনামলে কাতার সৌদি আরবের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর দিরইয়ার পতনের মধ্য দিয়ে সৌদি-ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন খলিফা-পরিবার কাতারে কর্তৃত্ব বিস্তার করে। খলিফা-পরিবারের রাজধানী ছিল কাতারের জুবারায়। পরবর্তী সময়ে রাজধানী সরিয়ে বাহরাইনের রাজধানী মানামা দ্বীপে আনা হয় এবং খলিফা-পরিবার সানি-পরিবারকে কাতারে তাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে।

তারপর খলিফা-পরিবার ও সানি-পরিবারের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং দুই পরিবারের মাঝে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। ইংল্যান্ড এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে হস্তক্ষেপ করে এবং কর্তৃত্ব বিস্তার করে। সানি-পরিবার ও খলিফা-পরিবারের মাঝে একটি চুক্তি সংঘটিত হয় এবং সেই চুক্তির প্রেক্ষিতে কাতার বাহরাইন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

সানি-পরিবারের শাসনামল

অদ্যাবধি কাতারে সানি-পরিবারের শাসন বহাল রয়েছে। ইংরেজরা উসমানি খিলাফতকে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী উসমানিরা কাতারের সমস্ত অধিকার ছেড়ে দেয়। উসমানিদের চুক্তি করিয়ে ইংরেজরা ১৩৩১ হিজরিতে (১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে) কাতার দখল করে নেয়। সানি-পরিবারের শাইখ আবদুল্লাহ বিন কাসিম ইংল্যান্ডের সাথে কাতারের কর্তৃত্ব প্রদানের চুক্তি করতে বাধ্য হন। তার শাসনকালেই কাতারে প্রেট্রোল আবিষ্কার হয়।

কাতারে সানি-পরিবারের শাসন বহাল থাকে। কাতার ইংল্যান্ড থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৩৯১ হিজরিতে (১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে) কাতার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। শাইখ আহমাদ বিন আলির শাসনামলে কাতার, বাহরাইন ও কুয়েতকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

কাতারের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আমির ও ক্রাউন প্রিন্সের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে শাইখ আলি তার ছেলে আহমাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে আহমাদের চাচাতো ভাই খলিফা বিন হামদকে ক্রাউন প্রিন্স ঘোষণা করেন। শাইখ খলিফা বিন হামদই ছিলেন কাতারের প্রকৃত শাসক। ১৩৯১ হিজরিতে (১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে) তিনিই ইংল্যান্ড থেকে কাতারের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

১৩৯১ হিজরির (১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের) শেষদিকে খলিফা বিন হামদ এক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একক ক্ষমতা লাভ করেন এবং কাতার পরিচালনা করে যেতে থাকেন। খলিফা বিন হামদের দেশের বাইরে অবস্থানের সুযোগে তার ছেলে ক্রাউন প্রিন্স হামদ একপ্রকার অভ্যুত্থান ঘটিয়ে শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করে খলিফার আসনে সমাসীন হন।

সংযুক্ত আরব-আমিরাত

ওমানের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা উল্লেখ করেছিলাম, সংযুক্ত আবর-আমিরাত ছিল ওমানেরই একটি অংশ। তারপর ওমানিদের মাঝে বিভক্তি ও দুর্বলতা দেখা দিলে আমিরাত স্বাধীন হতে শুরু করে। একপর্যায়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে পরিণত হয়।

ওমানে আবু সাইদ পরিবারের শাসন শুরু হওয়ার পূর্বে আমিরাত ইয়ারেবিদের অধীনে পরিচালিত হতো। তারপর কাসিম বাহিনীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা বিপুল নৌবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। বর্তমানে যে ভৌগোলিক সীমাজুড়ে সংযুক্ত আবর আমিরাত প্রতিষ্ঠিত, কাসিমদের কমান্ডার রহমত বিন মাতর সেই ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আহমাদ আবু সাইদ তা সমর্থন করেন। রহমত বিন মাতর রাস আল-খাইমাহকে রাজধানী বানান।

তারপর ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের থাবা পড়ে আমিরাত ভূখণ্ডে। ইংরেজরা কাসিমদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। একসময় ইংরেজরা তাদের কর্তৃত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ১৩৩৫ হিজরিতে আমিরাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে ইংরেজরা একটি চুক্তি সম্পাদিত করে। সেই চুক্তিতে আমিরাত-ভূখণ্ডে ব্রিটিশ-নেতৃত্বের স্বীকারোক্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়।

ইংরেজরা কর্তৃত্ব দখল করে আমিরাত-ভূখণ্ডকে ভাগ করতে শুরু করে। পুরো আমিরাতকে সাতটি আমিরাতে ভাগ করে। আমিরাতগুলো এই : আবুধাবি, শারজাহ, দুবাই, রাস আল-খাইমাহ, ফুজাইরাহ, উম্ম আল-কোয়াইন ও আজমান।

১৩৯০ হিজরিতে (১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে) ইংরেজরা উপসাগর ত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার আগ পর্যন্ত ইংরেজ উপনিবেশ জারি ছিল। ইংরেজরা আমিরাত ত্যাগ করার পর সাত আমিরাত এক হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। কুয়েত, কাতার ও বাহরাইন আরব আমিরাতের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানায়। সাত আমিরাতকে সংযুক্ত করার ব্যাপারে শাইখ জাইদ বিন সুলতানের প্রচেষ্টা ছিল সবচেয়ে বেশি। এই ঐক্যবদ্ধ আমিরাতের নেতৃত্বের জন্য তাকেই নির্বাচন করা হয়। আমিরাত উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। সেই সাথে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়। বেশকিছু ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকল্পে আমিরাত কার্যকরী অর্থায়নে অংশগ্রহণ করে।

কুয়েত

বর্তমান যে ভূখণ্ডকে কুয়েত বলে অভিহিত করা হয়, অতীতে তার তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। বরং কেউ সেখানে বাস করত না। একসময় সাবাহ-পরিবার কুয়েতে আগমন করে এবং উসমানি খিলাফতের আনুগত্য ঘোষণা করে সেই বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে আবাস গড়ে তোলে। সাবাহ-পরিবারের সাথে খলিফা-পরিবার এবং জালাহমারাও আবাস গড়েছিল। কিন্তু পরে খলিফা-পরিবার পৃথক হয়ে কাতারে বসবাস শুরু করে। তারপর জালাহমা ও সাবাহ-পরিবারের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধের জের ধরে সাবাহ-পরিবার জালাহমাকে কুয়েত থেকে বিতাড়িত করে।

১১৬৮ হিজরিতে (১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে) পারসিকরা যখন উসমানিদের হাত থেকে বসরা দখল করে তখন কুয়েত গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। পারসিকরা চার বছর কুয়েত দখল করে রাখে। সে সময়ে ইংরেজরা ভারত যাওয়ার জন্য ভূমধ্যসাগর, তারপর বসরা, অতঃপর আরব উপসাগরের রুটের ওপর নির্ভর করত। ইংল্যান্ড বসরার পরিবর্তে কুয়েত হয়ে আরব উপসাগরে যাওয়া শুরু করে। এদিকে উসমানি খিলাফতের দুর্বলতা ও ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান শক্তির কারণে সাবাহ-পরিবারের শাসকগণ ইংরেজদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে। কিন্তু ইংরেজরা উসমানিদের সাথে এই ভূখণ্ড নিয়ে কোনো বিরোধে জড়ায়নি। কারণ, কুয়েত তখনও তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। মূলত ব্রিটেনের বিশেষ আগ্রহ ছিল পুরো উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতি।

তারপর শাইখ মুবারক আস-সাবাহের শাসন শুরু হয় এবং পূর্বের মতো ইংরেজদের প্রতি দুর্বলতা বহাল থাকে। ইংরেজরা সে সময়কে কুয়েতে কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করে। একই সময়ে উসমানিদের সাথে কুয়েতের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলতে থাকে। উসমানিরা পূর্বে কুয়েতকে বসরা-গভর্নরের অধীন করে দিয়েছিল।

তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে কুয়েত ইংরেজদের পক্ষ নেয়। ইংরেজরা কুয়েতে কর্তৃত্ব বিস্তার করে। ১৩৮১ হিজরিতে (১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে) ইংরেজরা কুয়েতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার আগ পর্যন্ত কুয়েত ইংরেজ কর্তৃক শাসিত হতে থাকে। শাইখ আবদুল্লাহ বিন সালিমের শাসনামলে কুয়েত স্বাধীনতা লাভ করে। ইরাকের রাষ্ট্রপতি আবদুল করিম কাসিম তখন ঘোষণা দেন যে, তিনি কুয়েতকে ইরাকের অন্তর্ভুক্ত করার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। কারণ, উসমানি খিলাফতের সময়ে কুয়েত বসরা-গভর্নমেন্টের অধীনে ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের ইরাককে হুমকি দেয় যে, কুয়েত দখলের যেকোনো চেষ্টা সে প্রতিহত করবে।

জামাল আবদুন নাসেরের হুমকিতে ইরাক তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। পেট্রোলের খনি ও তেল উৎপাদনে আরববিশ্বের মাঝে দ্বিতীয় কেন্দ্র হওয়ায় কুয়েত ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করে। অথচ কুয়েতের আয়তন যেমন ছোট, তেমনই অধিবাসীর সংখ্যাও কম। এ তেল-সম্পত্তির বদৌলতেই রাষ্ট্রটি সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি ভোগ করছে।

এরপর ১৪১১ হিজরিতে (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে) কুয়েতে ইরাকিদের আক্রমণ শুরু হয়। ইরাকের আলোচনায় আমরা এই যুদ্ধের কথা উল্লেখ করব। ১৪১২ হিজরিতে (১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে) কুয়েত স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমানে শাইখ জাবির আস-সাবাহ কুয়েত শাসন করছেন।

* * *

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইরাক

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানি খিলাফতের পরাজয়ের পর ইরাক ইংরেজ শাসনের অধীনে চলে যায়। উসমানিরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আরব ভূখণ্ড ত্যাগ করে। যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্রই আরবকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় মিত্রশক্তি। কিন্তু যথারীতি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে হেজাজের সম্ভ্রান্ত বাদশাহ ফয়সাল বিন হুসাইনকে ইরাকের শাসক বানিয়ে দেয়। এই বাদশাহ ফয়সাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষ নিয়েছিলেন।

ইরাকি জনগণ ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে। প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠতে শুরু করে দিকে দিকে। একাধিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, যার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৩৩৮ হিজরির (১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের) বিদ্রোহ। কিন্তু ইংরেজরা বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। ১৩৫১ হিজরিতে (১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে) ইরাকে ইংরেজ শাসনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। মূলত এই স্বাধীনতা ঘোষণা করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। কার্যত ইরাকে ইংরেজ শাসনই বহাল থাকে।

১৩৫২ হিজরিতে (১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) বাদশাহ ফয়সাল বিন হুসাইন মৃত্যুবরণ করেন। তার ছেলে গাজি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩৫৯ হিজরিতে (১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে) এক রহস্যময় দুর্ঘটনায় গাজি নিহত হন। গাজির চার বছর বয়সী সন্তান দ্বিতীয় ফয়সাল তার স্থলাভিষিক্ত হয়। ফয়সালের মামা আবদুল ইলাহকে তার অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়।

১৩৬১ হিজরিতে (১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে) সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ বকর সিদ্দিকির নেতৃত্বে আরেকটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। কিন্তু এর কিছুদিন পরই বকর সিদ্দিকি মৃত্যুবরণ করেন।

১৩৫৮ ও ১৩৬২ হিজরিতে (১৯৩৯ ও ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) আরও দুটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। বাদশাহ দ্বিতীয় ফয়সাল প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ১৩৬৩ হিজরিতে (১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে) ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৩৬৫ হিজরিতে (১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে) ইরাক বাগদাদ-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। বাগদাদ-চুক্তি মূলত ইংরেজ কর্তৃত্ব সুদৃঢ়করণ বলেই বিবেচিত হতে থাকে।

১৩৫৭ হিজরিতে (১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে) মিশর ও সিরিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বিপরীতে দ্বিতীয় ফয়সালের নেতৃত্বে ইরাক ও জর্দানে আবর ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু আরব ইউনিয়ন স্থায়িত্ব লাভ করেনি।

১৩৭৮ হিজরির (১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের) অভ্যুত্থানে ইরাকে রাজতন্ত্র বাতিল করা হয় এবং আবদুল কারিম কাসিমের নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইরাকে ইংরেজ নিয়ন্ত্রণের সমাপ্তি ঘটে। তারপর আবদুল করিম কাসিম এককভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকেন। আরবের সাথে ইরাকের সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইও শুরু হয়, যা ভয়াবহ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে পরিণত হয়। কুর্দিদের ওপর চলে নির্যাতনের স্টিম রোলার।

এরপরই ১৩৮২ হিজরিতে (১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) আরেকটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এই অভ্যুত্থানে আবদুল কারিম কাসিমের পতন ঘটে। আবদুস সালাম আরিফকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। আবদুল কারিম কাসিমকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এ সময় আরববিশ্বের সাথে ইরাকের সম্পর্ক ভালো হতে শুরু করে। আবদুস সালাম পূর্বের অভ্যুত্থানের ভুলগুলো শুধরে নিতে শুরু করেন। কিন্তু ১৩৮৫ হিজরির (১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের) বিমান দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু ঘটে।

এরপর তার ভাই আবদুর রহমান আরিফ রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার শাসনামলে ইরাকের অর্থনীতিতে অবক্ষয় দেখা দেয় এবং সামরিক বিভাগ দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর ১৩৮৮ হিজরির (১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের) এক অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। তারপর আহমাদ হাসান আল-বকর প্রেসিডেন্ট হন এবং সাদ্দাম হুসাইন তার ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

প্রকৃতপক্ষে সাদ্দাম হুসাইনই রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। ১৩৯৯ হিজরিতে (১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) সাদ্দাম হুসাইন একক ক্ষমতা অর্জন করেন। এরপর মিশর ও ইসরাইলের মাঝে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় ১৩৯৯ হিজরিতে বাগদাদে আরবের শীর্ষ সম্মেলন (আরবলিগ সামিট) অনুষ্ঠিত হয়। ওমান, সুদান ও সোমালিয়া ব্যতীত অন্যান্য আরব রাষ্ট্র মিশরের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। এভাবে মিশরের জন্য আরব সহযোগিতার দ্বার বন্ধ হয়ে যায়।

ইরাক-ইরান যুদ্ধ

(১৪০০–১৪০৮ হি./১৯৮০-১৯৮৮ খ্রি.)

সাদ্দাম হুসাইন ইরাককে ইরানের বিরুদ্ধে এক অনিয়ন্ত্রিত যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেন। আমরা পূর্বে ইরানের অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। ইসলামের শত্রুরা সাদ্দাম হুসাইনকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। শত্রুরা এ কাজের কিছু মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে যায়। সীমাহীন আশাও দেখতে পায় এই যুদ্ধের মাঝে। কিন্তু সবই ছিল আষাঢ়ে স্বপ্ন। মিলিয়ন ইরাকির মৃত্যু, দেশ ধ্বংস হওয়া এবং রাষ্ট্রের ওপর ঋণের বোঝা বৃদ্ধি ব্যতীত তেমন কোনো লাভই হয় না এই যুদ্ধে। বরং অবশেষে কুয়েতের আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ইরাক সব আশা ত্যাগ করে। সাদ্দাম হুসাইন প্রথমে স্বায়ত্তশাসন ও তেলের আয়ের কিছু অংশ প্রদানের মাধ্যমে কুর্দিদের বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি কুর্দিদের কঠোর শাস্তি দেন। অতঃপর ১৪০৮ হিজরিতে (১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে) কুর্দিদের ওপর বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটান।

আরব কো-অপারেশন কাউন্সিল

১৪০৯ হিজরিতে (১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) মিশর, ইরাক, ইয়ামেন, জর্দান আরব কো-অপারেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করে। আরব কো-অপারেশন কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের পরিকল্পনা প্রকাশ পেতে থাকে। এসব পরিকল্পনার মধ্য হতে ইরাক কর্তৃক উপসাগরীয় যুদ্ধ ও কুয়েত দখলের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি-পরিকল্পনা বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। জর্দান ও ইয়ামেন ইরাককে সহযোগিতা করার কথা বলে উৎসাহ দেয়। কুয়েত দখল জর্দানকে হিজায ও জাফা দখলের এবং ইয়ামেনকে সৌদির আসির দখলের পথ সুগম করে দেয়। এসব অঞ্চল পূর্বে জর্দান ও ইয়ামেনের অধীনে ছিল। বাদশাহ আবদুল আজিজ আলে সউদের শাসনামলে এই ভূখণ্ডগুলো সৌদি আরবের অধীনে চলে যায়। ইরাক, জর্দান ও ইয়ামেন মিশরের ভৌগোলিক গুরুত্ব ও অবস্থান অনুধাবন করে মিশরকেও তাদের দলে ভিড়াতে চায়। কিন্তু মিশর কুয়েতের ওপর ইরাকের এই স্বেচ্ছাচারী আক্রমণকে প্রত্যাখ্যান করে। উপসাগরীয় যুদ্ধ চলাকালীন আরব কো-অপারেশন কাউন্সিল বিলুপ্ত হয়।

উপসাগরীয় যুদ্ধ (গালফ ওয়ার)

(১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.)

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হওয়ার পর ইসলামের শত্রু ইউরোপিয়ান ও আমেরিকানরা মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য পূর্ণ অবসর পেয়ে যায়। তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া কিংবা তা দখল করা অথই সাগরে ঝাঁপ দেওয়ার নামান্তর। অথচ স্বয়ং মুসলিমদের হাতেই মুসলিমদের ধ্বংস করা সম্ভব। এজন্য শত্রুরা সাম্প্রতিক কালে উপনিবেশ-নীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সামরিক দখলদারির পরিবর্তে অর্থনৈতিক দখলদারি শুরু করেছে। এখন তারা সরাসরি যুদ্ধ ত্যাগ করে মুসলিমদের পরস্পরের যুদ্ধ লাগিয়ে দিচ্ছে।

শত্রুরা সাদ্দাম হুসাইনকে কুয়েতের বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছিল। পেট্রোলিয়াম (তেল) সম্পদের মাধ্যমে ইরাকের যে সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল, দীর্ঘ আট বছরের যুদ্ধে তা পুরোপুটি ধ্বংস হয়ে যায়। সে সময়ে যুদ্ধ করার মতো কোনো উল্লেখযোগ্য শক্তিই ছিল না। কুয়েতের সাথে ইরাকের সামরিক শক্তি তুলনা করার কোনো কারণ ছিল না তখন। তা ছাড়া কুয়েতের কখনো মনে হয়নি যে, ইরাক তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারে। কেননা ইরানের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কুয়েত ইরাকের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ইরাক মনগড়া অযৌক্তিক কিছু ইস্যু বানিয়ে নেয়। ১৪১১ হিজরিতে কুয়েতে আক্রমণ করে ইরাক। সাদ্দাম হুসাইন ভেবেছিল, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ন্যাটো তাকে সাহায্য করবে এবং ১৪০৮ সালে সংঘটিত কুর্দি-হত্যাকাণ্ডের মতো এবারও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু পাশ্চাত্য কুয়েতের ওপর ইরাকি আগ্রাসনকে প্রত্যাখ্যান করে। সাদ্দাম হুসাইন বুঝতে পারে, এই প্রত্যাখ্যান আন্তর্জাতিক চক্রান্ত-পরিকল্পনা।

সাদ্দাম হুসাইনের কুয়েত দখলের ও কুয়েতের সম্পদ ভোগের সুখ-স্বপ্ন টুটে যায়। ঘুম থেকে জেগে সে বুঝতে পারে, প্রতারণা করা হয়েছে তার সাথে। সব প্রতিশ্রুতি ধোঁকা বৈ কিছু ছিল না। আত্মরক্ষা ও বড় ভুল সংশোধনের পরিবর্তে সাদ্দাম হুসাইন তার অবস্থানে অনড় থাকেন।

চরমভাবে পরাজিত হয়ে সবকিছু হারানো পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যান। ১৪১২ হিজরিতে (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে) মিত্রশক্তি ইরাককে কুয়েত থেকে বের করে দেয়।

এই যুদ্ধের ফলে ইসলামের শত্রুদের কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধন হয় :

- উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহের আদর্শ ইসলামি অর্থনীতিকে আঘাত হানা।
- ইরাকি সামরিক শক্তি ধ্বংস করে দেওয়া, যা ইসরাইলের জন্য ঝুঁকির' কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
- ১৪০৮ হিজরিতে (১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে) রাবাত সম্মেলনে মুসলিম আবরবিশ্বের মাঝে সমঝোতা হওয়ার পর নতুন করে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করা।
- প্রতিরক্ষার নাম করে প্রতিবেশি উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোতে ন্যাটো বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
- বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ফিলিস্তিন আগ্রাসন থেকে সরিয়ে অন্য ঘটনার দিকে নিবদ্ধ করা।
- ইরাকি জনপদকে দুর্বল করে দেওয়া এবং সবচেয়ে বড় ইসলামি শক্তিতে পরিণত হওয়ার পর সেই শক্তিকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য অর্থনৈতিক ও খাদ্য অবরোধ চাপিয়ে দেওয়া। (দীর্ঘ দশ বছর এই অবরোধ অব্যাহত থাকে, যার বলি হয় ইরাকের সাধারণ জনগণ।)

ইরাকি জনগণকে দুর্বল করা, ইরাককে খণ্ডবিখণ্ড করা, উত্তরের কুর্দিদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে উসকে দেওয়া এবং দক্ষিণের শিয়াদের খেপিয়ে তোলার জন্য আমেরিকা অবরোধ তুলে নিতে গড়িমসি শুরু করে। এ সবকিছুই বিশ্ব-মুসলিমের সামনে ঘটতে থাকে। মুসলিমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়েছে, তারা এমন পরিণতি বরণ করার অপেক্ষায়ই ছিল।

২০০১ সালে ৯/১১-এর ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায়। তারপর ইরাকের দিকে অগ্রসর হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে, ইরাক সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয় এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। আরও দাবি করে, ইরাকের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে।

জাতিসংঘ অনুসন্ধানকারী দল পাঠায় ইরাকে। অনুসন্ধানকারী দলটি ইরাকের প্রতিটি পাথর পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে, কিন্তু তথাকথিত গণবিধ্বংসী অস্ত্রের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পায় না তারা। তারপরও আমেরিকা গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যাপারে গোঁ ধরে থাকে। ব্রিটেন ও স্পেনকে নিয়ে জোটবাহিনী গড়ে তোলে। গণবিধ্বংসী অস্ত্র ছাড়াও আমেরিকা ইরাকের স্বৈরশাসন ধ্বংস করে ন্যায় ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখায় ইরাকি জনগণকে।

২০/৩/২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা ও তার মিত্রবাহিনী ইরাকে আক্রমণ করে। ইরাকের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে বৈধ কিংবা অবৈধ—সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে।

৯/৪/২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ দখল করে নেয়। সারা দেশে যুদ্ধের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে। ১৪/১২/২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দাম হুসাইনকে বন্দি করে।

মিত্রশক্তি ইরাকের অবকাঠামো, বাগদাদের সভ্যতার নির্দশন, মানব ও ইসলামি ঐতিহ্য ধ্বংস করে দেয়। মসজিদ ধ্বংস করে এবং পেট্রোলসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করে নেয়। শিয়া ও সুন্নিদের মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। ইরাককে পরিণত করে এক উন্মুক্ত কারাগারে। সেখানে হত্যা, লুণ্ঠন ও নির্যাতনের ঘৃণ্য চর্চা চালায় তারা। মসজিদের ভেতরে নারীদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করে। এ সবের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরে পুরোনো ক্রুসেডের নতুন এক কালো অধ্যায়।

* * *

শাম দেশ (সিরিয়া)

উসমানি খিলাফত থেকে অপহৃত হয়ে ইউরোপিয়ান উপনিবেশের অধীনে যাওয়ার পূর্বে ইংরেজ ও ফরাসিরা শামে কর্তৃত্ব করে। আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়, বর্তমান লেবাননে বহুজাতিক সম্প্রদায়ের অবস্থানকে কাজে লাগায় ঔপনিবেশিকরা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে চলতে থাকা অনিঃশেষ দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করে তারা।

ফরাসিরা ম্যারোনাইটদের সাহায্য করে তাদেরকে কাছে টানে। এদিকে ইংরেজরা দরজি গোষ্ঠীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ফলে এই ভূখণ্ড সব সময় দাঙ্গাহাঙ্গামা ও গোলযোগে উত্তপ্ত হয়ে থাকে, যা নিয়ন্ত্রণ করা উসমানি সালতানাতের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। উসামানিরা শামকে দামেশক, হালাব, ত্রিপোলি ও সাইদা—এই চারটি প্রশাসনিক প্রদেশে বিভক্ত করে দেয়।

শামে বিদেশি উপনিবেশ ও বিভক্তিকরণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে শাম, ইরাক ও জাজিরাতুল আরব রাজনৈতিকভাবে কিংবা নামকরণের দিক থেকে উসমানিদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে উসমানি খিলাফত এই ভূখণ্ডে স্থির হতে পারেনি। এই সুযোগে ঔপনিবেশিকরা বিভিন্নভাবে উসমানি খিলাফত ও অধীনস্থ আবর রাষ্ট্রগুলোর মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটায়। এর মাঝে অন্যতম পদ্ধতি ছিল আরব জাতীয়তাবাদের আহ্বান।

উসমানি খিলাফত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আরব রাষ্ট্রগুলোকে নানারকম প্রতিশ্রুতি ও আশার বাণী শোনায় ঔপনিবেশিকরা। হিজাযের গর্ভনর শরিফ হুসাইনকে ঔপনিবেশিকরা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যদি সে তাদেরকে যথাসময়ে সাহায্য করে, তাহলে তাকে উসমানি খিলাফতের অধীন আরব ভূখণ্ডের বাদশাহ বানানো হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেই কথিত যথাসময় এসে পড়ে। শরিফ হুসাইন আরবের স্বাধীনতার বিষয়ে তার চিন্তাধারা প্রকাশ করে। আল-ফাতাত (তরুণ আরব সংঘ) তাকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করে। শরিফ হুসাইনকে

আরবের বাদশাহ বানানোর পরিকল্পনাও প্রকাশ করা হয়। ঔপনিবেশিকরা এই পরিকল্পনা প্রচারে সহযোগিতা করে। ঔপনিবেশিকদের এই সহযোগিতা মূলত শরিফ হুসাইনের জন্য ছিল না; বরং এটা ছিল আরববিশ্বে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য। তাদের দৃষ্টিতে যখন শরিফ হুসাইনের কাজ শেষ হয়ে যাবে, যখন পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন তাদের প্রথম বলি হবে সে। কার্যত উসমানি খিলাফতের পরাজয় ও আরব ভূখণ্ড ঔপনিবেশিকদের দখলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। প্রথমে ঔপনিবেশিকরা আরব ভূখণ্ডে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য শরিফ হুসাইনকে সম্মুখভাগে রাখে। এদিকে শরিফ হুসাইনের ছেলে ফয়সালকে শাম শাসনের জন্য নির্ধারণ করে।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা এ সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসে। তারা বুঝতে পারে, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শরিফ ও তার পরিবারকে এত উপরে তোলার প্রয়োজন নেই। বরং এতে পরিকল্পনা পাল্টে তাদের জন্য অকল্যাণ ডেকে আনতে পারে। কারণ, ফয়সালকে সিরিয়ার জন্য নিযুক্ত করা হলে সিরিয়ার সব প্রদেশ এক হয়ে যাবে। তাই তারা পরিকল্পনা করে, ফয়সালকে ইরাকের জন্য নির্ধারণ করবে এবং পূর্ব জর্দানকে শামের অঙ্গরাজ্য বানিয়ে আমির আবদুল্লাহ বিন শরিফকে তার দায়িত্ব দেবে। তাতে শরিফ হুসাইনের ও তার পরিবারের কর্তৃত্ব বাগে আনা যাবে; একই সময়ে ঔপনিবেশিকদের কর্তৃত্ব আরও ব্যাপক আকারে বিস্তৃত হবে।

পথ পরিষ্কার হতেই ঔপনিবেশিকরা তাদের আসল রূপ প্রকাশ করে এবং ফসল ঘরে তোলা শুরু করে। প্রথমেই তারা শরিফ হুসাইনকে দুর্বল করে দিতে সৌদিদের শরিফ হুসাইনের বিরুদ্ধে সাহায্য করে। শরিফ হুসাইন হিজায হারিয়ে বসে। (হিজায ছিল শরিফ হুসাইনের মূল ঘাঁটি। হিজায থেকেই পুরো আরবে তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব বিস্তৃত হতো।)

দুদিন আগে যে শক্তি ছিল আবরবিশ্বে ঔপনিবেশিকদের প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম, সেই শক্তির সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করা থেকে বেঁচে যায় ঔপনিবেশিকরা। এরপর ইরাক ও পূর্ব জর্দান প্রদেশ ছাড়া আরবের অন্য কোথাও শরিফদের কোনো অস্তিত্ব বাকি থাকে না। কিন্তু এই দুই শাসনব্যবস্থায়ও তারা বিদেশি কর্তৃত্বের অনুগত হয়েই টিকে থাকে। এভাবে শরিফদের থেকে সব ধরনের ঝুঁকির সম্ভাবনা শেষ করে দেয় ঔপনিবেশিকরা। তারা বিভক্তির রাজনীতি (ডিভাইড এন্ড রুল) ছড়িয়ে

দিতে থাকে দেশে দেশে। আরবের জন্য এই কৌশল প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতিরোধের কোনো পথও বাকি থাকে না তাদের। এই অংশে আমরা শামে ঔপনিবেশিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করব।

শামের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্তির শুরুতে দুই প্রদেশে দুটি উপনিবেশ কর্তৃত্ব করে। একটি ছিল ফরাসি উপনিবেশ, যা উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করত। আর অন্যটি ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ, যা দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করত। ফরাসিরা তাদের অধীনস্থ অঞ্চলে 'ডিভাইড এন্ড রুলের' চর্চা করে। এই উদ্দেশ্যে ফরাসিরা গ্রেট লেবানন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়, যার বীজ ছিল ম্যারোনাইটরা।

উসমানি খিলাফতের আমল থেকেই ফরাসিদের সাথে এই ম্যারোনাইটদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। তাই ফরাসিরা তাদেরকে সিরিয়া থেকে ভিন্ন একটি সামন্তে পরিণত করে গঠন করে লেবানন সাম্রাজ্য। শুধু সিরিয়াকে বিভক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি ফরাসিরা; বরং সিরিয়ার বাকি ভূখণ্ডকে আরও কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করে। রাষ্ট্রগুলো হলো : দামেশক, হালাব, আলাওয়েটস, ও জর্দান সীমান্তের দরজ রাষ্ট্র। এই বিভক্তি ঘটেছিল সানজাক-ই আলেকজান্দ্রিয়া আতাতুর্কের হাতে তুলে দেওয়ার পরে।

এর মাঝে ইংরেজরা তাদের অধীনস্থ অঞ্চল ফিলিস্তিনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। এক ভাগ তার আপন নাম নিয়ে টিকে থাকে। বেলফোর ঘোষণা বাস্তবায়িত করতে ইংরেজরা সেই ভাগকে ইহুদিদের মাতৃভূমি বানিয়ে দেয়। আর অন্য ভাগটি হলো পূর্ব জর্দানের আমিরাত, যাতে ইংরেজরা আবদুল্লাহ বিন শরিফ হুসাইনকে আমির বানিয়েছিল।

ফরাসিরা শামের যে ভূখণ্ডে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, তাতে তারা তুমুল প্রতিরোধের মুখে পড়ে। ফরাসি উপনিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই বিদ্রোহগুলোর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিরিয়ায় ১৩৩৮ হিজরির (১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের) ইবরাহিম হাতানুর বিদ্রোহ। ১৩৩৪-১৩৪৬ হিজরির (১৯১৬-১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের) মাঝে সুলতান আল-আরতাসের নেতৃত্বে পরিচালিত পাহাড়ের বিদ্রোহ ছিল সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ।

অনেক ঔপনিবেশিকদের দুর্বল করে দেওয়ার পেছনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বড় ধরনের ভূমিকা ছিল। যেসব দেশে বিদেশি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল, সে দেশগুলোতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল মুসলিমদের। অধিবাসীদের মাঝে মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাক কিংবা না থাক, মুসলিমদের ভূমিকাই ছিল বড়। কারণ, মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস অমুসলিমদের নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও মুসলিমদের এই বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত হয় এবং উপনিবেশের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে। সিরিয়ায় যা ঘটেছে, তাই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্যারিস জার্মানির পদানত হয় এবং ফরাসিরা দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও মিত্রশক্তি পরবর্তী সময়ে জার্মানিকে পরাজিত করে ফ্রান্সকে উদ্ধার করে, তারপরও ফ্রান্স যুদ্ধের আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারেনি। অবশেষে ১৩৬৬ হিজরিতে (১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) লেবানন ও সিরিয়া সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় ফরাসিরা।

সিরিয়া

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সিরিয়ার বাকি অঞ্চল থেকে লেবানন ও আলেকজান্দ্রিয়া আলাদা হওয়ার পর ফরাসিরা সিরিয়াকে কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করে ফেলে। কিন্তু এসব রাষ্ট্রের শাসকগণ এই বিভক্তিকে অস্বীকার করে। নিজেদের ইচ্ছাতেই একরাষ্ট্র হওয়ার ঘোষণা দেয় তারা।

১৩৬৬ হিজরিতে (১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) সিরিয়া ফরাসিদের দখল থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। সিরিয়াকে মনে করা হয় শামের উত্তরাধিকার, আর অন্যান্য রাষ্ট্রকে শামের হারানো সম্পদের অংশ বলে বিবেচনা করা হয়। স্বাধীন সিরিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিল শুকরি আল-কুয়াইতলি। তারপর ১৩৬৮-১৩৬৯ হিজরির (১৯৪৯-১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের) মাঝে সিরিয়ায় তিনটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। প্রথমে হুসনি আল-জাইমের অভ্যুত্থান, তারপর সামি আন-নাদি এবং আদিব আশ-শিশাকলির অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। তারপর ১৩৭৩ হিজরিতে (১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে) সাংবিধানিক জীবনাচার ও নির্বাচন ফিরিয়ে আনতে ফয়সাল আল-আতাসির নেতৃত্বে সংঘটিত হয় সামরিক অভ্যুত্থান। অভ্যুত্থানের পর প্রথমে হাশিম আল-আতাসি গণপ্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। এরপর ১৩৭৫ হিজরিতে (১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে শুকরি আল-কুয়াইতলি পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।

১৩৭৫ হিজরিতে (১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) মিশর ও সিরিয়ার মাঝে আরব ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই ঐক্যের মাধ্যমে জামাল আবদুন নাসেরের রাষ্ট্রপতিত্বে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র মাত্র চার বছর টিকে থাকে। ১৩৮১ হিজরিতে (১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে) সিরিয়ায় আরেকটি অভ্যুত্থান হয় এবং অভ্যুত্থানে নাজিম আল-কুদসি রাষ্ট্রপতিত্ব লাভ করে। সিরিয়ায় এভাবে একের পর এক অভ্যুত্থান হতেই থাকে। ১৩৮১ হিজরির শেষদিকে আরও একটি অভ্যুত্থান হয়, কিন্তু নাজিম আল-কুদসি তার পদে বহাল থাকে। মন্ত্রণালয়ে পরিবর্তন আসে। পূর্ববর্তী অভ্যুত্থানের নেতাদেরকে দেশান্তর করা হয়। তারপর বিচ্ছিন্নবাদীদের নেতারা আবার দেশে ফিরে এসে ১৩৮২ হিজরিতে নতুন করে অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপর ১৩৮২ হিজরির (১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের) শেষদিকে আরেকটি অভ্যুত্থান হয় এবং লুআই আতাসির নেতৃত্বে একটি বিপ্লব-পরিষদ গঠন করা হয়। লুআই আতাসি পুনরায় মিশরের সাথে ঐক্য স্থাপনের এবং ইরাককেও এই ঐক্যে আনার চেষ্টা করে।

কিন্তু কিছুদিন পর ১৩৮৩ হিজরিতেই (১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দেই) পিপলস পার্টির নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। তাদের মধ্য হতে আমিন হাফিজ ক্ষমতা গ্রহণ করে। তারপর ১৩৮৬ হিজরির (১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের) বাথ পার্টির একটি শাখার মাধ্যমে আরেকটি অভ্যুত্থান হয় এবং নুরুদ্দিন আতাসি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয়। তারপর প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদ ১৩৯০ থেকে ১৪২০ হিজরি (২০০০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত এককভাবে কর্তৃত্ব করে। এরপর হাফিজ আল-আসাদের পুত্র বাশার আল-আসাদ তার স্থলবর্তী হয়।

লেবানন

১৩৬৬ হিজরিতে (১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) যখন লেবানন ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা লাভ করে, তখন বাশারা আল-খুরি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ লাভ করে। ১৩৭১ হিজরি পর্যন্ত সে এই পদে বহাল থাকে। লেবাননের যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হলো, লেবানন নানা ধর্মে বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি রাষ্ট্র। লেবাননের জনগণের মধ্যে শিয়া ২৮%, ম্যারোনাইট ২৪%, সুন্নি ১৯%, অর্থোডক্স ৯%, দরজি ৬%, ক্যাথলিক ৬% এবং আর্মেনিয়ান ৫%।

ফরাসিরা লেবানন সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল কেবল খ্রিষ্টানদের কর্তৃত্ব করার জন্য। আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়, শুধু ম্যারোনাইটদের জন্য। ফরাসিরা লেবাননের রাজনীতির বিন্যাস করেছিল এভাবে যে, রাষ্ট্রপতি হবে ম্যারোনাইট, প্রধানমন্ত্রী সুন্নি, প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার শিয়া, সুপ্রিম কমান্ডার ও গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হবে ম্যারোনাইট, আর চিফ অব স্টাফ হবে দরজি। পার্লামেন্ট ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদ বণ্টিত হয়েছিল বিভিন্ন মুসলিম ও খ্রিষ্টান গোত্রগুলোর মাঝে। কিন্তু যখন গণপ্রজাতন্ত্রী লেবানন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন লেবানন একটা টাইমবোমাতে পরিণত হলো। যা যেকোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

প্রতি ছয় বছর পর নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নিয়ম করা হয়। ১৩৭১ হিজরিতে (১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে) কামিল শামউন লেবাননের রাষ্ট্রপতি নিবাচিত হয়। তার মেয়াদ শেষে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এই পদ্ধতি পরিবর্তনের চেষ্টা করে সে। এই কাজ করতে গিয়ে তাকে বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়। ১৩৭৮ হিজরিতে (১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে) যখন কামেল শামউন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চায়, তখন গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠার উপক্রম হয়। কিন্তু আল্লাহ সে সময় লেবাননকে রক্ষা করেন। যুক্তরাষ্ট্র লেবানন ত্যাগ করে চলে যায়।

১৩৭৮ হিজরিতে ফুয়াদ শিহাব নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়। তারপরই ১৩৮৪ হিজরিতে (১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) রাষ্ট্রপতি চার্লস হ্যেলু দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। চার্লস হ্যেলুর আমলেই ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ৬৭-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহুদিদের দখলীকৃত অঞ্চল থেকে বিতাড়িত ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে লেবাননে। তারপর ১৩৮৯ হিজরিতে (১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) লেবাননের প্রধানমন্ত্রী রশিদ কারামি প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরের সাথে 'কায়রো এরেজমেন্ট' চুক্তি করে। কায়রো এরেজমেন্ট চুক্তিতে লেবাননে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য শরণার্থী শিবির তৈরি করার কথা উল্লেখ করা হয়।

তারপর ১৩৯০ হিজরিতে (১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে) সুলাইমান ফ্রেইঙ্গ রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করে। তার শাসনামলে লেবাননে ফিলিস্তিনি মুভমেন্ট এবং সীমান্তে ইহুদিদের ওপর আত্মঘাতী হামলা বেড়ে যায়। লেবাননে ফিলিস্তিনি শক্তি বাড়তে থাকে। এমনকি বলা হতে থাকে, লেবাননই ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্র ছিল। লেবানিজ সরকার উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

অক্ষম হয়ে পড়ে। ইসরাইল লেবাননে গেরিলা হামলা চালাতে শুরু করে। ইসরাইলি গোয়েন্দা বাহিনী 'পিএলও' বা প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার নেতাদের ওপর গুপ্তহত্যা চালাতে থাকে। পুরো লেবানন অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।

লেবাননের গৃহযুদ্ধ

(১৩৯৫ হিজরি/১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)

১৩৯৫ হিজরিতে লেবাননের বিভিন্ন দলের মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। খ্রিষ্টানরা লেবাননে ফিলিস্তিনিদের বড় ধরনের ক্ষমতা অনুভব করে, যা অন্য কেউ বুঝতে পারে না। এই সময়ে লেবাননের মুসলিমরা যেমন ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করতে থাকে, তেমনই যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল লেবাননে ফিলিস্তিনিদের অবস্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ফিলিস্তিনিদের লেবাননে অবস্থান ইহুদিদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তাই লেবাননে গৃহযুদ্ধ লাগানোর পেছনে ইসরাইল ও পাশ্চাত্য দেশগুলো বড় ভূমিকা পালন করে।

লেবাননের গৃহযুদ্ধের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য দামেশকে ১৩৯৬ হিজরিতে (১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) আরবদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সিরিয়ান সেনাবাহিনীকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য লেবাননে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৩৯৬ হিজরিতে ইলিয়াস সার্কেস লেবাননের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়। ১৩৯৭ হিজরিতে (১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইসরাইল হঠাৎ লেবাননে আক্রমণ করে দক্ষিণ লেবানন দখল করে নেয়। পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। প্রতিটি দলের মাঝে দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে সিরিয়ান বাহিনী লেবাননে প্রবেশ করে ফিলিস্তিনি বিদ্রোহী ও বিদ্রোহীদের সাহায্যকারী বিভিন্ন মুসলিম দলকে দমন করার জন্য। সিরিয়ান বাহিনী তাদের মিশনে সফল হওয়ার পর ফিলিস্তিনিরা ও অন্যান্য মুসলিমরা সিরিয়াকে সাহায্য করার ঘোষণা দেয়। সিরিয়ান বাহিনী খ্রিষ্টান মিলিশিয়াদের দিকে অগ্রসর হয়।

খ্রিষ্টান মিলিশিয়ারা ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চায়, কিন্তু ইসরাইলের কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য করার জন্য ইউরোপ কিংবা যুক্তরাষ্ট্র কিছুই করে না মিলিশিয়াদের জন্য। অবশেষে সত্যিসত্যিই খ্রিষ্টান

মিলিশিয়ারা ইহুদিদের সাথে যুক্ত হয়। ইহুদিরা এটাকে লেবাননের অবস্থা আরও শোচনীয় করার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। ইহুদিরা খ্রিষ্টান মিলিশিয়াদের প্রশিক্ষণ দেয়। সিরিয়ান সেনাবাহিনী, ফিলিস্তিনি ও লেবাননের মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তারা আধুনিক আমেরিকান অস্ত্র দিয়ে মিলিশিয়াকে সাহায্য করে।

লেবাননের পরিস্থিতি ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ে। ম্যারোনাইট ও খ্রিষ্টানরা লেবাননে তাদের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে না পেরে ইসরাইলকে সরাসরি হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায়। ইহুদিরা তাদের আহ্বানে সাড়া দেয়, যা তাদেরকে আরও বেশি ভূখণ্ড দখল ও মুসলিম নিধনে সাহায্য করে। ১৪০২ হিজরিতে (১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে) ইসরাইল লেবাননে আক্রমণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ক্লাস্টার বোমা ও আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করে।

ইহুদিরা বৈরুত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বৈরুতকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। পূর্বাঞ্চল ছিল খ্রিষ্টানদের আর পশ্চিমাঞ্চল ছিল মুসলিমদের। ইহুদিরা বৈরুতে পৌঁছতেই খ্রিষ্টানরা পূর্বাঞ্চলের সব প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে দেয়। ইহুদিরা পূর্ব-বৈরুতে ঢুকে পড়ে। কিন্তু মুসলিমরা পশ্চিম-বৈরুতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইহুদিদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেওয়ার জন্য মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সিরিয়ান বাহিনীর সাহায্যপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনি ও লেবানিজ মুসলিমদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় ইসরাইলের। ইসরাইলরা আর এগিয়ে যেতে পারে না।

ইহুদিরা লেবানন ধ্বংস করার পর এবং তাদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করার পর বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ফিলিস্তিনিরা লেবানন ত্যাগ না করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয় ইসরাইল। কিন্তু সর্বশেষ শক্তি থাকা পর্যন্ত ফিলিস্তিনিরা এই হুমকি প্রত্যাখ্যান করে। তখন এই দায়িত্ব পালনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আগমন ঘটে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র লেবাননে পা রাখতে না রাখতেই ফিরে যায়। সে সময় বশির আল-জামিল লেবাননের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। (বশির আল-জামিল ছিল খ্রিষ্টান কাটায়েব পার্টির একজন নেতা। এই পার্টি ইসরাইলকে লেবাননে আক্রমণ করার আহ্বান জানায়।) লেবানিজরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ইসরাইল যে বছর লেবাননে আক্রমণ করে, সে

বছরেই বশির আল-জামিল আততায়ীর হাতে নিহত হয়। এরপর বশির আল-জামিলের ভাই আমিন আল-জামিল রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করে।

ইসরাইল বশির আল-জামিলের হত্যাকাণ্ডকে কাজে লাগায়। পশ্চিম-বৈরুতের সাবরা ও শাতিলায় ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে গণহত্যায় খ্রিষ্টান কাটায়েব পার্টি ইসরাইলকে সাহায্য করে। ইসরাইল কাটায়েব পার্টিকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে এবং সৈন্যদের পাহারা দেয়। কাটায়েব পার্টি সাবরা ও শাতিলার শরণার্থী শিবিরে ঢুকে হাজার হাজার নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে। এরপরই ইসরাইল মুসলিম গণহত্যা চালায়। ১৩৯৪ হিজরিতে (১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) আইনুল হালওয়ায় এই গণহত্যা সংঘটিত হয়।

এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে আমিন আল-জামিল যুক্তরাষ্ট্রকে লেবাননের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করতে বলে। যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সহায়তায় এক বহুজাতিক বাহিনী গঠন করে লেবাননে প্রবেশ করে। কিন্তু আত্মঘাতী হামলার মুখে যুক্তরাষ্ট্র টিকতে পারে না। লেবাননে আমেরিকান সেনা ঘাঁটিতে একটি আত্মঘাতী হামলা হয়। সেই হামলায় যুক্তরাষ্ট্র শত শত সৈন্য হারায়। ইসরাইল বুঝতে পারে, তারা নিজেদেরকে লেবাননের অথই জলে এনে ফেলেছে। তাই তারা লেবানন থেকে আংশিকভাবে চলে যেতে শুরু করে। ইসরাইল দক্ষিণ-লেবাননের বেকা ভ্যালি এবং ১৪০৫ হিজরিতে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে রাখা তাদের দখলীকৃত ও সুরক্ষিত অঞ্চল টিকিয়ে রাখে। লেবাননের পরিস্থিতি উত্তপ্তই রয়ে যায়। শিয়া মতাদর্শী হিজবুল্লাহর হাত ধরে লেবাননে ইরানি কর্তৃত্বের উদ্ভব ঘটে। ইসরাইলের প্রতিনিধিত্বকারী লেবানিজ সৈন্যদের মাঝে ইসরাইলি কর্তৃত্ব বিস্তার লাভ করে। সেই সৈন্যরা লেবাননে ইসরাইলকে শক্তিশালী করার জন্য ইহুদিদের সাথে যোগ দেয়।

লেবানিজ জনগণ বুঝতে পারে, লেবাননে যা কিছু ঘটেছে, তাতে শুধু ইসরাইল লাভবান হবে। তারা বুঝতে পারে, প্রকৃত শত্রু ও ইসরাইলের প্রতিনিধিদের (যাদের সংখ্যা ছিল লেবানিজ বাহিনীর মাত্র ৮%-এর মতো) মোকাবিলা করতে লেবনিজদের ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। অবশেষে ১৪১০ হিজরিতে (১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে) তায়িফ চুক্তির মাধ্যমে লেবাননে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়। কিন্তু ইসরাইল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রথম রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নতুন করে গৃহযুদ্ধ বাধাতে

চেষ্টা করে। রাষ্ট্রপতির গাড়িতে মাইন লাগিয়ে দেওয়া হয়। গাড়ি চলার মাঝে বোমা বিস্ফোরিত হয়ে রাষ্ট্রপতিসহ আরও দশজন নিরপরাধ মানুষ নিহত হয়। কিন্তু লেবানিজ জনগণ গৃহযুদ্ধ শেষ করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে।

এরপর ইলিয়াস হারাবি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করে। পরবর্তী কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে এমিল লাহুদ রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রিত্ব দেওয়া হয় রফিক হারিরিকে। ২০০৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি (১৪২৬ হিজরিতে) বোমা হামলার শিকার হয় রফিক আল-হারিরির গাড়িবহর। সেই হামলায় তিনি নিহত হন। তার মৃত্যু লেবাননকে আবারও সেই পুরোনো সংঘাতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

গৃহযুদ্ধের পর লেবানন

দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে চলতে থাকা গৃহযুদ্ধে লেবানন তার সব সম্পদ হারায়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর লেবানন তার ক্ষত সারিয়ে তোলার চেষ্টা করে। লেবানন সরকার সব দলের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নেয়। শিয়া মতাদর্শী হিজবুল্লাহ ব্যতীত সব দল সরকারের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়ে লেবানন সেনাবাহিনীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে। যদিও এর ফলে লেবাননে নতুন করে দুর্ভাগ্যের বীজ বপন করা হয়, কিন্তু তারপরও দক্ষিণ-লেবাননে ইসরাইলি দখলের বিরুদ্ধে লেবানিজদের সহযোগিতা করে হিজবুল্লাহ যে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে, তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ইসরাইলি শক্তি ও তার অনুগত বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত অনেক আত্মঘাতী হামলা ও উত্তর ইসরাইলে কাত্যুশা রকেট হামলায় হিজবুল্লাহ অংশগ্রহণ করে। ইসরাইল লেবানিজ সেনাছাউনি ও হিজবুল্লাহর ঘাঁটিতে লাগাতার আক্রমণ করে প্রতিরোধ শক্তি ধ্বংস করার চেষ্টা চালায়। এমনকি ইসরাইলি সরকারের সদস্যরা লেবাননে লাগাতার ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ১৪১৬ হিজরিতে (১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) সংঘটিত কানার গণহত্যা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পেরিজ সরকার ইসরাইলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বে ইসরাইলি সেনাবাহিনী এই গণহত্যা চালায়। কিন্তু তুমুল প্রতিরোধের মুখে ইসরাইল দক্ষিণ লেবানন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

জর্দানের হাশেমি সাম্রাজ্য

আমরা পূর্বেই জর্দানের হাশেমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জেনেছি। আমরা জেনেছি যে, জর্দানের হাশেমি সাম্রাজ্য ছিল পূর্ব জর্দানের একটি প্রদেশ। বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন শরিফ হুসাইনকে যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১৩৬৬ হিজরিতে (১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) জর্দান ব্রিটেনের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৩৬৮ হিজরিতে (১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে) জর্দান আরবের সাথে ফিলিস্তিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধের পর বাদশাহ আবদুল্লাহ জর্দান নদীর পশ্চিম তীর দখল করে নেয় এবং গ্রেট সিরিয়া প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ও ফিলিস্তিন আবদুল্লাহর শাসনাধীন হয়ে পড়ত। কিন্তু এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৩৭১ হিজরিতে (১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে) বাদশাহ আবদুল্লাহ জেরুজালেমে আততায়ীর হাতে নিহত হয়। তারপর যুবরাজ তালাল ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু মানসিক অসুস্থতার অভিযোগে ১৩৭৩ হিজরিতে তাকে পদচ্যুত করা হয়। তালালের পর তার ছেলে বাদশাহ হুসাইন রাজক্ষমতা লাভ করে।

বাদশাহ হুসাইনের শাসনামলে ইরাকের সাথে জর্দানের ঐক্য সম্পাদিত হয়। তখন ইরাক শরিফ পরিবারের অধীনে ছিল। তারপর ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হলে এই ঐক্য ভঙ্গ হয়ে যায়। তার শাসনকালেই ইতিহাসবিখ্যাত ৬৭-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জর্দান এই যুদ্ধে জর্ডান নদীর পশ্চিমাঞ্চল ও ফিলিস্তিন সংলগ্ন একটি সরু উপত্যকা হারায়।

১৩৯৯ হিজরিতে (১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) মিশরের সাথে আরববিশ্ব সম্পর্ক ছিন্ন করার পর জর্দানই প্রথম পুনরায় মিশরের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। আরব দেশসমূহ ১৩৯৪ হিজরিতে (১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ফিলিস্তিনের যে ভূখণ্ড স্বাধীন হবে, তা ফিলিস্তিনিদেরই থাকবে। জর্দান এই সিদ্ধান্তে ঐকমত্য প্রকাশ করে। ১৪১১ হিজরির (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের) উপসাগরীয় যুদ্ধে শুরুর দিকে ইরাকের পক্ষ নেওয়া জর্দানের ব্যতিক্রমী অবস্থান ছিল। যুদ্ধের পর পরই জর্দান সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ১৪১৫ হিজরিতে (১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে) ইয়ারিব উপত্যকায় ইসরাইলের সাথে শান্তিচুক্তি করে। পরবর্তীকালে ইয়ারিব উপত্যকার নাম হয়ে যায় শান্তির উপত্যকা। শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল কর্তৃক দখলীকৃত সরু উপত্যকা ফিরে পায় জর্দান। কিন্তু এই চুক্তির কিছু

পয়েন্ট ছিল অদ্ভুত। যেমন : জর্দানের দুটি বসতি ইসরাইলের সাথে এই মর্মে চুক্তি করে যে, প্রিন্সিপাল ল্যান্ড ফর পিচ এর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় তারা ইসরাইলকে পঁচিশ বছর ভাড়া প্রদান করবে।

জর্দানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, জর্দান স্বল্প সম্পদের দেশ হিসেবে পরিচিত। জর্দান মূলত পাশ্চাত্যের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। ১৩৮৭ হিজরিতে (১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) পাশ্চাত্য থেকে অমুখাপেক্ষী করে তুলতে এবং বাজেট পূরণ করতে মিশর, সিরিয়া ও সৌদি আরব জর্দানকে ১২ মিলিয়ন পাউন্ড আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে। কিন্তু পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের কারণে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। ১৪১৯ হিজরিতে (১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) বাদশাহ হুসাইন ইনতেকাল করে। তার ছেলে বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

ফিলিস্তিন ও আরব-ইসরাইল সংঘর্ষ

ফিলিস্তিন দখলের ইহুদিবাদী পরিকল্পনা

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, উসমানি শাসনামলে স্প্যানিশরা মুসলিম ও ইহুদিদের স্পেন থেকে বিতাড়িত করে। পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও ইহুদিদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। উসমানি সাম্রাজ্য ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রয় খুঁজে পায় না ইহুদিরা। উসমানি সাম্রাজ্য দয়াপরবশ হয়ে মানবতার খাতিরে ইহুদিদেরকে বুকে টেনে নেয়। কিন্তু অকৃতজ্ঞতা ও খিলাফত ধ্বংসের মাধ্যমে ইহুদিরা এই সদ্ব্যবহারের প্রতিদান দেয়।

প্রখ্যাত জার্মান ইহুদি সাংবাদিক থিওডোর হার্টজেলের আবির্ভাব ঘটে দৃশ্যপটে। হার্টজেল ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণা পেশ করে। ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য ফিলিস্তিনকে নির্বাচন করার কারণ ছিল, ইহুদিদের সাথে ফিলিস্তিনের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে। তা ছাড়া ইহুদিরা ফিলিস্তিনকে 'প্রতিশ্রুত ভূমি' বলে থাকে।

হার্টজেল খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সাথে ফিলিস্তিন নিয়ে দরাদরির চেষ্টা করে। খলিফা হার্টজেলের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনে অভিবাসী হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এ প্রেক্ষিতে ইহুদিরা উসমানি খিলাফত ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু করে এবং একাজে মিত্রদের সহযোগিতা করতে থাকে। উসমানি সাম্রাজ্যে

আরব জাতীয়তাবাদ ও ফ্রিম্যাসনারি ধারণা প্রচার করে তারা। সেই সাথে 'কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস'-এ যোগ দিতে থাকে।

দোনমে ইহুদিদের কথাও ভোলার মতো নয়। এদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে ঘোষণা করে, কিন্তু মনে মনে ইহুদিই থেকে যায়। তারা ভেতর থেকে ইসলামকে ধ্বংস করতে থাকে এবং দেশে দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও বিশৃঙ্খলা উসকে দিতে সফল হয়। মিত্রশক্তি ইহুদিদের 'কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস'-এ যোগ দিতে সাহায্য করে। একপর্যায়ে কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য হয়ে যায় ইহুদিরা। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং উসমানি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

বেলফোর ঘোষণা (১৩৩৬ হিজরি)

ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জেমস বেলফোর ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফিলিস্তিন ইংরেজদের অধীনে চলে যায়। সারা বিশ্ব থেকে অভিবাসী ইহুদিরা আসতে শুরু করে ফিলিস্তিনে এমনকি ইহুদিদের কেন্দ্র গ্রিস থেকেও। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল একদিকে আরবকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলা ও আরবের আফ্রিকান অংশকে এশীয় অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, যাতে আরববিশ্বের স্থিতিশীলতা চিরদিনের জন্য দাফন হয়ে যায় ও আবরদের ঐক্য দুর্বল করে দেওয়া যায়। অন্যদিকে যেন ফিলিস্তিনকে কিনে নেওয়ার জন্য ইহুদিদের সম্পদের ঢল নেমে আসে এবং এই রাষ্ট্রগুলো তাদের অর্থনৈতিক জীবনের মেরুদণ্ডের অধিকারী ইহুদি উপনিবেশ থেকে মুক্তি পায়।

আরববিশ্ব ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আবাসভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করে। ১৩৫৫ থেকে ১৩৫৮ হিজরি (১৯৩৬-১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত ভয়াবহ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইংরেজরা প্রথমবার ইহুদি ও আরবদের মাঝে ফিলিস্তিন ভাগ করে দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করে। এই প্রস্তাব '১৯৩৭ সালের বিভক্তি' নামে পরিচিত। আরববিশ্ব এই প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসন বাড়তে থাকে। এরই মাঝে ইহুদিদের ওপর জার্মান নিপীড়ন নিয়ে হাজির হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ফিলিস্তিনের ইহুদি সংস্থা জার্মান নাজি সরকারের সম্মতিতে

অনেক ইহুদিকে অভিবাসী হতে সাহায্য করে। ব্রিটিশ শক্তি দুর্বল হতে শুরু করে। আমেরিকান প্রভাব বেড়ে যায়। ইহুদিরা যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখী হয়। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি, সব ক্ষেত্রে ইহুদিদের ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্র ইহুদিদের সহযোগিতা করতে শুরু করে। ১৩৬২ হিজরিতে (১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) বাল্টিমোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন ফিলিস্তিনে জায়োনিস্ট পরিকল্পনাকে সমর্থন করে এবং তাদেরকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

৪৭-এর ফিলিস্তিন বিভক্তি (১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)

ফিলিস্তিনের বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপিত হলে বিভক্তির সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। আমেরিকা জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রগুলোকে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইহুদিদের দেওয়া হয় ফিলিস্তিনের উর্বর ভূমিগুলো, আর ফিলিস্তিনিদের দেওয়া হয় সবচেয়ে অনুর্বর ভূমি। বাইতুল মুকাদ্দাস ও অন্যান্য পবিত্র স্থান আন্তর্জাতিক অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ইংল্যান্ড ফিলিস্তিনে তাদের প্রতিনিধিত্ব সমাপ্তির ঘোষণা দেয়, যাতে এই সুযোগে ইহুদিরা তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিতে পারে। ইহুদিদেরকে দেওয়া অনেক অঞ্চল থেকে আরবদের সরিয়ে নেওয়ার পরে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

৪৮-এর ফিলিস্তিন যুদ্ধ (১৩৬৭ হিজরি/১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ)

ইহুদিরা ফিলিস্তিন ছাড়ার জন্য আরবদের চাপ দেয় এবং ভয় দেখায়। বড় কয়েকটি গ্রুপ ফিলিস্তিনিদের ওপর আক্রমণ করতে শুরু করে। ১৩৬৭ হিজরিতে (১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে) 'দেইর ইয়াসিন'[৯]-এ গণহত্যা সংঘটিত হয়।

ইসরাইলি দখল থেকে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করতে যুদ্ধের বিকল্প কোনো পথ খুঁজে পায় না আরব ফিলিস্তিনিরা। এই প্রেক্ষিতে ১৩৬৮ হিজরিতে ৪৮-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মিশর, সিরিয়া, জর্দান ও ইরাক ফিলিস্তিনিদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধের শুরুতে আরব মিত্রবাহিনী বিজয়ী হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের চাপের মুখে একমাস যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধবিরতি চলাকালে আরব কিংবা ইহুদি কোনো দলই অস্ত্র নিতে পারবে না—এই মর্মে যুদ্ধবিরতি হয়।

---

৯. দেইর ইয়াসিন : ফিলিস্তিনের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম। এটি জেরুজালেম থেকে পশ্চিমে অবস্থিত। -সম্পাদক

আরব এই সিদ্ধান্ত রক্ষা করে। কিন্তু ইহুদিরা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র নেয়; পশ্চিমা বিশ্ব এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে। তারপর আবার যুদ্ধ শুরু হলে মিশরীয় বাহিনীর কাছে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের অস্ত্র-দুর্নীতির বিষয়টি প্রকাশ পায়। যুদ্ধের মোড় পাল্টে যায় এবং আরব বাহিনী পরাজয় বরণ করে। ১৯৪৭-এর বিভক্তিতে ইসরাইল যে ভূখণ্ড পেয়েছিল, ইসরাইলি ভূখণ্ড তার চেয়ে আরও বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে ইসরাইলি দখলদারি এত বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, ফিলিস্তিনিদের মানচিত্র যেন খুঁজেই পাওয়া যায় না! এদিকে অ্যাপল ও গুগলের বিশ্বমানচিত্রে ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব না থাকার বিষয়টি অনেক আলোচিত হয়েছে।

পশ্চিম তীর জর্দান শাসনের অধীনে আসে, আর গাজা ভূখণ্ড চলে যায় মিশরীয় শাসনের অধীনে।

১৩৭৫ হিজরি/১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ-এর যুদ্ধ (ত্রিমুখী আগ্রাসন)

মিশরের সাথে ইসরাইল, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সম্মিলিত শত্রুতা সৃষ্টি হয়। মিশর সুয়েজ খাল খননের ঘোষণা দেয়, যা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জলপথে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব শেষ করে দেবে। এ ছাড়া মিশর আলজেরিয়ার বিদ্রোহে সহযোগিতা করে (ফরাসি উপনিবেশ প্রতিরোধ করার জন্য আলজেরিয়া কায়রোতে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে, যা ফ্রান্সের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়)। আর ঠিক এই সময়ে আরব ঐক্য ও ফিলিস্তিন থেকে ইহুদি উৎখাতের আহ্বান জানায় মিশর। ১৩৭৬ হিজরিতে (১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে) শত্রুত্রয় সিনাই উপদ্বীপে আক্রমণ করে সুয়েজ তীরবর্তী শহরগুলোতে বোমা হামলা শুরু করে। গণপ্রতিরোধ শুরু হয়। মিশর সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য কামনা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুক্তরাষ্ট্রও আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলোকে মিশর ত্যাগ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। চাপের মুখে অত্যাচারী শক্তি মিশর ত্যাগ করে।

৬৭-এর যুদ্ধ (১৩৮৭ হিজরি)

ইয়ামেন যুদ্ধে আরববিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী মিশরীয় সেনাদের ব্যস্ত থাকার সুযোগকে ইসরাইল কাজে লাগায়। মিশর, সিরিয়া ও জর্দানে আক্রমণ করে মিশরের কাছ থেকে গাজা ভূখণ্ড ও সিনাই উপদ্বীপ, সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান মালভূমি এবং জর্দানের কাছ থেকে পশ্চিশ তীর দখল করে নেয়। ইসরাইল যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর জাতিসংঘ

২৪২ নং রেজুলেশন ঘোষণা করে, যাতে ইসরাইলকে ১৩৮৭ হিজরিতে দখলীকৃত অঞ্চল থেকে সেনাপ্রত্যাহার করতে বলা হয়। কিন্তু ইসরাইল এই রেজুলেশনকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। কারণ, ইসরাইল জানত, যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য তাদের অবস্থানকে সমর্থন করবে। এর মধ্যে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সমস্যা দেখা দেয়। লেবানন শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে সীমান্ত খুলে দেয়। ইসরাইল দখলীকৃত অঞ্চলে অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য আবাস গড়তে শুরু করে।

১৯৭৩-এর যুদ্ধ (১৩৯৩ হিজরি)

ইসরাইলের হাত থেকে দখলীকৃত ভূমি স্বাধীন করার জন্য আরব নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে শুরু করে। মুসলিমবিশ্ব আরবদের পাশে দাঁড়ায়। ইসরাইলের মদদদাতা পাশ্চাত্যের কাছে পেট্রোল রপ্তানি না করার সিদ্ধান্ত নেয় মুসলিমবিশ্ব। ছয় বছর আরব-ইসরাইল সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। ১৩৯৩ হিজরির ১০ রমজানে দখলীকৃত ভূমি স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ চালায় আরব বাহিনী। আরব বাহিনী ইহুদিদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের বিজয় অর্জন করে সুয়েজ অতিক্রম করে। বার লেভ[১০] লাইনের দেয়াল গুঁড়িয়ে দেয়। যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত এগিয়ে আসে ইসরাইলকে উদ্ধার করার জন্য। যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ১৩৮৭ হিজরির (১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের) দখলীকৃত অঞ্চল থেকে ইসরাইলের প্রত্যাহার নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে আমেরিকা।

কিন্তু অতি শীঘ্রই সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ইসরাইল সুর পাল্টাতে শুরু করে। ইসরাইল বলে, যুদ্ধ বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়েছিল ১৩৮৭ হিজরিতে (১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) দখলীকৃত কিছু অঞ্চল থেকে প্রত্যাহৃত হওয়ার শর্তে; পুরো অঞ্চল থেকে নয়। ইসরাইলি প্রতারণায় আরব রেগে যায়। এদিকে ১৩৯৭ হিজরিতে (১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) মিশর ইসরাইলের সাথে শান্তিচুক্তির উদ্যোগ নেয়। প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত দখলীকৃত ফিলিস্তিন সফর করে। সফরকালে ইসরাইলি সংসদে বক্তব্য প্রদান করে।

১৩৯৮ হিজরিতে (১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাম্প ডেভিড সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের পরই ১৩৯৯ হিজরিতে (১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে)

---

১০. **বার লেভ লাইন (Bar Lev Line) :** সুয়েজ খালের প্রান্তে পূর্ব তীরে ইসরাইল কর্তৃক নির্মিত সুরক্ষা প্রাচীর। -সম্পাদক

ইসরাইল ও মিশরের মাঝে শান্তিচুক্তি সংঘটিত হয়। চুক্তিতে ইসরাইলের সিনাই উপদ্বীপ ত্যাগ করার কথা উল্লেখ করা হয়। এতে আরবদেশ আরও রেগে যায়। তারা মনে করে, মিশর কেবল নিজের স্বার্থ চিন্তা করে ফিলিস্তিনি জনগণের স্বদেশ স্বাধীন করার অধিকার খর্ব করেছে। এই প্রেক্ষিতে ১৩৯৯ হিজরিতে (১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) বাগদাদে আরবদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আবরবিশ্ব মিশরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়। ওমান, সুদান ও সোমালিয়া ব্যতীত সব আরব দেশই এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করে। ১০ রমজান ১৩৯৩ হিজরির (৬ অক্টোবর ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের) যুদ্ধের পর ইসরাইলের সাথে মিশরীয়, জর্দান ও সিরিয়ান ফ্রন্টের যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। এর স্থলে নতুন ফ্রন্ট খোলা হয়, যারা আত্মঘাতী হামলায় অংশগ্রহণ করতে থাকে। ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের মধ্য হতে লেবাননে অনুপ্রবেশকারীরা দখলীকৃত ফিলিস্তিনে ১৩৯৫ হিজরি পর্যন্ত এসব আত্মঘাতী হামলা চালায়। ইসরাইল ও পাশ্চাত্য লেবাননে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয়। ১৩৯৫ হিজরিতে (১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) লেবাননে আক্ষরিক অর্থেই গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। ইসরাইল লেবানন ভূমিতে ঢুকে সংঘাত লাগিয়ে দেয়; যেমনটা আমরা পূর্বে 'লেবানন' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

ইরাকের পারমাণবিক চুল্লিতে আক্রমণ (১৪০১ হিজরি/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ)

১৪০১ হিজরিতে ইরাকের পারমাণবিক চুল্লিতে ইসরাইল বিমান হামলা চালায়। এই আক্রমণের কারণ ছিল, ইরাকের পারমাণবিক চুল্লি ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক। তখন ইরাক-ইরান যুদ্ধ চলছিল। তাই ইরাক এই হামলার কোনো প্রতিউত্তর দিতে পারেনি।

এদিকে দখলীকৃত অঞ্চলে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। আত্মঘাতী হামলাও বাড়তে থাকে। ১৪০৭ হিজরিতে (১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে) ইসলামিক রেসিসটেন্স মুভমেন্ট হামাসের নেতৃত্বে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি ইনতিফাদা (আন্দোলন)-এর ঘোষণা দেওয়া হয় এবং ইসরাইল কর্তৃক দখলীকৃত ফিলিস্তিনি ভূমিতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হয়।

আরব ও ইসরাইলের মাঝে আলোচনা শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে মাদ্রিদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ইহুদি ও ফিলিস্তিনিদের মাঝে গাজা-জেরিকো চুক্তি হয়। চুক্তিতে এই দুই ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা

এবং পশ্চিম তীরে ও গাজায় পুনরায় ইসরাইলি শক্তি বিস্তারের কথা উল্লেখ করা হয়। ১৩৯৩ হিজরিতে (১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) সাবেক ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী ইসহাক রাবিনের আমলে এই চুক্তি সংঘটিত হয়। ইসরাইলি লেবার পার্টি তখন ক্ষমতায় ছিল।

তারপর ১৪১৫ হিজরিতে (১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) কট্টরপন্থী ইহুদি ইসহাক রাবিন (যে দখলীকৃত ফিলিস্তিনের এক বিঘত মাটিও ফিলিস্তিনিদের দিতে রাজি ছিল না) নিহত হয়। তারপর শিমন পেরেজ ইসরাইলি নির্বাচন চলাকালীন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে। সে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। পশ্চিম তীর ও গাজার পুনরায় ইসরাইলি শক্তি বিস্তারের মাধ্যমে গাজা-জেরিকো চুক্তির ধারাসমূহ বাস্তবায়ন করে। গোলান-সমস্যা সমাধানে আরব ও ইসরাইলের মাঝে আলোচনা হয়। তারপর লেবাননে ইসরাইলি সেনাদের হাতে কানার গণহত্যা সংঘটিত হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এতে লিকুড পার্টি বিজয় লাভ করে। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে। নেতানিয়াহু শান্তিচুক্তির সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক মতামত প্রকাশ করার পর পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। সে অভিবাসীদের সংখ্যা বাড়াতে থাকে। বসতি নির্মাণ বন্ধে সংঘটিত অসলো চুক্তির এবং গোলান থেকে সেনাপ্রত্যাহার ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করে।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা এরিয়েল শ্যারন ইসরাইলি পুলিশের প্রহরায় বাইতুল মুকাদ্দাস পরিদর্শনে যায়। তার এই পরিদর্শন ফিলিস্তিনিদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। দ্বিতীয় ইনতিফাদা (আকসা আন্দোলন) সংঘটিত হয়। এতে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি জনগণ প্রাণ উৎসর্গ করে।

শ্যারন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ফিলিস্তিনি ভূমিগুলোর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভেদের দেয়াল গড়তে শুরু করে। সেই সাথে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধে শুরু করে গুপ্তহত্যার রাজনীতি। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে আততায়ীর হাতে নিহত শাইখ আহমাদ ইয়াসিন ও কয়েক মাস পর নিহত হামাসের প্রসিদ্ধ নেতা ডক্টর আবদুল আজিজ রনতিসি এই গুপ্তহত্যার শিকার। (আল্লাহ তাদের দুজনের প্রতি এবং সকল শহিদের প্রতি রহম করুন, আমিন।)

* * *

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

গণপ্রজাতন্ত্রী মিশর

মুহাম্মাদ আলি ও তার পরিবার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর মিশর উসমানিদের কর্তৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে মিশরের নামমাত্র সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে। একপর্যায়ে মিশরে ব্রিটিশ উপনিবেশ শুরু হয়। আর এর মধ্য দিয়ে উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে মিশরের সব ধরনের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়।

মুহাম্মাদ আলি

পূর্বে আমরা উসমানি সাম্রাজ্যের অধ্যায়ে মুহাম্মাদ আলি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা জেনেছি, মুহাম্মাদ আলির বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ কেমন ছিল এবং কীভাবে সে বংশানুক্রমিক শাসনক্ষমতা লাভ করেছে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, মুহাম্মাদ আলি ইউরোপের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তারপর সুদানের দিকে এগিয়ে যায়। তার ছেলে ইসমাইল বেগ সুদান আক্রমণ পরিচালনা করে। তার সেনাবাহিনী নীলাভ নীলনদের তীর ঘেঁষে এগিয়ে যায়। তারা বারবার শিন্দি ও সিনার জয় করে। এর মধ্যে মিশরীয় সৈন্যবাহিনীতে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ইসমাইল নিজেও আক্রান্ত হন। তিনি পিতার নিকট সহায়তা কামনা করেন। পিতা মুহাম্মদ আলি ছেলে ইবরাহিম বেগ-এর নেতৃত্বে সুদানের উদ্দেশ্যে আরেকটি অভিযান পরিচালনা করেন। তারা শ্বেত নীলনদের সমান্তরালে অগ্রসর হয়। শিন্দির বাদশাহ নাসির প্রতারণা করে ইসমাইল ও তার অনুচরদের পুড়িয়ে ফেলে। বাদশাহর প্রতিশোধ নিতে মুহাম্মদ আলি তার জামাতা মুহাম্মদ বেগ দপ্তরদারকে প্রেরণ করেন। বাদশাহ ইথিওপিয়া পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মুহাম্মদ বেগ নীলাভ নীলনদ ও শ্বেত নীলনদের মোহনায় খুরতুম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মাদ আলি ইনতেকাল করলে তাঁর নাতি আব্বাস বিন তুসুন বিন মুহাম্মাদ শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে। কারণ, মুহাম্মাদ আলির জীবদ্দশায়ই তার ছেলে ইবরাহিম মৃত্যুবরণ করে।

আব্বাস

আব্বাসের এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। সে মনে করত, জ্ঞানবিজ্ঞানে জনগণের অগ্রগতি আব্বাসের ক্ষমতার জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই সে প্রগতি ও উন্নতির সব নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করে দেয়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান সে বন্ধ করে দেয়। তুরস্কের সাথে মিলে শাসনব্যবস্থাও পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করে, যাতে কেবল তার বংশধরদের মাঝেই মিশরের শাসনক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে এবং (পূর্বের নিয়ম অনুসারে) মুহাম্মাদ আলির পরিবারের সবচেয়ে বড় সদস্য যেন ক্ষমতায় আরোহণ করতে না পারে। কিন্তু তার এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই চেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় সে তার প্রাসাদে নিহত হয়। সে কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার মাঝে রেললাইন স্থাপনের কাজ শুরু করেছিল।

সাইদ

সাইদ হলো মুহাম্মাদ আলির ছেলে। তার ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের মধ্য হতে অন্যতম হলো, সে মিশরের স্বৈরশাসন হালকা করে। ভূমির মালিকানা লাভের অধিকার প্রদান করে। এরপর অনেক মিশরীয় জনগণ জমি কিনতে শুরু করে। বড় বড় চাকরি নিতে শুরু করে। সাইদ সুশীল, কৃষক ও নগরপতির সন্তানের মধ্য হতে সমান হারে সৈন্য সংগ্রহের নিয়ম চালু করে। ইতিপূর্বে শুধু কৃষকদের সন্তানদেরকেই সেনাবাহিনীতে নেওয়া হতো। আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোর মধ্যকার রেললাইনের কাজও সে সমাপ্ত করে।

তার নেতিবাচক কাজগুলো হলো, তার আমলে 'নেপোলিয়নের সাথে মৈত্রী'-এর কারণে মিশরীয় সেনাবাহিনী মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে সাহায্য করে। বহিরাগতদের সে বড় ধরনের সুবিধা প্রদান করে। সুয়েজ খাল খননে সতেরো মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় করে, যা সামগ্রিকভাবে আঠারো মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়ায়। জনগণকেও খাল খননে বাধ্য করে। এতকিছুর পরও সাইদ সুয়েজ খালের মাত্র ১৫% লাভ গ্রহণ করে বাকি অংশ ইউরোপকে দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়। এমনকি ৯৯ বছরের জন্য সে ইউরোপকে এই সুযোগ দান করে।

ইসমাইল

ইসমাইল বিন ইবরাহিমের শাসনামলে ধর্মীয় বিষয়ে অবহেলা, পাশ্চাত্যের অনুকরণ, ঋণের আধিক্য ও বিলাসিতার দিক থেকে মিশর এক কদর্য রূপ ধারণ করে। তবে রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড সম্প্রসারণ এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার বেশকিছু সাফল্য রয়েছে। নীলনদের উৎস ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকে নীলনদের মোহনা ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পৌঁছে যায় ইসমাইলের আফ্রিকান বিজয়াভিযান। আবিসিনিয়ার বহু অঞ্চল সে মিশরের অন্তর্ভুক্ত করে। সোমালিয়াতেও যুদ্ধ পরিচালনা করে উত্তরাঞ্চল দখল করে। সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সে মিশর ও সুদানে অনেক বিদ্যালয় ও উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। সভ্যতার ক্ষেত্রে নগর নির্মাণ, সংস্কার ও হাসপাতাল নির্মাণে গুরুত্বারোপ করে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সে মুহাম্মাদ আলি পরিবারের সবচেয়ে বড় সদস্যকে ক্ষমতা প্রদানের পরিবর্তে তার পরিবারের বড় সদস্যকে ক্ষমতা অর্পণ করার নিয়ম করে। সাইদও এই পরিবর্তন করতে চেয়েছিল, কিন্তু ইসমাইল তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। ইসমাইলের শাসনামলেই নির্দিষ্ট পরিমাণ সেনাসংখ্যার নিয়ম থেকে বেরিয়ে এসে মিশর সেনাসংখ্যা বৃদ্ধির অধিকার লাভ করে। সাইদের আমলে সুয়েজ খাল খননে বিনা পারিশ্রমিকে জোরপূর্বক শ্রম দেওয়ার যে নিয়ম করা হয়েছিল, তা রহিত করে ইসমাইল। জনগণকে কাজে লাগানোর পরিবর্তে সুয়েজ খাল সংস্থাকে তিন মিলিয়ন উনিশ হাজার পাউন্ড প্রদানের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করে সে। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে মিশরও দাসমুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া ইসমাইল তার জন্য এবং তার অনুসারীদের জন্য 'খেদিভ' (ডেপুটি সুলতান) উপাধি চালু করে। এর পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে সে।

তার নেতিবাচক দিকগুলো হলো, তার শাসনামলে বিলাসিতা ও ঋণ বেড়ে যায়। সুয়েজ খাল উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পেছনেই তার কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড খরচ হয়ে যায়। সেই অনুষ্ঠানে ইউরোপের রাজা-বাদশাহদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। উপস্থিতদের প্রদর্শনের জন্য অপেরা হাউজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অভ্যর্থনার জন্য বিভিন্ন প্রাসাদ ও পার্ক নির্মাণ করা হয়। এসব করতে গিয়ে সে চড়া সুদের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করে এবং সুয়েজ খালের মিশরীয় অংশ ইংল্যান্ডের কাছে বিক্রি করে দেয়। এর কারণে

মিশরের ওপর ইংল্যান্ডের শক্তিশালী প্রভাব পড়ে। ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলো তাদের ঋণ চাইতে শুরু করে। ঋণ পরিশোধে খেদিভের অক্ষমতা দেখে মিশরের রাষ্ট্রীয় কোষাগার রক্ষণাবেক্ষণ ও ঋণ আদায়ের জন্য ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স দ্বিপাক্ষিক কমিটি নির্ধারণ করে। এই কমিটি মিশরের সমস্ত বিষয়; এমনকি মন্ত্রী নির্ধারণ ও বরখাস্তকরণেও নাক গলাতে শুরু করে।

ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলো আফ্রিকায় ইসমাইলের প্রভাব দেখে আশঙ্কা করতে শুরু করে, আফ্রিকান কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে ইসমাইল তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। তাই উসমানি খলিফা কর্তৃক ইসমাইলকে ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। মুহাম্মাদ আলির মতো পরিণতি বরণ করার আশঙ্কায় ইসমাইল এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

তাওফিক ও মিশরে ইংরেজ উপনিবেশ

তাওফিক ছিল দুর্বল। সে ইউরোপের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখত। মনে করা হয়, তাকে ক্ষমতায় আনার ক্ষেত্রে ইউরোপের বড় ধরনের ভূমিকা ছিল। তার শাসনকালে ১২৯৮ হিজরিতে (১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে) অত্যাচারী কর্মকর্তাদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য দুইবার আরাবিয়া বিদ্রোহ হয়। খেদিভ আরাবিয়া বিদ্রোহে আনুগত্য প্রকাশ করে এবং ক্রমশ দুর্বল হতে থাকা প্রধান কার্যালয় হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা করতে থাকে।

ইংরেজরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মিশরে ঢুকে প্রধান কার্যালয় রক্ষা করার প্রস্তাব পেশ করে। তাওফিক প্রস্তাব মেনে নেয়। অবশেষে ইংরেজরা মিশরে ঢুকতে শুরু করে। আহমাদ আরাবি ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। কিন্তু তিনি তিল্ল আল-কাবিরের যুদ্ধে পরাজিত হন। মিশর ইংরেজ কর্তৃত্বের অধীনে চলে আসে। খেদিভ তাওফিকই এই কর্তৃত্বকে সমর্থন করত। সে মনে করত, ইংরেজরা তার ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখবে। আরাবি ও তার সঙ্গীদেরকে শ্রীলঙ্কায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তাওফিকের শাসনামলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল সুদানের মাহদিয়া বিদ্রোহ। ইংরেজদের পরিকল্পনা ছিল, মিশর সুদান ত্যাগ করবে। তারপর ইংরেজরা এসে সুদান দখল করে নেবে। একপর্যায়ে ইংরেজরা সুদান থেকে সেনাপ্রত্যাহার করার জন্য মিশরকে চাপ দিতে শুরু করে। ফলে মাহদিয়া বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহ মিশরীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে

নানামুখী বিজয় এনে দেয় এবং মিশরীয় সেনাবাহিনী সুদান ত্যাগ করে। ইংল্যান্ডের সামনে সুযোগ চলে আসে। ইংল্যান্ড আগে থেকেই চাইত, সুদানে মিশরের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনবে। ইংল্যান্ড মাহদিয়ার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে সুদানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সুদানকে মিশরের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়। অথবা আরও সঠিক অর্থে বলা যায়, ইংরেজ কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। একে বলা যায় ইংরেজ-মিশরীয় দ্বিপাক্ষিক শাসন।

তাওফিক ১৩১০ হিজরিতে (১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে) ইনতেকাল করে। তার ছেলে আব্বাস হিলমি তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

আব্বাস হিলমি

আব্বাস হিলমির শাসনকালে মিশর থেকে ইংরেজ দখলদারি উচ্ছেদের আহ্বানে আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, আন্দোলনগুলো গোত্রীয় নীতি অনুযায়ী চলতে থাকে। সে সময় মোস্তফা কামিলের আন্দোলনও সংঘটিত হয়। মোস্তফা কামিল জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা করে। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইসলামের অধিক নিকটবর্তী। সে মিশরের সাথে উসমানি সালতানাতের সম্পর্ক দৃঢ় করার চেষ্টা করে।

লর্ড ক্রোমার যখন মিশরে ব্রিটিশ হাই-কমিশনার ছিল, তখন মিশরের খেদিভ[১১] এসব আন্দোলন সমর্থন করত। তার শাসনামলে ১৩২৪ হিজরিতে (১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে) ডেনশাওয়ে ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়। মন্ত্রণালয়ে বুত্রোস গালির মতো অনেক বিশ্বাসঘাতক দেখা দেয়। বুত্রোস গালি ডেনশাওয়ে ঘটনায় চারজন মিশরিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড, আটজনকে বেত্রাঘাত ও বারোজনকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়ার ফায়সালা দেয়। এভাবে তার বিশ্বাসঘাতকতা চলতেই থাকে। সুয়েজ খালে প্রভাব বিস্তারকারী বিদেশি সংস্থার জন্য সুয়েজ খাল ব্যবহারের ছাড় দেওয়া হয়। সে ১৩২৮ হিজরিতে (১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে) গুপ্তহত্যার শিকার হয়।

১৩২৬ হিজরিতে (১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে) মোস্তফা কামিলের মৃত্যুর পর মুহাম্মাদ ফরিদ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। মুহাম্মাদ ফরিদ স্বাধীনতার ডাক দেয়। তাকে বন্দি করে নির্যাতন করা হয়। একপর্যায়ে সে মিশর ত্যাগ

---

১১. খেদিভ : মিশরে নিযুক্ত উসমানি সালতানাতের গভর্নরদের উপাধি ছিল খেদিভ। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এর প্রচলন শুরু হয়। -সম্পাদক

করতে বাধ্য হয়। ইউরোপে শরণার্থী হয়ে ১৩৩৮ হিজরিতে (১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে) তার ইনতেকাল হয়।

সে সময় নতুন ব্রিটিশ দূত এলডোন গ্রুসত মিশরে আগমন করে, যে খেদিভ উপাধি লাভের রাজনীতি অনুসরণ করে এবং জনগণের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সহযোগিতা করে। তারপর কিচেনার নামে আরেকজন ব্রিটিশ দূত মিশরে আসে। সে জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য রাজনীতির পরিবর্তন ঘটায় এবং খেদিভ উপাধি ত্যাগ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সে উসমানি খিলাফতের পক্ষ নেয়। ইংরেজরা তাকে ত্যাগ করে নামকাওয়াস্তে চলতে থাকা উসমানি খিলাফতের অধীনতা বাতিল করে মিশরে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব ঘোষণা করে।

হুসাইন কামিল

তার আমলে শুধু বাহ্যিক ক্ষমতা ছিল সরকারের, আর প্রকৃত কর্তৃত্ব ছিল ইংরেজদের হাতে, যারা উসমানি খলিফার বিপরীতে তাকে সুলতান উপাধি দেয়। ব্রিটিশ কর্তৃত্বের পথে চলা ব্যতীত সে না কোনো মত প্রকাশ করেছে, আর না কোনো আপত্তি করেছে। ১৩৩৬ হিজরিতে (১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত সে এই পদেই বহাল থাকে।

আহমাদ ফুয়াদ

আহমাদ ফুয়াদ তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর ক্ষমতা লাভ করে। তার শাসনামলে ১৩২৮ হিজরিতে (১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে) বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসে অনুষ্ঠিত সন্ধি-সম্মেলনে ইংরেজ দখলদারি থেকে মিশর-স্বাধীনতার দাবি নিয়ে সাদ জগলুল ও তার সঙ্গীদের অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়ায় এই বিদ্রোহ ঘটে। সাদ জগলুল ও তার সঙ্গীদের মাল্টায় নির্বাসিত করা হয়। পরে ইংল্যান্ড সাদ ও তার সঙ্গীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্তি পেয়ে তারা প্যারিসে চলে যায়। তাদের ধারণা ছিল, অন্যান্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু তারা অপমানিত হয়। মিশরের বিদ্রোহ আরও বেড়ে যায়। ইংরেজরা সাদ জাগলুল ও তার সঙ্গীদের সাথে আলোচনায় বসে।

১৩৪০ হিজরিতে (১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে) ইংল্যান্ড মিশরকে বাহ্যিক স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়, যাতে নির্ধারণ করা হয়, মিশরে ইংরেজ সামরিক শক্তি বাকি থাকবে। ইংল্যান্ডের দায়িত্ব থাকবে, মিশর থেকে বহিরাগত

হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা এবং মিশরে অবস্থানরত বহিরাগতদের নিরাপত্তা বিধান করা।

বিদ্রোহে মিশরীয় ও ইংরেজদের মাঝে বাদশাহ ফুয়াদের অবস্থান ছিল নিরপেক্ষ। পরে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সে ইংরেজদের সাহায্য করতে শুরু করে। ১৯৩৬ সালে (১৩৫৫ হিজরিতে) ইংল্যান্ড মিশরের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত করে, যাতে ২৮ ফেব্রুয়ারির কয়েকটি ধারা পাল্টে যায়। যেমন : ইংরেজদের পরিবর্তে বহিরাগতদের জন্য মিশরকে রক্ষা করা, সুয়েজ খালের ভূখণ্ডে ইংরেজ সামরিক শক্তি টিকিয়ে রাখা, মিশরে বহিরাগতদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান বাতিল করার চেষ্টা করা এবং সুদানে দ্বিপাক্ষিক শাসন জারি করা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ইংল্যান্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগমন টের পাচ্ছিল। তাই এই মর্মে চুক্তি হয় যে, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মিশরের অভ্যন্তরে মিশর ব্রিটেনকে সাহায্য করবে।

বাদশাহ ফারুক

বাদশাহ ফারুক বাদশাহ ফুয়াদের ছেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে সে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে এবং ইংরেজদের কক্ষপথে চলতে শুরু করে। ১৩৬৭ হিজরিতে (১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে) ফিলিস্তিন যুদ্ধে অবৈধ অস্ত্রবাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ তাকে তার রাজনৈতিক কিংবা ইংরেজদের যেকোনো ধরনের বিরোধিতা শেষ করে দিতে সমর্থন করে। বিভিন্ন শহরে বিশৃঙ্খলা ব্যাপক আকার ধারণ করে। বাদশাহর প্রেমকাহিনি ও কদর্যতা ছড়িয়ে পড়ে এবং জনগণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

এ সময় ইমাম হাসান আল-বান্নার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনি ইসলামের হারিয়ে যাওয়া আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেন। প্রতিষ্ঠা করেন এ যুগের সবচেয়ে বড় ইসলামি আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলিমিন। বাদশাহর অপকর্ম থেকে নিষ্কৃতি পেতে ইখওয়ান স্বাধীনতাকামী নেতাদের সাহায্য করে।

৫২-এর বিদ্রোহ (১৩৭২ হিজরি)

মুহাম্মাদ নাজিব

বাদশাহর আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থানের সুযোগে স্বাধীনতাকামী নেতারা ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ে বিদ্রোহ করে বসে। বাদশাহকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে তার দুধছেলেকে মিশরের শাসক নির্ধারণ করে এবং ইখওয়ানের মাধ্যমে জনগণের সমর্থন অর্জন করে। তারপর রাজতন্ত্র বাতিল করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিদ্রোহ পরিচালনা বোর্ডের প্রধান মুহাম্মাদ নাজিব গণপ্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়।

স্বাধীনতাকামী নেতাদের অবস্থা স্থিতিশীল হওয়ার পর সেনাবাহিনীর প্রধান জামাল আবদুন নাসেরের আত্মপ্রকাশ ঘটে। জামাল আবদুন নাসের মুহাম্মাদ নাজিবকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। সে আরব ঐক্যের আহ্বান জানায় এবং আরববিশ্ব ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের উপনিবেশের সমালোচনা করে।

জামাল আবদুন নাসের একনায়কতান্ত্রিক শাসন পরিচালন করে এবং একটি সমাজতান্ত্রিক দলের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। অন্য কোনো মত প্রকাশের কিংবা ব্যক্তির উত্থানের সব সুযোগ বন্ধ করে দেয়। তার শাসনামলে মিশর ও সিরিয়া মিলে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। কিন্তু এই সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কিছুদিন পরই সিরিয়া এই প্রজাতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে। মিশরীয় সেনাবাহিনীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইয়ামেনের জলাভূমিতে। তারপর আরব ও মিশরীয় বাহিনীর কপালে কলঙ্কতিলক এঁকে দিতে সংঘটিত হয় ৬৭-এর ট্র্যাজেডি। ১৩৯০ হিজরিতে (১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে) জামাল আবদুন নাসের মৃত্যুবরণ করে।

মুহাম্মাদ আনোয়ার সাদাত

ইসরাইল কর্তৃক দখলীকৃত ভূমি থেকে সেনা প্রত্যাহার না করায় আনোয়ার সাদাত ইসরাইলের সাথে শান্তিচুক্তির প্রস্তুতি গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করে। দখলীকৃত ভূমি থেকে ইসরাইলের সেনা প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত শান্তিচুক্তির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আরব বুঝতে পারে, তাদের কলঙ্কের দাগ মুছতে এবং হারানো ভূমি ফিরিয়ে আনতে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই। ফলে ১৩৯৩ হিজরিতে (১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) রমজান মাসে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে আরব জয় লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্র ও

ইসরাইল ছয়দিনের যুদ্ধে দখলীকৃত ভূমি থেকে সেনা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল আরবকে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করাতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। আনোয়ার সাদাত শান্তিচুক্তি করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। এ উদ্দেশ্যে সে ফিলিস্তিনের দখলীকৃত ভূখণ্ডে সফর করে। তার এই সফরে আরব ও মুসলিমবিশ্ব ভীষণভাবে আহত হয়। কারণ, সে সময়ে ইসরাইল লেবাননে এবং দখলীকৃত অঞ্চলে আরব ও ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বরতা ও নৃশংসতার সবরকম পদ্ধতির চর্চা চালাচ্ছিল।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল সাদাতের এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে মিশরের সাথে আলোচনা করতে আগ্রহী হয়। মুসলিমবিশ্ব ও মিশরের মাঝে শত্রুতা ও বিচ্ছেদ বহাল থাকে। আরববিশ্বের মাঝে সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তি অর্জনের জন্য ১৩৯৯ হিজরিতে (১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) শান্তিচুক্তি সংঘটিত হয়। এই শান্তিচুক্তির মাধ্যমে মিশর ইসরাইল কর্তৃক দখলীকৃত ভূমি ফিরে পায়। আরববিশ্ব মিশরের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে। ইসলামকেন্দ্রিক বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। সাদাত এই বিদ্রোহের ক্ষেত্রে দমন-রাজনীতির অনুসরণ করে। ১৪০১ হিজরিতে (১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে) অক্টোবরের বিজয় স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আততায়ীর হাতে নিহন হয় আনোয়ার সাদাত। তারপর প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ হুসনি মুবারক ক্ষমতা গ্রহণ করে।

* * *

পশ্চিম আরবদেশ

লিবিয়া

১৩৩০-১৩৩১ হিজরিতে (১৯১২-১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে) ইতালি উসমানিদের হাত থেকে লিবিয়া দখল করে নেয়। লিবিয়াতে ইতালিয়ান কর্তৃত্ব বিস্তার ছিল লিবিয়া দখলের ভূমিকাস্বরূপ। একপর্যায়ে ইতালি উসমানিদের লিবিয়া ছাড়তে বাধ্য করে। ইতালিয়ান দখলদারির বিরুদ্ধে প্রবল গণপ্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এই প্রতিরোধের নেতৃস্থানীয়দের মাঝে ছিলেন আজিজ আল-মিশরি। মিশরীয়রা লিবিয়ায় অবস্থানরত তাদের ভাই-বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখত। তারা তাদের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করে। অনেকে স্বেচ্ছায় প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। লিবিয়ানরা ইতালিয়ান দখলদারির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তারা উসমানিদের সাহায্য করে। কিন্তু উসমানিরা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়। পরবর্তী সময়ে আর স্থির হতে পারে না। মুসোলিনি ইতালির ক্ষমতা গ্রহণ করার পর তারা সংগঠিত হতে চেষ্টা করে। মুসোলিনি জনসংখ্যার কাঠামো পাল্টে দেওয়ার জন্য লিবিয়ায় অভিবাসনের দ্বার উন্মুক্ত করে। মুসোলিনি লিবিয়াকে ইতালির অংশ মনে করত। লিবিয়ানরা ত্রিপোলি ও বারাকা প্রদেশে পরস্পরকে সাহায্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা মুহাম্মাদ ইদরিস আস-সানুসিকে বাদশাহ নিযুক্ত করে।

মহান মুজাহিদ শাইখ উমর আল-মুখতার

তিনি ছিলেন সানুসি শাইখদের একজন। তিনি ইতালিয়ান দখলদারির বিরুদ্ধে লিবিয়ান মুজাহিদদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং ইতালিয়ানদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলেন। লিবিয়াতে ইতালিয়ানদের ভারসাম্য হারিয়ে যায়। তারপর লিবিয়ায় অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গ্রাজিয়ানির নেতৃত্বে বিশাল বড় বাহিনী প্রেরণ করে ইতালি। সারা দেশে ধ্বংসলীলা চলে। হাজার হাজার নাগরিককে হত্যা করা হয়। একপর্যায়ে তারা উমর আল-মুখতারকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। ১৩৫০ হিজরিতে (১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে) তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শহিদ করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ইংরেজ ও ফরাসি দখলদারি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। লিবিয়াকেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলো মিশরে অবস্থানরত ইংরেজ বাহিনীর ওপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা মিশরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এরপরই সংঘটিত হয় আলামেইনের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে অক্ষশক্তি পরাজিত হয়। মিত্রশক্তি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে লিবিয়ায় কর্তৃত্ব কায়েম করে। লিবিয়া ইংরেজ ও ফরাসিদের মাঝে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইংল্যান্ড বরাকা ও ত্রিপোলি প্রদেশ দখল করে, আর ফ্রান্স দখল করে ফাজান প্রদেশ।

লিবিয়ার স্বাধীনতা

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত থাকে। লিবিয়াকে স্বাধীন করার জন্য ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর প্রচেষ্টা এবং আরবলিগের কর্মতৎপরতা বেড়ে যায়। অবশেষে ১৩৭১ হিজরিতে (১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে) ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো লিবিয়াকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়।

লিবিয়ান জনগণ মুহাম্মাদ ইদরিস আস-সানুসিকে নিজেদের বাদশাহ নিযুক্ত করে। লিবিয়া আবরলিগে যোগ দেয়। লিবিয়ার রাজতন্ত্র একটি নেতিবাচক কাজ করে। সে ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে লিবিয়ায় তাদের সেনাবাহিনী অবস্থানের এবং সেনাক্যাম্প ও সামরিক বিমানঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দেয়। এই চুক্তির মেয়াদ ছিল বিশ বছর। তারপর মিশরে ত্রিপাক্ষিক হামলা হয়। এই হামলায় মিশরে আক্রমণ চালানোর জন্য ব্রিটেন লিবিয়ার ঘাঁটিগুলো ব্যবহার করে। এই যুদ্ধের পর আরবলিগের আদেশে লিবিয়া এই চুক্তি থেকে ফিরে আসে। লিবিয়া সরকার এই চুক্তি বাতিল ঘোষণা করে। লিবিয়াতে পেট্রোলের খনি আবিষ্কৃত হয়, যা লিবিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করে তোলে। লিবিয়ায় বহিরাগত সাহায্যের আর কোনো প্রয়োজন থাকে না।

লিবিয়ার অভ্যুত্থান ও রাজতন্ত্রের পতন

১৩৮৯ হিজরিতে (১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) লিবিয়ার শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফির নেতৃত্বে এক সেনা-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। অভ্যুত্থানে রাজতন্ত্র বাতিল করা হয় এবং কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ঘোষণা দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত সেই

লিবিয়া শাসন করছে।[১২] গাদ্দাফির আমলে লিবিয়ার রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বৈরিতা শুরু হয়। আমেরিকানদেরকে লিবিয়ার শেষ ঘাঁটি থেকেও বের করে দেওয়া হয়। ইতালিয়ান উপনিবেশও শেষ হয় লিবিয়ায়। লিবিয়া আরব ঐক্যকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে।

১৩৯১ হিজরিতে (১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে) মিশর, লিবিয়া ও সিরিয়ার মিলে আরব প্রজাতন্ত্র 'ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ১৩৯৪ হিজরিতে (১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) তিউনিসিয়া, ১৪০০ হিজরিতে (১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে) সিরিয়া ও ১৪০৪ হিজরিতে মরক্কোর সাথে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। গাদ্দাফি আমলে মিশরের সাথে লিবিয়ার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সে সময় আনোয়ার সাদাত ক্ষমতায় ছিল। ১৩৯৭ হিজরিতে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। তারপর হুসনি মুবারক আমলে সম্পর্ক উন্নত হয়। প্রাচ্যের সামরিক বাহিনীর প্রতি লিবিয়ার আগ্রহ ছিল। সেই প্রেক্ষিতে ১৩৯৫ হিজরিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে একটি চুক্তি সংঘটিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী বারো বিলিয়ন সমমূল্যের অস্ত্র ও সামরিক প্রশিক্ষণের বিনিময়ে লিবিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থল, নৌ ও বিমানঘাঁটি নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়।

লিবিয়ায় আমেরিকান আগ্রাসন

লিবিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি সশস্ত্র সংঘর্ষে রূপ নেয়। ১৪০৬ হিজরিতে (১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়ায় আক্রমণ করে। লিবিয়ার সাথে পাশ্চাত্যের শত্রুতা অব্যাহত থাকে। স্কটল্যান্ডের লকারবিতে একটি আমেরিকান বিমান বিস্ফোরণের সাথে জড়িয়ে পড়ে লিবিয়া। আমেরিকা লিবিয়ার কাছে বিস্ফোরণে অভিযুক্তদেরকে তুলে দেওয়ার দাবি জানায়। কিন্তু লিবিয়া এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে। তখন জাতিসংঘ লিবিয়ার ওপর বিমান-অবরোধ আরোপ করে। অন্য বিমানবন্দরে লিবিয়ান বিমান অবতরণ এবং লিবিয়ান বিমানবন্দরে অন্য কোনো বিমান অবতরণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই অবরোধের কারণে বড় ধরনের প্রভাব পড়ে লিবিয়ার ওপর। লিবিয়াকে সন্ত্রাসবাদী কিংবা

---

[১২]. লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার আল-গাদ্দাফি ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১১ সালে মার্কিন বাহিনীর হাতে নিহত হন। লেখক গ্রন্থটি ২০১১ সালের আগে রচনা করায় তাকে বর্তমান শাসক বলে অভিহিত করেছেন। -সম্পাদক

সন্ত্রাসে সমর্থনকারী রাষ্ট্র হিসেবে সিরিয়া, ইরান, আফগানিস্তান, সুদানের মতো দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। লিবিয়া লকারবির ঘটনায় অভিযুক্তদের অর্পণ করতে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। এরপর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ১৪২৫ হিজরিতে (২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে) লিবিয়া আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানকারীদেরকে পারমাণবিক অস্ত্র অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে লিবিয়ায় প্রবেশের অনুমতি দেয়।

তিউনিসিয়া

তিউনিসিয়া ফ্রান্সের, সাইপ্রাস ইংল্যান্ডের এবং আলজাস[১৩] ও লরেইন[১৪] হবে জার্মানির—এ মর্মে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও জার্মানি একমত হওয়ার পর ১২৯৮ হিজরিতে (১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে) ফ্রান্স তিউনিসিয়া দখল করে নেয়। ১২৯৫ হিজরিতে (১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) বার্লিন সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফ্রান্স তিউনিসিয়া দখল করে নেওয়ার পর নামমাত্র উসমানি আনুগত্য টিকে থাকে। পরে তোপকাপি প্রাসাদ অধিগ্রহণের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

আলজেরিয়া ও অন্যান্য দখলীকৃত দেশের মতো তিউনিসিয়াকেও ফ্রান্স ফরাসিকরণের চেষ্টা করে। কিন্তু তিউনিসিয়া তার ইসলামি বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। ফরাসি উপনিবেশ থেকে মুক্তির পাওয়ার উদ্দেশ্যে শুরু হয় জাতীয় ও গোত্রীয় আন্দোলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এর মাঝে হাবিব বোরগুবার নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিউনিসীয় জনগণ ও আরবলিগের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সংগ্রামের পর ১৩৭৬ হিজরিতে (১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে) ফ্রান্স তিউনিসিয়াকে স্বাধীনতা দেয়। হাবিব বোরগুবা তিউনিসিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়। ফ্রান্স বিজার্ট দখল করে রাখে। ১৩৮৩ হিজরিতে (১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) বিজার্ট থেকেও সেনাপ্রত্যাহার করে নেয় ফ্রান্স। বোরগুবা ১৪০৭ হিজরি (১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত তিউনিসিয়া পরিচালনা করে। পরে শারীরিক অবস্থার কারণে তাকে পদচ্যুত করা হয়। তারপর প্রেসিডেন্ট জাইনুল আবিদিন বিন আলি ক্ষমতা গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, মিশরের সাথে আবরবিশ্ব সম্পর্ক ছিন্ন করার পর আরবলিগকে

---

১৩. **আলজাস :** উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের, জার্মানির সীমান্তে অবস্থিত একটি প্রদেশ। -সম্পাদক

১৪. **লরেইন :** আলজাস সংলগ্ন ফ্রান্সের আরেক প্রদেশ। -সম্পাদক

কায়রো থেকে সরিয়ে তিউনিসিয়ায় নিয়ে আসা হয়। মিশরের সাথে আরবে সন্ধি হওয়ার পর ১৪০৯ হিজরিতে (১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) আরব লিগ পুনরায় মিশরে ফিরে আসে।

আলজেরিয়া

আলজেরিয়া দখলের ইচ্ছা পূরণের জন্য তুচ্ছ অজুহাত দাঁড় করায় ফ্রান্স, যাতে ভারত ও আমেরিকা মহাদেশে ক্ষমতা হারানোর ক্ষতিপূরণস্বরূপ আলজেরিয়া হয় আফ্রিকায় প্রভাব বিস্তারের সূচনা। ১২৪৬ হিজরিতে (১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে) ফ্রান্স আলজেরিয়া দখল করে নেয় এবং উসমানি শাসন বাতিল করে।

ফরাসি শক্তি আলজেরিয়াতে ঢুকে ফরাসিকরণ শুরু করার সময় থেকে ফরাসি উপনিবেশ প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে। আলজেরিয়া তার দ্বীন ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য হাজারো শহিদকে উৎসর্গ করে দেয়। এমনকি আলজেরিয়ার নামই হয়ে যায় 'মিলিয়ন শহিদের দেশ'। আলজেরিয়া সংগ্রামের অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন আমির আবদুল কাদের জাজায়িরি। তিনি ঔপনিবেশিকদের আক্রমণ চালানোর জন্য মাসকারাত ও হারানে ঘাঁটি গড়ে তোলেন এবং ফরাসিদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেন। ফরাসিরা তার সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। চুক্তিতে ফ্রান্স কর্তৃক আমির আবদুল কাদিরকে মধ্য ও পশ্চিম আলজেরিয়ার শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। তারপর ফরাসিরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে এবং আলজেরিয়ার আরও ভূখণ্ড দখল করতে সক্ষম হয়। আমির আবদুল কাদির মারাকেশে[১৫] পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু ফরাসিরা মারাকেশেও চাপ প্রয়োগ করে। মারাকেশের শাসক আবদুল কাদিরকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। আমির আবদুল কাদির শেষপর্যন্ত ফরাসিদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ফরাসিরা তাকে দামেশকে নির্বাসন দেয়। তিনি দামেশকে থাকা অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন।

---

১৫. আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী এবং উত্তরে ভূমধ্যসাগরের জিব্রাল্টার প্রণালি পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর আফ্রিকার দেশ মরক্কোর মারাকেশ-তেনসিফট-আল হৌজ অঞ্চলের মারাকেশ প্রদেশের রাজধানী। এটি দেশটির চতুর্থ মহানগর। -সম্পাদক

আলজেরিয়ার ওপর ফরাসি নির্যাতন বাড়তেই থাকে। দখলদাররা মুসলিমদের জমি বাজেয়াপ্ত করে ফরাসিদের দিতে শুরু করে এবং ফরাসিদেরকে আলজেরিয়ায় অভিবাসী হতে উৎসাহিত করে। এ ছাড়া আরবি ভাষা বাতিল করে ফরাসি ভাষার প্রচলন ঘটানোর চেষ্টা করে ফরাসিরা। আলজেরিয়ানদের মাঝে আজও আরবি ভাষার দুর্বলতা ও ফরাসি ভাষার দক্ষতা লক্ষ করা যায়। আলজেরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে ঔপনিবেশিকরা তার ফল ভোগ করতে থাকে।

অত্যাচার বাড়ার সাথে সাথে প্রতিরোধও ভীষণ হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আমির খালিদ বিন আবদুল কাদির প্রতিরোধ আন্দোলনের ঝান্ডা বহন করেন। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট উইলসন কর্তৃক ঘোষিত 'সেল্ফ ডিটারমিনেশন' বা স্বায়ত্তশাসনের মতো শান্তি স্থাপনের নানারকম মাধ্যম গ্রহণ করেন তিনি। কিন্তু ফরাসিরা তার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। তারপর ১৩৪৫ হিজরিতে (১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে) আলজেরিয়ার উলামায়ে কেরাম ইসলামি মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও ফরাসিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের আহ্বান জানান। মেসালি আল-হাজের নেতৃত্বে উত্তর আফ্রিকা 'জামাআ নাজমা' (স্টার গ্রুপ) আত্মপ্রকাশ করে। এই দলটি ফরাসি উপনিবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আলজেরিয়ার ফরাসি উপনিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের তীব্রতা বেড়ে যায়। জার্মানির সাথে সংঘটিত যুদ্ধে প্যারিস পদানত হয় এবং জার্মান বাহিনী প্যারিসে ঢুকে পড়ে। সে সময় আলজেরিয়ানরা ফরাসিদের সাহায্য করে। এই সাহায্যের বদলায় ফরাসিরা আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়ার পরিবর্তে ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শার্ল দা গল সেনা প্রত্যাহার না করার চেষ্টা করে। সে মনে করতে থাকে, আলজেরিয়া ফ্রান্সের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১৩৭৪ হিজরিতে (১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে) আলজেরিয়ার সবচেয়ে বড় বিদ্রোহের ঘোষণা দেওয়া হয়। কায়রোতে অস্থায়ী সরকারের কার্যালয় নির্ধারণ করা হয়। আরব রাষ্ট্রগুলো আলজেরিয়ান সেনাবাহিনী ও জনগণকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। দীর্ঘ আট বছর বিদ্রোহ অব্যাহত থাকে। বিদ্রোহে শহিদ হয় আলজেরিয়ার অসংখ্য সন্তান। ফ্রান্স আলজেরিয়ায় টিকি রাখার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৩৮২ হিজরিতে (১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) 'ইফিয়ান' চুক্তির মাধ্যমে আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা

দিতে বাধ্য হয় ফ্রান্স। আহমাদ বিন বিলা গণপ্রজাতন্ত্রী আলজেরিয়ার রাষ্ট্রপতিত্ব গ্রহণ করে। যদিও তার ঝোঁক ছিল সমাজতন্ত্রের প্রতি।

তানদুফ সংকট

তানদুফ প্রদেশ নিয়ে মরক্কো ও আলজেরিয়ার মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। ফ্রান্স তানদুফ প্রদেশ আলজেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মরক্কো তানদুফ ফিরে পাওয়ার দাবি জানায়। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে ১৩৮৩ হিজরিতে (১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) মরক্কো ও আলজেরিয়ার মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

সামরিক অভ্যুত্থান (১৩৮৫ হিজরি/১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ)

কর্নেল হোয়ারি বুমেদিন আলজেরিয়ার শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সারাদেশে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। আহমাদ বিন বেলাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সে নিজেই রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করে। ১৩৮৮ হিজরিতে (১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) তার শাসনামলে আলজেরিয়ার জলসীমায় পুনরায় ফরাসি নৌঘাঁটি স্থাপিত হয়। ১৩৯৮ হিজরিতে (১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) হোয়ারি বুমেদিন মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর আলজেরিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট শাজিলি বিন জাদিদ জয় লাভ করে। তার আমলে মরক্কো ও আলজেরিয়ার মাঝে সন্ধিচুক্তি হয়। কিন্তু তার শাসনামলেই দলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে 'ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট' জয় লাভ করে।

আলজেরিয়ায় অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় চাপ বাড়তে থাকে। কারণ, আলজেরিয়ার সামরিক শাসন অন্য কারও হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণ করতে সম্মত নয়; বিশেষ করে সেই 'অন্য কেউ' যদি হয় ইসলামপন্থী। একই সময়ে বাইরের ইসলামের শত্রুরা আশঙ্কা করছিল, ইরানের ইসলামি অভ্যুত্থানের[১৬] পর আরেকটি নতুন ইসলামি রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করতে

---

[১৬]. স্মর্তব্য যে, ইরানের শিয়া অভ্যুত্থানকে অনেকে ইসলামি বিপ্লব মনে করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইরানের এ বিপ্লব ইসলামি কোনো বিপ্লব ছিল না। বরং তা ছিল শিয়াদের একটি অভ্যুত্থান। আর শিয়াদের যতগুলো দল আছে, তার অধিকাংশই কাফের। ইরানের রাষ্ট্রক্ষমতায় বর্তমানে যারা আছে, তারা সবাই ইসনা আশারিয়া শিয়া, যাদের কুফরি সুস্পষ্ট হওয়ায় তারা সবাই দলগতভাবে কাফের। তাই এসব ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। -সম্পাদক

যাচ্ছে। সরকার যৌক্তিক কারণ ছাড়াই নির্বাচন বাতিল করে দেয়। তাই শাজিলি বিন জাদিদকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

আলজেরিয়ায় বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। আবদুল মালিক বিন হাবিলিস ক্ষমতা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারপর মুহাম্মাদ বুদিয়াফ ক্ষমতা গ্রহণ করে। আলজেরিয়ার পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। বিশৃঙ্খলা বেড়েই চলে। হাজারো আলজেরিয়ান নিহত হয়। প্রেসিডেন্ট বুদিয়াফ আন্নাবায় আততায়ীর হাতে নিহত হয়। তারপর আলি কাফি ক্ষমতা গ্রহণ করে। কিন্তু তারও বেশিদিন ক্ষমতায় থাকা হয়নি। আলজেরিয়ার সংগ্রামও বন্ধ করতে পারেনি সে।

তারপর প্রেসিডেন্ট জেরোওয়ালের আগমন ঘটে। সে ক্ষমতা গ্রহণ করে। তার আমলে কয়েকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সমালোচক নির্বাচনে জালিয়াতির ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে। আলজেরিয়ার গোলযোগ অব্যাহত থেকে যায়। প্রশাসন দেশ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং হাজারো মানুষের মৃত্যু ঠেকাতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তারপর আবদুল আজিজ বুতেফ্লিকার শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে। সে জাতীয় শান্তিস্থাপনের ঘোষণা দেয়। অতঃপর ধীরে ধীরে আলজেরিয়ায় স্থিতিশীলতা ফিরতে শুরু করে।

মরক্কো সাম্রাজ্য

আব্বাসি আমল থেকে ফরাসি দখলদারি পর্যন্ত এই সময়ে স্বাধীনতা অর্জনকারী সর্ববৃহৎ ইসলামি ভূখণ্ড হচ্ছে মরক্কো সাম্রাজ্য। পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারে ও আন্দালুসের মুসলিমদের সাহায্যকরণে মরক্কোবাসীদের বড় অবদান রয়েছে।

যখন আব্বাসি খিলাফত দুর্বল হতে শুরু করে এবং খিলাফতের সদস্যদের মাঝে অনৈক্য দেখা দেয়, তখন মরক্কোতে ইদরিসি রাজবংশের উত্থান ঘটে। ইদরিসিরা ১৭২-৩৭৫ হিজরির মাঝে মরক্কোতে কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হয়। তারপর ইদরিসি সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মরক্কোর গোত্রগুলো স্বাধীনতা লাভ করে। ফাতিমিরা চলমান অবস্থা কাজে লাগিয়ে মরক্কোর উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত কর্তৃত্ব বিস্তার করে।

তারপর মুরাবিতিরা ৪৪৮-৫৪১ হিজরি (১০৫৬-১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মরক্কো শাসন করে। ৫২৪ হিজরির (১১৩১ খ্রিষ্টাব্দের) মাঝে মুওয়াহহিদি খিলাফতের উত্থান ঘটে। ৬৬৮ হিজরি (১২৭০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত তাদের

সাম্রাজ্য টিকে থাকে। ৫৯১ হিজরিতে বনু মারিন তথা মারিন সাম্রাজ্য মরক্কোতে কর্তৃত্ব বিস্তার করতে শুরু করে। তারা ৯৫৭ হিজরি (১৫৫১ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত কর্তৃত্ব করে। এর মাঝে পর্তুগিজরা মরক্কোর অনেক অঞ্চল দখল করে নেয় এবং আন্দালুসে ইসলামের সর্বশেষ ঘাঁটি গ্রানাডার পতন ঘটে। পর্তুগিজদের দখলদারির সময় বুন ওয়াতাসের উত্থান ঘটে। পর্তুগিজ দখলদাররা যেসব অঞ্চল পদানত করে মুসলিমদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল, সেসব অঞ্চল থেকে দখলদারদের উৎখাত করার জন্য যুদ্ধ করে তারা।

তারপর হুসাইনি বংশীয় শাসকদের উত্থান ঘটে। জনগণ তাদের পাশে সমবেত হতে থাকে। তারা পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এবং ৯১৫-১০৬৯ হিজরি (১৫০৯-১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মরক্কো শাসন করে। তাদের শাসনামলে উসমানি খিলাফত আলজেরিয়ায় পৌঁছে মরক্কোর সীমানা পর্যন্ত চলে আসে। পর্তুগিজ ও স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় উসমানিরা মরক্কোর কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করত। মরক্কোর শাসকরাও অনেক সময় নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এবং যেকোনো বিদ্রোহ দমন করতে কিংবা পর্তুগাল ও স্পেনের শত্রুতা প্রতিরোধ করতে উসমানিদের সাহায্য নিত। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা মরক্কোর শাসকদের মনে উসমানিদের ব্যাপারে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। এ কারণে মরক্কোর অধিবাসীরা উসমানি নেতৃত্বের স্বীকৃতি দেয়নি। তেমনইভাবে স্প্যানিশ ও পর্তুগিজদের মোকাবিলায় মুসলিমদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি না করার ইচ্ছায় উসমানিরাও মরক্কোকে নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেনি।

হুসাইনি শাসকরা ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। মরক্কোর গোত্রগুলো তাদের শাসন থেকে মুক্ত হতে শুরু করে। এ সময় শাবানাত পরিবারের উত্থান ঘটে। শাবানাত পরিবার হুসাইনিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাদের প্রভাব শেষ করে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ফালালি শাসকদের উত্থান ঘটে। তারা শাবানাত পরিবারকে ধ্বংস করে দেয় এবং মরক্কোর অধিবাসীরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। আজ পর্যন্ত তারাই মরক্কো শাসন করছে।

মরক্কোর বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি

ফালালি শাসক মাওলা সুলাইমান মরক্কোর ওপর বিচ্ছিন্নতার রাজনীতি চাপিয়ে দেয়। সে স্পেনের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তিতে মরক্কোর কিছু উপকূলীয় শহরে স্প্যানিশদের দখলদারির স্বীকৃতি দেয় এবং ইউরোপ উপকূলে ও জাহাজে মরক্কোর আক্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। মরক্কোর ব্যবসায়ীদের ইউরোপে ব্যবসা পরিচালনার ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করে সে। এ ধরনের আরও কিছু পন্থা মরক্কোকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আলজেরিয়ায় ফরাসি দখলদারি শুরু হওয়া পর্যন্ত এই বিচ্ছিন্নতার রাজনীতি চলতে থাকে। মরক্কো আলজেরিয়ার মুসলিম ভাইদের পরিণতিতে প্রভাবিত হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

১২৯৭ হিজরিতে (১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে) অনুষ্ঠিত মাদ্রিদ সম্মেলনের কারণে মরক্কোতে ফরাসি দখলদারি-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পিছিয়ে পড়ে। সম্মেলনে সর্বসম্মতি ব্যতীত মরক্কোতে অনুপ্রবেশ না করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।

বিদেশি দখলদারি

ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলো ইসলামি বিশ্বে তাদের কর্তৃত্ব বিস্তারকে ভাগ করে নেয়। মিশর পড়ে ইংল্যান্ডের ভাগে, লিবিয়া আসে ইতালির ভাগে। মরক্কো স্পেন ও ফ্রান্সের মাঝে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উত্তরাঞ্চল আসে স্পেনের ভাগে, আর মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল হয় ফ্রান্সের। ১৩৩১ হিজরিতে (১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে) তাঞ্জিয়ার শহর আন্তর্জাতিক পরিচালনার অধীনে চলে আসে। তখন ভিনদেশি দখলদারির বিরুদ্ধে শুরু হয় তুমুল বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ।

এই বিদ্রোহের নেতাদের মাঝে অন্যতম প্রসিদ্ধ হলেন মুহাম্মাদ আবদুল কারিম খাত্তাবি। তিনি রিফ প্রদেশে স্প্যানিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন এবং স্পেনের বিরুদ্ধে বড় ধরনের বিজয় অর্জন করেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে স্পেনের দৃঢ় অবস্থান অবশেষে তাকে পরাজিত ও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে।

এদিকে ফ্রান্স আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার মতো মরক্কোর সংস্কৃতি-সভ্যতাকেও ফরাসিকরণের চেষ্টা করে। মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল

ধরানোর জন্য বারবারিয়ান জাতীয়তাবাদ তুলে ধরে ফ্রান্স। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলে আসে। যেসব মিত্র যুদ্ধশেষে মরক্কোকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সুলতান পঞ্চম মুহাম্মাদ তাদেরকে সাহায্য করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। মরক্কোর জনগণের আন্দোলন আরও বেড়ে যায়। কায়রোয় প্রতিষ্ঠিত হয় 'মরক্কো মুক্তি কমিটি'।

সুলতান পঞ্চম মুহাম্মাদ মরক্কোর সংকট জাতিসংঘের কাছে তুলে ধরে। ১৩৭৩ হিজরিতে ফরাসিরা সুলতান মুহাম্মাদকে নির্বাসনে পাঠায়। ফরাসি দখলদারির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়, ফরাসিরা টিকতে না পেরে পুনরায় সুলতান মুহাম্মাদকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে।

উপনিবেশের কবল থেকে মরক্কোর স্বাধীনতা

মরক্কোর স্বাধীনতার পর্যায়ক্রম

১৩৭৬ হিজরিতে (১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে) ফরাসিরা মরক্কোকে স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু ফরাসিরা মরক্কোতে কিছু সামরিক ঘাঁটি রেখে দেয়। ১৩৮১ হিজরিতে (১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে) শেষ ঘাঁটি গুটিয়ে নেয় ফরাসি সেনাবাহিনী। ফরাসি দখলদারির সময় যুক্তরাষ্ট্রও মরক্কোতে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। তারপর বাদশাহ দ্বিতীয় হাসান যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে ঘাঁটিটি সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে জন কেনেডির সাথে একমত হন।

মরক্কোয় মৌরিতানিয়াকে কেন্দ্র করে জটিলতা দেখা দেয়। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মৌরিতানিয়া মরক্কোর অধীনে ছিল। মৌরিতানিয়া থেকেই মুরাবিতিদের উত্থান ঘটে। মরক্কোতে ফরাসি ঔপনিবেশিকদের আগমনের আগ পর্যন্ত মৌরিতানিয়া মরক্কোর সাথে একরাষ্ট্রে হয়ে থাকে। ফরাসি উপনিবেশ মরক্কো ও মৌরিতানিয়ার মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। ১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে) মৌরিতানিয়ায় স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা দেওয়া হয়।

স্পেন কর্তৃক দখলীকৃত অঞ্চলসমূহ

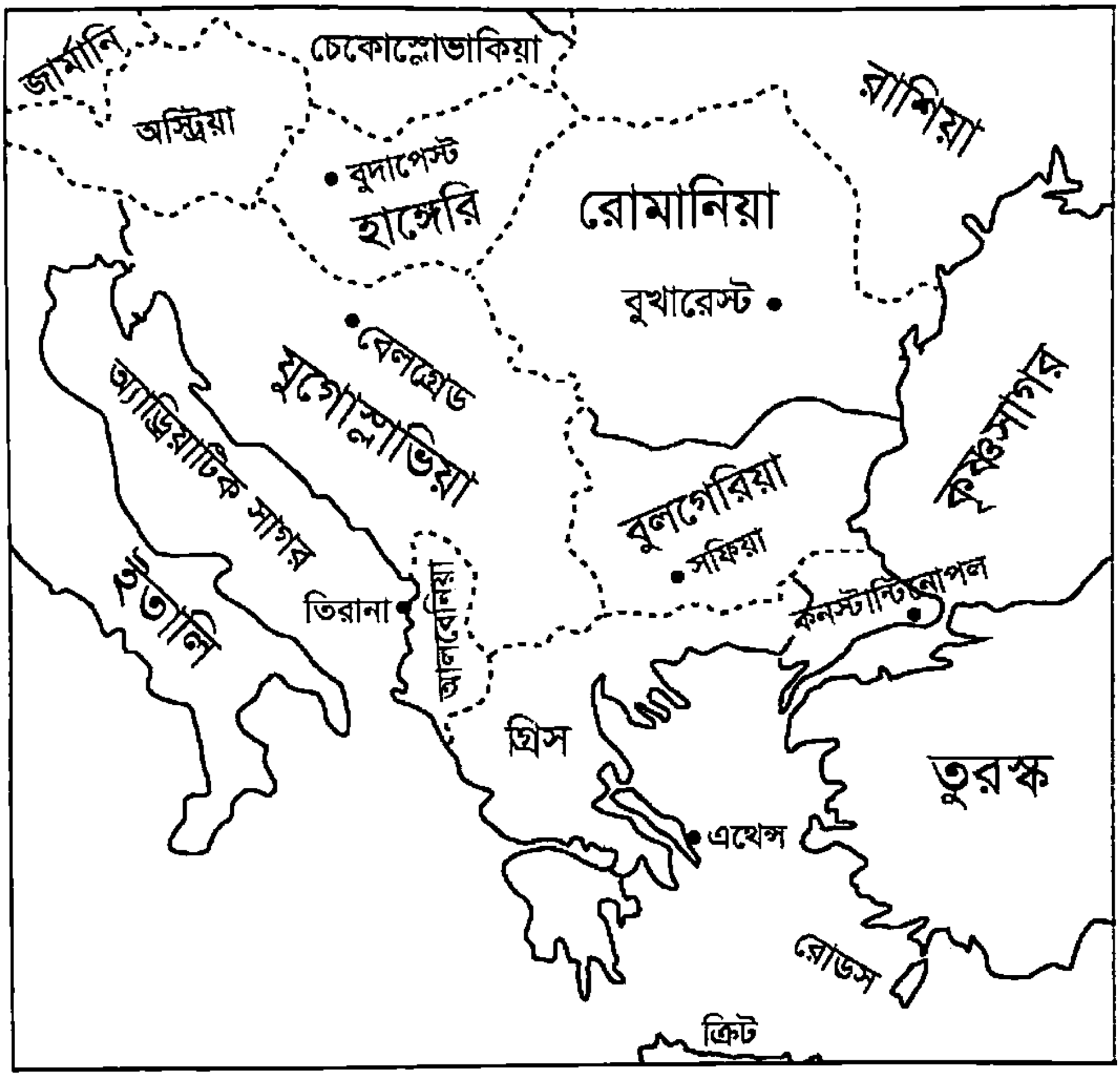
মরক্কো স্বাধীনতা লাভের পরও তার কিছু অঞ্চল স্পেনের অধীনে রয়ে যায়। তারপর মরক্কো তার অধিকাংশ অঞ্চলই ফিরে পায়। কিন্তু মেলিলিয়া ও সিবতাহ আজ পর্যন্ত স্পেনের দখলে রয়ে গেছে এবং মরক্কো এই শহর

দুটির দাবি আজও করে যাচ্ছে। ফরাসি উপনিবেশ যেসব সমস্যা রেখে গিয়েছিল তার মাঝে একটি ছিল 'সাহারা'-কেন্দ্রিক সমস্যা। সাহারার অধিবাসীরা মরক্কো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই লক্ষ্যে 'পোলিসোরিও ফ্রন্ট' গঠিত হয়।

মরক্কোর সাথে আলজেরিয়ার তানদুফ নিয়ে বিরোধ থাকায় শুরুর দিকে আলজেরিয়া পোলিসোরিও ফ্রন্টকে সাহায্য করে। কিন্তু ১৪০৮ হিজরিতে (১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে) আলজেরিয়া ও মরক্কোর মাঝে সন্ধিচুক্তি হয়। সাহারায় মরক্কোর সেনাবাহিনী থাকার পরও জাতিসংঘ সাহারায় পরিণতি নির্ধারণের জন্য গণভোটের আয়োজন করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

* * *

বলকান[17]



মানচিত্র নং-২৫

বলকান অঞ্চলের মানচিত্র

---

[17]. বলকান অঞ্চল বলতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলকে বোঝায়। এর পূর্বে কৃষ্ণ সাগর, পশ্চিমে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর। দানিয়ুব, সাভা ও কুপা নদীগুলো অঞ্চলটির উত্তর সীমানা নির্ধারণ করেছে। বুলগেরিয়া থেকে পূর্ব সার্বিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বলকান পর্বতমালার নামেই অঞ্চলটির নামকরণ হয়েছে। (উইকিপিডিয়া থেকে, ঈষৎ পরিমার্জিত) -সম্পাদক

বুলগেরিয়া

বুলগেরিয়ানরা মূলত তুর্কি বংশোদ্ভূত। ৩৫১ হিজরিতে তাতারদের আগমনের সময় বুলগেরিয়ানরা ভলগা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত বুলগার শহর (বর্তমানে কাজান) থেকে হিজরত করে এই ভূখণ্ডে চলে আসে এবং বলকানে স্থায়ী আবাস গড়ে নেয়। তারা যেসব অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, সেই অঞ্চলকেও তাদের পূর্ববর্তী শহরের নাম অনুসারে বুলগার বলতে শুরু করে। দুঃখজনক বিষয় হলো, তারা মুসলিম হয়েও পরবর্তীকালে খ্রিষ্টান হয়ে যায়। কারণ, তাদের চারপাশে সমাজের সবাই ছিল অর্থোডক্স খ্রিষ্টান। বুলগেরিয়ায় ইসলামি বিজয়ের সূচনা হয় উসমানিদের হাতে।

৭৭৪ হিজরিতে (১৩৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান প্রথম মুরাদ বুলগেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল জয় করেন। এরপর ৭৯৬ হিজরিতে (১৩৯০ খ্রিষ্টাব্দে) তার ছেলে প্রথম বায়েজিদ উত্তরাঞ্চল জয় করেন। তৈমুর লংয়ের সাথে যুদ্ধ হওয়ার পর বুলগেরিয়া উসমানিদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তারপর সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের আমলে উসমানিরা পুনরায় বুলগেরিয়াকে ফিরিয়ে আনে।

১২৯৫ হিজরিতে (১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) বার্লিনে সম্মেলন হওয়া পর্যন্ত বুলগেরিয়া উসমানিদের শাসনাধীন থাকে। সম্মেলনে ইউরোপিয়ানরা উসমানিদের ওপর বুলগেরিয়াকে স্বায়ত্তশাসন অর্পণ করার জন্য চাপ দেয়। বুলগেরিয়াতে পূর্বে অনেক মুসলিম ছিল। রাশিয়ান যুদ্ধের সময় খ্রিষ্টান নাগরিকরা মুসলিমদের অধিকাংশের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, যা বুলগেরিয়ার স্বায়ত্তশাসন লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করে। ফলে মুসলিমদের একটি অংশ উসমানি খিলাফত-শাসিত ভূমিতে পালিয়ে যায়। অন্যরা পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে এবং মুসলিমদের সাথে বুলগেরিয়ানরা যে আচরণ করেছে, তার প্রতিশোধ নিতে গেরিলা হামলা শুরু করে। তারপর ১৩২৬ হিজরিতে (১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে) বুলগেরিয়ানরা উসমানিদের থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে বুলগেরিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

এরপর ১৩৩০ হিজরিতে (১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে) প্রথম বলকান যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে বলকানের রাষ্ট্রগুলো উসমানি খিলাফতের শাসনাধীন পশ্চিম রোমেলিকে বলকানের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে একমত হয়। তারা

উসমানিদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। বুলগেরিয়া (তুরস্কের ইউরোপীয় অংশ) থ্রেস (তারাকিয়া) দখল করে নেয়। ম্যাকডোনিয়া বিভক্তি নিয়ে বলকানের সাথে তাদের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। বুলগেরিয়া পুরো ম্যাকডোনিয়া নিজেদের দখলে নিতে চায়। এই মতবিরোধের ফলে ১৩৩২ হিজরিতে (১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে) দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে বলকান উসমানিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। যুদ্ধে বুলগেরিয়া পরাজিত হয়। উসমানিরা থ্রেস (তারাকিয়া) ফিরে পায়। ম্যাকডোনিয়া গ্রিস, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার মাঝে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সার্বিয়া পায় ২৭%, বুলগেরিয়া ১০% এবং গ্রিস ম্যাকডোনিয়ার বাকি অংশ লাভ করে।

তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে বুলগেরিয়া অক্ষশক্তির সাথে যুক্ত হয়। অক্ষশক্তির পরাজয়ের কারণে বুলগেরিয়াও বিপর্যয়ের শিকার হয়। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের শুরুতে জার্মানি বুলগেরিয়া দখল করে নেয়। পরে জার্মানি পরাজিত হয়ে বুলগেরিয়া ত্যাগ করতে শুরু করে। এ সময় রাশিয়ান বাহিনী বুলগেরিয়ায় ঢোকে। যুদ্ধ শেষে রাশিয়া বুলগেরিয়াকে ওয়ারশ চুক্তিতে যোগ দিতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ান বাহিনী যেসব রাষ্ট্রে ঢুকেছিল, ওয়ারশ চুক্তিকে সেসব রাষ্ট্রে রাশিয়ান দখলদারি প্রতিষ্ঠার ভূমিকা মনে করা হয়। কারণ, সেসব রাষ্ট্রের মধ্য হতে কোনো রাষ্ট্রই ওয়ারশ চুক্তি থেকে পিছিয়ে আসতে পারেনি; বিরোধিতাও করতে পারেনি। রাশিয়াই এই চুক্তির নেতৃত্ব দেয়। বুলগেরিয়া ওয়ারশ চুক্তিতে যোগ দেওয়ার পর রাশিয়া বুলগেরিয়ায় কম্যুনিস্টদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করে এবং তাদের হাতেই বুলগেরিয়ার কর্তৃত্ব অর্পণ করে। আমরা পূর্বেই জেনেছি, বিশ্বের যেখানেই কম্যুনিজম (সমাজতন্ত্র) আত্মপ্রকাশ করেছে, সেখানেই ইসলামকে তার ঘোরতর শত্রু হিসেবে দেখেছে। কম্যুনিজম ইসলামের বিরুদ্ধে এমন নির্দয়ভাবে আগ্রাসন চালিয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোনো শাসনব্যবস্থায় যার নজির নেই।

৯—দ্রষ্টব্য—৩

বুলগেরিয়ার অধিকাংশ মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। ধ্বংসলীলা থেকে যে মসজিদগুলো বাদ পড়েছিল, সেগুলোকে নাট্যশালা কিংবা আস্তাবলে পরিণত করা হয়। এমনকি সফিয়ায় টিকে থাকা একমাত্র মসজিদটিকেও তারা জাদুঘরে পরিণত করে। মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টান বানানো পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তারা মুসলিম নাম পাল্টে খ্রিষ্টান নাম রাখতে বাধ্য করে, নারীদেরকে শালীনতা অবলম্বন করতে বাধা দেয়, অনাবৃত হতে বাধ্য করে তাদেরকে। মুসলিমদেরকে ইসলামি পন্থায় দাফন করতে বাধা দেয়, বিশেষ কবরস্থানে দাফন করার ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ঈদুল আজহায় বের হওয়ার ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করে তারা। ইসলামি নিদর্শন মুছে ফেলার জন্য এমন আরও অনেক পন্থা অবলম্বন করে তারা। এমনকি আজ পর্যন্ত মুসলিমদেরকে সংখ্যালঘু হিসেবে স্বীকৃতি দিতেও নারাজ তারা; অথচ মুসলিমদের জনসংখ্যা বুলগেরিয়ার অধিবাসীদের মাঝে ২১%-এর চেয়েও বেশি। মুসলিমদেরকে হজ আদায় করতে এবং বহির্বিশ্বের মুসলিম ভাইদের সাথে সম্পর্ক রাখতেও বাধা দেয় তারা। এতসব প্রতিকূলতা ও চাপ সত্ত্বেও বুলগেরিয়ার মুসলিমরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধে চেষ্টা করে যাচ্ছে। অনেকে কারাবরণ করছেন; দ্বীনের জন্য ভোগ করে যাচ্ছেন অনিঃশেষ কষ্ট-যাতনা।

৯—০—৩

রোমানিয়া

ওয়ালাচিয়া, মোলদাভিয়া, ট্রান্সসিলভানিয়া ও দুবরুজা মিলে বর্তমান রোমানিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক কাতারে দাঁড়ানোর জন্য ইউরোপের পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রদেশগুলোর ঐক্য সৃষ্টি হয়। ১২৯২ হিজরির (১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের) বার্লিন সম্মেলনের শর্ত অনুযায়ী রোমানিয়া উসমানিদের থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া রোমানিয়াকে ওয়ারশ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়

এবং কম্যুনিস্টদের হাতে রোমানিয়ার কর্তৃত্ব অর্পণ করে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ওয়ারশ চুক্তির অধীন রোমানিয়া কম্যুনিস্ট প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

রোমানিয়ার অধিকাংশ মুসলিম তুর্কিস্থান ও অন্যান্য দেশে হিজরত করে। রোমানিয়ার দুবরুজা ও ইদা কেল্লায়, মাজিদিয়া ও বাবাদাগে মুসলিমরা একত্র হতে শুরু করে। অধিকাংশ বাসিন্দা অর্থোডক্স খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। ওয়ারশ চুক্তি শেষ হয়, রোমানিয়ায় কম্যুনিস্ট শাসনেরও পতন ঘটে। কিন্তু কম্যুনিস্ট শাসনের সময় মুসলিমদের অবস্থা যেমন ছিল, তেমনই রয়ে যায়। ১৪১৯ হিজরিতে (১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) রোমানিয়াকে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়।

মোলদাভিয়া

মোলদাভিয়া মূলত সার্বিয়ার ভূখণ্ড ছিল। পরে রাশিয়া উসমানিদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। তারপর রোমানিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর রাশিয়া পুনরায় মোলদাভিয়া দখল করে এবং রোমানিয়ার জন্য শুধু দুবরুজা ভূখণ্ড ছেড়ে দেয়। মোলদাভিয়ায় অনেক মুসলিম বাস করত। মুসলিমদের ঐক্য ধ্বংস করার জন্য এবং মুসলিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে দুর্বল করার জন্য রাশিয়া মোলদাভিয়াকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করে। এক অংশ দেয় ইউক্রেনকে, আরেক অংশ রোমানিয়ার দখলে রয়ে যায়। আর বাকি অংশ নিয়ে গঠিত হয় মোলদাভিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র।

১৪১১ হিজরি (১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মোলদাভিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীন থাকে। তারপর স্বাধীনতা অর্জন করে। মোলদাভিয়ার মুসলিমদের ব্যাপারে আমাদের অবগতি খুবই কম। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনামলে এবং স্বাধীনতার পরও কম্যুনিস্টরা মোলদাভিয়ার মুসলিমদের তথ্য গোপন রেখেছে। তাই তাদের সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়।

হাঙ্গেরি

ভলগা নদীর অববাহিকা হয়ে মোঙ্গল বংশোদ্ভূত বাশকিরের কিছু মুসলিম গোত্রের হিজরতের মাধ্যমে হাঙ্গেরিতে ইসলাম প্রবেশ করেছে। হাঙ্গেরির চারপাশে খ্রিষ্টানদের বসবাস থাকা সত্ত্বেও হাঙ্গেরিয়ান মুসলিমরা ইসলামকে আঁকড়ে ধরে থাকে। তারপর ইউরোপ ক্রুসেড যুদ্ধের পরিকল্পনা করে। হাঙ্গেরির বাদশাহ লাদিস্লাউস ছিল ক্রুসেডের সবচেয়ে

শক্তিশালী সমর্থক। হাঙ্গেরিয়ান মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে কিংবা দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে তারা।

আন্দালুস ও মরক্কো থেকে অনেক দাঈ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হাঙ্গেরিতে আগমন করেছিলেন। খলিফা সুলাইমান কানুনির আমলে ৯৩৩ হিজরিতে (১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে) যখন হাঙ্গেরিতে উসমানি বিজয় সংঘটিত হয়, তখন হাঙ্গেরিতে মুসলিমদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল আড়াই লাখের অধিক। বুদাপেস্টে তিরাশিটিরও অধিক মসজিদ ছিল। অনেক ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কিন্তু ১১১১ হিজরিতে (১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানিরা হাঙ্গেরি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তখন মুসলিমদের ওপর চালানো হয় নির্যাতনের স্টিমরোলার। অধিকাংশ মুসলিম হিজরত করে। বেশিরভাগ মসজিদ ধ্বংস করা হয়। যেগুলো ধ্বংসের হাত থেকে মুক্ত ছিল, সেগুলো গির্জায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া হাঙ্গেরিকে ওয়ারশ চুক্তিতে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। তারপর ১৪০৯ হিজরিতে (১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) ওয়ারশ চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায়। হাঙ্গেরিতে এখনো হাজারো মুসলিম বাস করে। ১৪১৯ হিজরিতে (১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) হাঙ্গেরি ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার পথে এগিয়ে যায়।

স্লোভাকিয়া

স্লোভাকিয়া বোহেমিয়া (চেক প্রজাতন্ত্র) সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। তারপর আহমাদ কোপরিলির নেতৃত্বে উসমানিরা স্লোভাকিয়া জয় করে নেয়। বেশকিছু উসমানি পরিবার স্লোভাকিয়ায় আবাস গড়ে তোলে। স্লোভাকিয়াবাসীদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর ১১১১ হিজরিতে (১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে) যখন ভলেন্ডের রাজা সুবেস্কি উসমানিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে, তখন উসমানিরা স্লোভাকিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং স্লোভাকিয়া অস্ট্রিয়ার অধীনে চলে যায়। অস্ট্রিয়া মুসলিমদের ওপর ক্রুসেডীয় বিদ্বেষ ঢেলে দেয়। তখন মুসলিমরা হিজরত করে। অনেককে হত্যা করা হয়।

অস্ট্রিয়া বোহেমিয়া তথা চেককে পদানত করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চেকোস্লোভাকিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে নেয়। তারপর রাশিয়ান বাহিনী

চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করে এবং ওয়ারশ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কম্যুনিস্টরা চেকোস্লোভাকিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ১৪০৯ হিজরিতে (১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) কম্যুনিজমের পতন ঘটে। চেক শান্তিচুক্তির মাধ্যমে স্লোভাকিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায়। চেক ও স্লোভাকিয়া দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ব্রাতিস্লাভা স্লোভাকিয়ার রাজধানী।

অস্ট্রিয়া

উসমানিদের সাথে অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ লেগেই থাকত। উসমানিরা ইউরোপে অস্ট্রিয়ার অনেক ভূখণ্ড দখল করে নেয়। এমনকি অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করে উসমানিরা দুবার ভিয়েনা অবরোধ করে। একবার খলিফা সুলাইমান কানুনির যুগে, আরেকবার খলিফা চতুর্থ মুহাম্মাদের যুগে। কিন্তু তারা অস্ট্রিয়া বিজয় করতে পারেনি। যখন উসমানিরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অস্ট্রিয়া উসমানি সাম্রাজ্যের থেকে শেষ অংশ পর্যন্ত টুকরো করে ফেলে, তখন মুসলিমরা অস্ট্রিয়ার অধিকৃত অঞ্চলগুলো থেকে অস্ট্রিয়ার মূল অংশে হিজরত করে। এই মুসলিমদের অধিকাংশই ছিল বসনিয়ান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় উসমানি ও অস্ট্রিয়ার মাঝে ঐক্য সৃষ্টি হয়। বিশ্বযুদ্ধে উভয়ের পরাজয়ের মাধ্যমে এই ঐক্য শেষ হয়ে যায় এবং অনেক ভূখণ্ড তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। জার্মানি অস্ট্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তারপর যখন জার্মানি পরাজিত হয়, তখন রাশিয়া প্রবেশ করে অস্ট্রিয়াতে। কিন্তু রাশিয়ানরাও অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে। এরপর অস্ট্রিয়া প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্যের কোনো সামরিক বাহিনীর সাথে যোগ দেয়নি।

পূর্বের তুলনায় অস্ট্রিয়ার আয়তন অনেক হ্রাস পায়। অস্ট্রিয়ায় মুসলিমরা সংখ্যালঘু। তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি।

গ্রিস

প্রথম মুসলিমদের আমলেই ক্রিট, রোডস ও অন্যান্য দ্বীপে ইসলামি বিজয় পৌঁছে যায়। কিন্তু মুসলিমরা স্থির হতে পারেনি। রোম পুনরায় দখল করে নিয়ে মুসলিমদের সমূলে ধ্বংস করে দেয়। তারপর উসমানি বিজয় শুরু হয়। সমগ্র গ্রিস, এজিয়ান, ক্রিট ও রোডস দ্বীপ বিজিত হয়। গ্রিসের অর্ধেক অধিবাসীই ছিল মুসলিম। তারপর ইউরোপ গ্রিসকে উসমানিদের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে শুরু করে এবং অস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ ও সৈন্য দিয়ে

তাদেরকে শক্তি জোগায়। একপর্যায়ে গ্রিস উসমানিদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করে গ্রিস সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে।

স্বাধীন গ্রিসের আয়তন ছিল মোরা উপদ্বীপের চেয়েও ছোট। তারপর ইউরোপ উসমানি সাম্রাজ্যের অনুপাতে গ্রিসের ভূখণ্ড সম্প্রসারিত করতে থাকে এবং উসমানিদেরকে আরও বেশি ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। গ্রিকরা মুসলিমদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। অনেক মুসলিমকে তারা উসমানি শাসনাধীন ভূখণ্ডে হিজরত করতে বাধ্য করে।

তারপর প্রথম বলকান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে উসমানি সাম্রাজ্যের শাসনাধীন পূর্ব রোমেলি প্রদেশের অনেক ভূখণ্ড গ্রিসের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। উসমানি সাম্রাজ্য পূর্ব রোমেলি প্রদেশ হারানোর পর গ্রিস ও সার্বিয়া মিলে আলবেনিয়ার ভূখণ্ডগুলোকে একে একে টুকরো করে ফেলে। তারপর ম্যাকডোনিয়া বিভক্তিকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে ম্যাকডোনিয়ার বড় অংশ গ্রিসের ভাগে আসে। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। মিত্রশক্তি অনেক উসমানি ভূখণ্ড দখল করে নেয়। মিত্রশক্তির কর্তৃত্ব আনাতোলিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারা উসমানি ভূখণ্ডে গ্রিকদেরকে জায়গা করে দেয়। তুরস্ক ও গ্রিসের মাঝে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। মিত্রশক্তি তুরস্কের অনেক অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তবে যুদ্ধে তুর্কিরা জয় লাভ করে। গ্রিসের বিরুদ্ধে তুর্কিদের সবচেয়ে বড় বিজয় ছিল সাকারিয়ার বিজয়।

গ্রিস কর্তৃক অধিকৃত অধিকাংশ ভূমি ফিরিয়ে আনে তুর্কিরা। উদ্ধারকৃত ভূমির মাঝে ইস্তাম্বুল, ইজমির, পূর্ব থ্রেস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গ্রিকরা এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ দখল করে রাখে।

তুর্কি ও গ্রিকদের মাঝে মুসলিমদের সাথে অর্থোডক্স খ্রিষ্টান বিনিময়ের চুক্তি সংঘটিত হয়। অনেক মুসলিম হিজরত করে, যাদের সংখ্যা ছিল গ্রিসের অধিবাসীদের চার ভাগের এক ভাগ। গ্রিসের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম নিধন চলে। ক্রিট, রোডস দ্বীপের মুসলিমরা অধিকাংশ গ্রিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। এ সময় গ্রিসে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ২.৫ মিলিয়ন। বর্তমানে সেই সংখ্যা কোয়ার্টার মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

ഇ—দ্রষ্টব্য—ঊ

আজ পর্যন্ত এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও সাইপ্রাসে গ্রিস ও তুরস্কের মাঝে যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। পরস্পরে হুমকি ও দোষারোপ করে যাচ্ছে, যার কারণে সার্বক্ষণিক উত্তেজনা বিরাজ করছে। এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩৯৩ হিজরিতে (১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) গ্রিসে রাজতন্ত্র বাতিল করে গণতন্ত্রের ঘোষণা দেওয়া হয়। গ্রিসে তুর্কি, আলবেনিয়ান, বুলগেরিয়ানরা সংখ্যালঘু হিসেবে বাস করে, যাদের অধিকাংশই মুসলমান।

ഇ—০—ঊ

আলবেনিয়া

উসমানি সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের আমলে আলবেনিয়া বিজিত হয়। সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের আমল পর্যন্ত ইস্কান্দার বেকের বিদ্রোহ-আন্দোলন অব্যাহত থাকার পরও আলবেনিয়া ভূখণ্ডে উসমানিদের কর্তৃত্ব টিকে থাকে। এতদঞ্চলে উসমানিরা স্থিতিশীল হয়। তারপর মেসিডোনিয়া ও বলকানের অন্যান্য ভূখণ্ড মিলে পূর্ব রোমেলি রাষ্ট্র গঠিত হয়। পূর্ব রোমেলিও উসমানি শাসনের অধীনে থেকে যায়। তারপর প্রথম বলকান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উসমানি সাম্রাজ্য পরাজিত হয়। আলবেনিয়া উসমানিদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। গ্রিক ও সার্বিয়ার লোভাতুর দৃষ্টি পড়ে আলবেনিয়ার ওপর। গ্রিক ও সার্বিয়ানরা আলবেনিয়ার অনেক অঞ্চল দখল করে নেয়। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। বর্তমানে যে ভূখণ্ডজুড়ে আলবেনিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, সেই ভূখণ্ড দখল করে ইতালি। তারপর অক্ষশক্তি পরাজিত হয়। ইতালি ছিল অক্ষশক্তির অন্যতম রাষ্ট্র। ইউরোপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামরিক শক্তিকে ভাগ করে ফেলে। আলবেনিয়া পড়ে রাশিয়ার ভাগে। রাশিয়া আলবেনিয়াকে ওয়ারশ চুক্তিতে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর সমাজতন্ত্র কায়েম করে আলবেনিয়ায়।

উসমানি শাসনামলে অধিকাংশ আলবেনিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে। এজন্য ইউরোপ আলবেনিয়াকে বিভক্ত করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। এদিকে

আলবেনিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর আগ্রহ বাড়তে থাকে। উসমানি শাসনামলের আয়তনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশে কমে আসে আলবেনিয়ার আয়তন। তাই আলবেনিয়ার পতাকায় দুই মাথা বিশিষ্ট ঈগলের ছবি খচিত। একটি মাথা ডান দিকে ফেরানো, অন্যটি বাম দিকে। যা গ্রিক ও সার্বিয়া কর্তৃক দখলীকৃত আলবেনিয়ান ভূখণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করছে।

আলবেনিয়ার অধিকাংশ জনগণ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট শাসন ইসলামি কর্মকাণ্ডের ওপর সংকীর্ণতা আরোপ করে। মুসলিমবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় আলবেনিয়াকে। ইউরোপ আলবেনিয়াকে সবচেয়ে দরিদ্র ইউরোপিয়ান দেশে পরিণত করে।

১৪০৯ হিজরিতে (১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) ওয়ারশ চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার পর আলবেনিয়া মুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত হয়। আলবেনিয়া ইসলামি সম্মেলন সংস্থাতে যোগ দেয়। এই সংস্থা স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোকে সদস্য করে গণতান্ত্রিকদের হাতে তুলে দেয়। ইউরোপিয়ানরা আলবেনিয়ায় স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে শুরু করে। মূলত এই প্রচেষ্টা ছিল বিশ্বের নানা দেশে চলতে থাকা মুসলিম নিধনেরই একটি অংশ। স্বয়ং ক্রুসেডার ইউরোপ কর্তৃক নৃশংসতম অপরাধ ঘটিয়ে বসনিয়াকে বিভক্ত করার পর ইউরোপিয়ান বাহিনী বসনিয়ায় নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করে নেয়।

ইউরোপিয়ান অর্থবিনিয়োগ সংস্থা আলবেনিয়ার প্রতি মনোযোগী হয়। এই সংস্থার মাধ্যমে আলবেনিয়ার দরিদ্র জনগণকে প্রতারণা করে। জনগণ মনে করতে থাকে, এই সংস্থায় অর্থসম্পদ বিনিয়োগ করলে তাদের দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য দূর হবে। ইউরোপিয়ান সংস্থা তাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভের ঢল নামবে। ইউরোপিয়ান অর্থবিনিয়োগ সংস্থা আলবেনিয়ান সঞ্চয়কারীদের টাকা স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগ করে। তারপর ইউরোপিয়ান ক্রুসেড-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে তার সব টাকা খুইয়ে বসে।

এতে স্বর্বস্ব বিনিয়োগকারী আলবেনিয়ান জনগণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আলবেনিয়া সরকারের কাছে জবাবদিহিতা দাবি করে। আলবেনিয়ায় বিশৃঙ্খলা ও বিভক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আলবেনিয়ান বিদ্রোহীদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করে ইউরোপিয়ান সামরিক বাহিনী। বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে আলবেনিয়াতে। প্রশাসন নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আলবেনিয়ানরা তাদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারিয়েছে এবং নতুন সরকার গঠনের জন্য

নির্বাচনও পরিচালনা করতে হবে—এই অজুহাতে উদ্ভূত বিশৃঙ্খলার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইউরোপ পুলিশরূপী সামরিক বাহিনী প্রেরণ করে আলবেনিয়াতে।

দ্রষ্টব্য

এভাবে খ্রিষ্টান ইউরোপিয়ানরা আলবেনিয়ায় পা রাখে এবং আলবেনিয়া ও ইউরোপের সকল মুসলিমকে ধ্বংস করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আলবেনিয়ায় অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে শুরু করে। নির্বাচনে কম্যুনিস্টরা জয়ী হলে ইউরোপিয়ানরা আলবেনিয়া ও সারা বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রত্যাবর্তনকেই প্রাধান্য দেয়।

০

যুগোস্লাভিয়া

যুগোস্লাভিয়া বলতে দক্ষিণ স্লাভিক উদ্দেশ্য। কয়েকটি জনগোষ্ঠী এই ভূখণ্ডে অবস্থান করে। তারা হলো সার্বিয়ান, ক্রোয়েশিয়ান, বসনিয়ান, (বসনিয়া ও কুমান গোত্রগুলো তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভলগা নদীর অববাহিকায় অভিবাসী হয় এবং বলকানের স্থায়ী নাগরিক হয়ে যায়) ম্যাকডোনিয়ান, আলবেনিয়ান, স্লোভেনিয়ান ও মন্টেনিগ্রিন।

সার্বিয়া উসমানিদের থেকে স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার পর পুরোপুরি স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। সেই সাথে উসমানি ভূখণ্ডে তাদের সীমানা সম্প্রসারিত করার চেষ্টাও করতে থাকে। তারপর যখন সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো উসমানিদের থেকে পুরোপুরি স্বাধীনতা লাভ করে, তখন তারা আরও বেশি উসমানি ভূমি দখল করার চেষ্টা করতে শুরু করে। এতে প্রথম বলকান যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে এবং সত্যি সত্যিই সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো ও তাদের মিত্রশক্তিগুলো মিলে উসমানিদেরকে বুলগেরিয়া, রোমানিয়া ও গ্রিস থেকে; অর্থাৎ পূর্ব রোমেলি রাষ্ট্র থেকে এবং বলকান ভূখণ্ড থেকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়। বাকি থাকে কেবল ইস্তাম্বুল।

তারপর ম্যাকডোনিয়াকে মিত্র রাষ্ট্রসমূহের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার জন্য সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ। সার্বিয়া ম্যাকডোনিয়ার ২৭% লাভ করে।

সে সময়ে বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া ও দালমাতিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলগুলো ছিল অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন। আর সার্বিয়া আলবেনিয়ান ভূখণ্ডে লাগাতার আক্রমণ করে কসোভো, সানজাক[১৮] ও অন্যান্য আলবেনিয়ান অধ্যুষিত অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল।

সারাজেভোয় অস্ট্রিয়া সম্রাটের ক্রাউন প্রিন্স হত্যাকাণ্ডে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। সার্বিয়াকে হত্যার জন্য দায়ী করা হয়। অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও উসমানি সাম্রাজ্য মিলে গঠিত হয় অক্ষশক্তি। এরই মাঝে রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালি মিলে গঠিত হয় মিত্রশক্তি। সার্বিয়াও যুদ্ধে প্রবেশ করে মিত্রশক্তির পক্ষ নেয়। যুদ্ধে মিত্রশক্তি জয় লাভ করার পর বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভেনিয়াকে সার্বিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে তারা উপযুক্ত পুরস্কার দেয়।

অস্ট্রিয়া অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়; সমুদ্রে তাদের কোনো দখল বাকি থাকে না। অস্ট্রিয়ান দখলদারি দেশত্যাগে বাধ্য করা কিংবা হত্যার মাধ্যমে বসনিয়ায় মুসলিমদের হার কমিয়ে দেয়। তারপর সার্বিয়ানরা মুসলিম নিপীড়ন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যেতে থাকে। এরই মাঝে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সার্বিয়া এবারও মিত্রপক্ষের কাতারে দাঁড়ায়। সার্বিয়া জার্মানদের দখলে চলে যায়। জার্মানি সত্তাগতভাবেই সার্বিয়া ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ এবং ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভেনিয়ার প্রতি ঘনিষ্ঠতা লালন করে। কারণ, সার্বিয়া ছিল অর্থোডক্স খ্রিষ্টান, আর ক্রোয়েশিয়া ছিল ক্যাথলিক খ্রিষ্টান। তাদের আকিদা-বিশ্বাস ছিল অধিকাংশ জার্মানের মতো।

যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হওয়ার পর রাশিয়ান বাহিনী জার্মানদেরকে সার্বিয়া থেকে বিতাড়িত করে। তারপর রাশিয়া নিজেও সার্বিয়া ত্যাগ করে। রাশিয়া মনে করেছিল, উসমানিদের আমলে কিংবা বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাশিয়া সার্বিয়াকে যে ঐতিহাসিক সাহায্য করেছে, সেই সাহায্য সার্বিয়াকে

---

১৮. **সানজাক :** উসমানি শাসনামলে এটি ছিল প্রশাসনিক একটি বিভাগ। -সম্পাদক

ওয়ারশ চুক্তিতে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু সার্বিয়া তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত করে ওয়ারশ চুক্তিতে অংশগ্রহণ করে না। এই ওয়ারশ চুক্তিকে মনে করা হতো মিত্রদেশগুলোতে রাশিয়ান দখলদারি গোপনের এক প্রতারণা। তারপর যুগোস্লাভিয়া প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। সার্বিয়ানদের প্রাধান্য না দেওয়ার ব্যাপারে জনগণকে অনুপ্রাণিত করার জন্য 'যুগোস্লাভিয়া' নামটি নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা ছিল বিপরীত। কূটনৈতিক পরিমণ্ডলে ও সামরিক বাহিনীতে ৮০% ছিল সার্বিয়ানরা। কোনো মুসলিমকে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো না।

জোসেফ ব্রোজ টিটোর নেতৃত্বে যুগোস্লাভিয়ায় কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই সার্বিয়ানরা মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ উগড়ে দেয়। তারা সারাজেভোতে তিন হাজার এবং বসনিয়ার তুলজা নগরীতে হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করে। এই গণহত্যায় প্রায় ষাট হাজার মুসলিমকে হত্যা করে সার্বিয়া। এই জঘন্য গণহত্যার পর নিহতদের বসনিয়ার ভলগা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। নিহতদের আধিক্যে ভলগার পানি লাল বর্ণ ধারণ করে।

ক্রোয়েশিয়ার মুফতিকে হত্যা করা হয়। মেসিডোনিয়ার সার্বিয়ান শাসনাধীন অঞ্চলে অনেক মুসলিম নেতাকর্মীকে ফাঁসি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। যুগোস্লাভিয়ার নানা প্রান্তে অনেক নেতাকর্মীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। অনেক মসজিদ ধ্বংস করা হয়। যে বেলগ্রেড শহরে প্রায় ২৭০টি মসজিদ ছিল, তার অধিকাংশই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। বাকিগুলো নাইটক্লাব কিংবা আস্তাবলে পরিণত হয়। পুরো বেলগ্রেডে একটিমাত্র মসজিদ টিকে থাকে। ইসলামি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। অভিবাসী চুক্তি হয় যুগোস্লাভিয়া ও তুরস্কের মাঝে। ফলে লক্ষ লক্ষ মুসলিম যুগোস্লাভিয়া থেকে তুরস্কে চলে আসে। যুগোস্লাভিয়াকে ছয়টি ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে ভাগ করা হয়। প্রজাতন্ত্রগুলো এই :

১. সার্বিয়া : দুটি স্বায়ত্তশাসিত ভূখণ্ডজুড়ে সার্বিয়া গঠিত হয়েছিল। একটি ভোজভোডিনা, যার রাজধানীর নাম নোভি সাদ। আর অপরটি কসোভো, যার রাজধানী ক্রিস্টিনা।

২. ক্রোয়েশিয়া (ক্রোয়েশিয়া অর্থ : ক্যাথলিক)। ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগরেব।

৩. বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা : সারাজেভো এই দুই রাষ্ট্রের রাজধানী।

৪. মেসিডোনিয়া : মেসিডোনিয়ার রাজধানীর নাম স্কোপজে।

৫. স্লোভেনিয়া : এর রাজধানী লুবজানা।

৬. মন্টেনিগ্রো : মন্টেনিগ্রোর রাজধানী পোডগোরিকা।

বসনিয়ার বেশকিছু অঞ্চল দখল হয়ে যায়। ক্রোয়েশিয়া, মন্টেনিগ্রো ও সার্বিয়া বসনিয়ার অঞ্চলগুলো নিজেদের সীমানাভুক্ত করে নেয়। ঠিক এই সময়ে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার জনসংখ্যার কাঠামো পাল্টে দেওয়ার জন্য সার্বিয়ান ও ক্রোয়েশিয়ান নাগরিকরা স্রোতের মতো আসতে শুরু করে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাতে। ফিলিস্তিন যুদ্ধে আরবদের সাথে একদল বসনিয়ান মুজাহিদ অংশগ্রহণ করে।

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় ইসলামি আন্দোলন শুরু হয়। সার্বিয়া শক্ত হাতে এই আন্দোলনের মোকাবিলা করে। ১৪০১ হিজরিতে (১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে) কম্যুনিস্ট সরকার শাসনব্যবস্থা পাল্টে দেওয়ার অভিযোগে বসনিয়ার তরুণ মুসলিম আন্দোলনের সদস্যদের গ্রেফতার করে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। তাদের মাঝে আলি ইজ্জত বেগোভিচও ছিলেন। সার্বিয়ানরা অবশ্য এর পূর্বেই তরুণ মুসলিম আন্দোলনের সদস্যদের বন্দি করে।

স্লোবোডান মিলোসেভিক যুগোস্লাভিয়ার ক্ষমতাসীন কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং কসোভোর স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে। তার আগমন হয়েছিল বৈশ্বিক সমাজতন্ত্রের শেষ যুগে। কারণ, এর মাঝে ওয়ারশ চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সারা বিশ্বে, বিশেষত ইউরোপে বহু কম্যুনিস্ট শাসনব্যবস্থার পতন ঘটেছিল।

১৪১১ হিজরিতে (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভেনিয়া যুগোস্লাভিয়া থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। 'গ্রেট সার্বিয়া' (যুগোস্লাভিয়া) ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা করে সার্বিয়া। সার্বিয়ান সেনাবাহিনী ক্রোয়েশিয়ায় আক্রমণ করে। অতঃপর স্লোভেনিয়া শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পৃথক হয়ে যায়। ক্রোয়েশিয়ায় যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। আড়াল থেকে ইউরোপ ও ভ্যাটিকান পরিচালনা করত পোপ। কারণ, তারা ছিল ক্যাথলিক। আর সার্বিয়ানরা ছিল অর্থোডক্স। সিকিউরিটি কাউন্সিল ক্রোয়েশিয়ায় যুদ্ধ বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রদান

করে। জাতিসংঘ সার্বিয়ান ক্রোয়েশিয়ান ফ্রন্টের ১৪,০০০ সৈন্য প্রেরণ করে। সার্বিয়া ক্রাজিনা ও স্লোভেনিয়ায় সৈন্য বহাল রাখে। বাকি যুগোস্লাভিয়ান সৈন্যকে বসনিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। যুগোস্লাভিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যেকোনো প্রচেষ্টা বন্ধ করার জন্য বসনিয়ার ৬৫% ভূখণ্ডে অবস্থান নেয় সার্বিয়ান সৈন্যরা। মুসলিমরা যুগোস্লাভিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নিরাপদ পন্থা অবলম্বন করে। বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলি ইজ্জত বেগোভিচ যুগোস্লাভিয়ার সাথে থাকা কিংবা বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত জানাতে গণভোটের ঘোষণা দেয়।

ঠিক এই সময়ে বসনিয়ায় অবস্থানকারী যুগোস্লাভিয়ান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সার্বিয়ান নাগরিকদের মাঝে অস্ত্র বিতরণ করছিল। গণভোটে যুগোস্লাভিয়া থেকে বসনিয়া বিচ্ছিন্ন হওয়ার মত বিজয়ী হয়। ফল প্রকাশের সাথে সাথেই সার্বিয়া মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ বাধানোর কৌশল খাটায়। বসনিয়ার ৬৫% ভূখণ্ডে বসনিয়ার সার্বিয়ানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়ায় সার্বিয়া। এই ৬৫% ভূখণ্ডে যুগোস্লাভিয়ান বাহিনী কর্তৃত্ব করছিল। অথচ সে সময়ে বসনিয়ায় সার্বিয়ানদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩০%, যাদের অধিকাংশই (সবাই নয়) বসনিয়ায় এসেছিল জনসংখ্যার অনুপাত পাল্টে দেওয়ার জন্য। এতে করে বিশ্ব জানতে পারল, বসনিয়ায় সার্বিয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বসনিয়া সরকারের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধ চলছিল বসনিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার সার্বিয়ানদের মাঝে।

প্রত্যাশিতভাবেই বসনিয়া সরকার এই সার্বিয়ান সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে। ফলে ১৪১২ হিজরিতে (১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে) বসনিয়া সরকারের পক্ষগ্রহণকারী অস্ত্রহীন মুসলিম ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সার্বিয়ানদের মাঝে যুদ্ধে শুরু হয়। সার্বিয়ানরা এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটায়, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সার্বিয়ান ধর্মীয় যাজকরা এই হত্যাযজ্ঞের বৈধতা দিচ্ছিল আর বিশ্ববাসী নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল, কেউ কিছুই করছিল না। বসনিয়া ও ক্রোয়েশিয়ার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের আচরণ ছিল দ্বিমুখী।

ক্রোয়েশিয়ায় সার্বিয়ান আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জাতিসংঘ সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল। কিন্তু বসনিয়ার জন্য কিছুই করেনি; বরং বসনিয়াতে সার্বিয়ান দখলদারি মজবুত করার জন্য একদল সৈন্য পাঠিয়ে

দিয়েছে। জাতিসংঘ বসনিয়াকে বিভক্ত করার জন্য ভ্যান্স-ওয়েন পরিকল্পনা পেশ করে এবং সার্বিয়ান, ক্রোয়েশিয়ান ও মুসলিমদের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তা সৃষ্টি করে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিমদের দেওয়া হবে বসনিয়ার আয়তনের ৪৪%, ক্রোয়েশিয়ানদের ২০% এবং সার্বিয়ানদের দেওয়া হবে ৩৭%। মুসলিম ও ক্রোয়েশিয়ানরা এই পরিকল্পনার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে, কিন্তু সার্বিয়ানরা বসনিয়ার ৭০%-এর বেশি ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব করত বলে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ইসলামের শত্রুরা শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব দূর করে বসনিয়াকে গিলে খাওয়ার জন্য তাদেরকে এক করে দিয়েছিল।

সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়া তাদের মাঝে চলমান যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে এবং ক্রোয়েশিয়ার যে ভূখণ্ডে সার্বিয়ানরা বাস করে, সে ভূখণ্ডের স্বায়ত্তশাসন প্রদানে একমত হয়। তারপর মুসলিমদের বিরুদ্ধে মৈত্রীচুক্তি করে সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়া। ক্রোয়েশিয়া মুসলিমদের সাথে গাদ্দারি করে। মুসলিমরা মনে করেছিল, বসনিয়াকে রক্ষা করতে এবং সার্বিয়ার আগ্রাসন থামিয়ে দিতে বসনিয়ায় ক্রোয়েট সেনাবাহিনী পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এই শক্তি দখলদারদের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে সার্বিয়াকে মুসলিম নিধনে সাহায্য করতে শুরু করে। সারাজেভো অবরোধকারী সার্বিয়ান সৈন্যরা মুসলিমদের ওপর মর্টারশেল নিক্ষেপ করতে শুরু করে। এমনকি এক সার্বিয়ান নেতা বলে, তারা ইউরোপকে ইসলামি জাগরণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মুসলিমদের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।

ইসলামের শত্রুরা এতটুকু করেও ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা সাবেক যুগোস্লাভিয়ার ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মূলত এই নিষেধাজ্ঞা ছিল মুসলিমদের ওপর। সার্বিয়ান ও ক্রোয়েটদের কাছে ইউরোপ ও ইহুদিদের থেকে অবাধে অস্ত্র আসতে থাকে। সার্বিয়াকে রাশিয়া ও আশেপাশের অর্থোডক্স খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলো সাহায্য করতে থাকে। অনুরূপ ইহুদিরাও সাহায্য করে। এদিকে ভ্যাটিকান ও ভ্যাটিকানের আড়াল থেকে ইউরোপ ক্রোয়েশিয়াকে সাহায্য করে। সার্বিয়া বসনিয়ায় ৭২% ভূখণ্ডে এবং ক্রোয়েশিয়া ২০% ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর ১০%-এর চেয়েও কম ভূখণ্ড মুসলিমদের দখলে থাকে। এতকিছুর পরও

মুসলিমদের সংখ্যা দাঁড়ায় বসনিয়ার মোট জনসংখ্যার ৫০%। কারণ, সবকিছুর পর আল্লাহর ইচ্ছাই বহাল থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

> 'তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নুর নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর নুরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন; যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।' [সুরা আস-সফ : ৮]

মুসলিমরা ইমানের অস্ত্রে সজ্জিত হয়। আল্লাহর ওপর উত্তম তাওয়াক্কুল করে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয় তারা। অপর পক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে পাওয়া অস্ত্রই ছিল মুসলিমদের অস্ত্রের প্রধান উৎস। ক্রোয়েশিয়া ফ্রন্টের ওপর মুসলিমদের আক্রমণ বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে মুসলিমরা ষাট হাজার ক্রোয়েট সৈন্যবিশিষ্ট একটি অঞ্চল আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। ক্রোয়েশিয়া বসনিয়ানদের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। বিশেষ করে বসনিয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়ার মাঝে হিসাব বুঝে নেওয়ার পরিণতি নিয়ে চিন্তা করে ক্রোয়েশিয়া। মুসলিমদের সাথে পুনর্বার মৈত্রীচুক্তির ইচ্ছাপোষণ করে। মুসলিম শাসনাধীন ভূখণ্ড ও ক্রোয়েশিয়া-শাসিত বসনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ভূখণ্ড মিলে গঠিত হয় ফেডারেল ইউনিয়ন।

ক্রোয়েশিয়ার যে ভূখণ্ডে সার্বিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই ভূখণ্ড ফিরিয়ে আনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ক্রোয়েশিয়ার সেনাবাহিনীকে ভালোভাবে প্রস্তুত করেছিল। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র সার্বিয়াকে রাশিয়া ও ইউরোপে কম্যুনিজমের শক্তি হিসেবে বিবেচনা করত। সত্যি সত্যিই অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে ক্রোয়েশিয়া সার্বিয়ার হাত থেকে স্লোভেনিয়া ও ক্রাজিনা মুক্ত করে। এই ঘটনা ছিল ওই বিষয়সমূহের একটি, যেগুলো সার্বিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুসলিমদের অগ্রাভিযানে কাজে লেগেছে। ক্রোয়েশিয়ায় কেবল পূর্ব স্লোভেনিয়ার ভূখণ্ডটি সার্বিয়ার দখলে রয়ে যায়, যা ক্রোয়েশিয়ার মোট আয়তনের ৫%।

বিশ্ববিবেক জেগে উঠতে শুরু করে। মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলনে মুসলিমরা ঘোষণা দেয়, তারা বসনিয়ার ওপর অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য নয়। জাতিসংঘ হুমকি দেয়, যদি সার্বিয়া বেসামরিক

মানুষের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে, তাহলে জাতিসংঘ সার্বিয়ার ওপর বিমান হামলা চালাবে।

কিন্তু সার্বিয়া জাতিসংঘের হুমকির কোনো পরোয়াই করে না। বসনিয়ার সার্বিয়ান নেতা রাদোভান কারাদিচ ও সেনাবাহিনীর প্রধান রাটকো ম্লাডিচ মুসলিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যেতে থাকে। সার্বিয়ানরা যখন মুসলিম অধ্যুষিত স্রিব্রিয়ানিকা ও জাইবা শহর দখল করে, তখন পনেরো হাজারেরও বেশি মুসলিমকে হত্যা করা হয়।

জাতিসংঘ সার্বিয়ায় কয়েকটি বিমান হামলা চালায়। তারপর যখন সার্বিয়া জাতিসংঘের সৈনিকদের মানব-ঢাল রূপে ব্যবহার করতে শুরু করে, তখন জাতিসংঘ হামলা বন্ধ করে দেয়। তারপর সার্বিয়া জাতিসংঘের সৈনিকদের মুক্ত করে দেয়। বসনিয়ায় সার্বিয়ান যুদ্ধে জাতিসংঘের কয়েকটি বিমান বিধ্বস্ত হয়।

বসনিয়ান ক্রোয়েট ও মুসলিমরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সার্বিয়া কর্তৃক দখলীকৃত ভূমির দিকে অভিযান চালিয়ে অনেক ভূখণ্ড মুক্ত করে নেয়। একপর্যায়ে মুসলিমরা বসনিয়ার ৩১% ভূখণ্ডে আর ক্রোয়েশিয়া ২০% ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বাকি ৪৯% সার্বিয়ানদের দখলে রয়ে যায়।

ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলো মুসলিদের এই অগ্রগতিতে ভয় পেয়ে যায়। তিন পক্ষকেই যুদ্ধ বন্ধের ও ডেটন চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য চাপ দেওয়া হয়। ডেটন চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়, বসনিয়াতে দ্বিপাক্ষিক ফেডারেল রাষ্ট্র গঠিত হবে। একটি হবে সার্বিয়ান, যারা বসনিয়ার ৪৯% ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব করবে। আর অপরটি হবে মুসলিম ও ক্রোয়েটদের মাঝে বিভক্ত।

এই চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে মুসলিমদের প্রতি জুলুম প্রকাশ পায়। চুক্তি দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। বসনিয়াতে তিনটি সেনাবাহিনীর তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রেসিডেন্সি বোর্ড গঠন করা হয়, যা সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়াকে যেকোনো সময় সহজে বসনিয়া থেকে পৃথক হওয়ার সুযোগ এনে দেয়। ডেটন চুক্তি কার্যকর রাখার জন্য সেনাবাহিনী রাখা দরকার—এই অজুহাতে যেন বসনিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর প্রভাব বজায় রাখা যায়, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র মুসলিমদেরকে এই চুক্তি মেনে নিতে চাপ দিতে থাকে।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়ার জন্য মুসলিমরা এই চুক্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। চুক্তি করার এ ছাড়া আরেকটি কারণও

ছিল। তা হলো, এই সুযোগে ইউরোপে আশ্রয়গ্রহণকারী মুসলিমরা বসনিয়ায় ফিরে আসতে পারবে। এতে মুসলিমরা তাদের শক্তি এক করতে পারবে এবং বসনিয়ার বাকি অংশ স্বাধীন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে। বসনিয়ার প্রেসিডেন্সি বোর্ডের নেতৃত্বের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট আলি ইজ্জত বেগোভিচ জয় লাভ করে। এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র মুসলিমদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অস্ত্র দিতে গড়িমসি শুরু করে।

বসনিয়ায় যুদ্ধ চলাকালে মেসিডোনিয়া শান্তিচুক্তির মাধ্যমে যুগোস্লাভিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায়। মেসিডোনিয়ায় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ভোটে যুগোস্লাভিয়া থেকে আলাদা হওয়ার মত জয় লাভ করে। সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো মিলে নতুন যুগোস্লাভিয়া প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়।

দ্রষ্টব্য

> যুগোস্লাভিয়াতে আলবেনিয়ান মুসলিম অধ্যুষিত কসোভো নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়। কসোভো যুগোস্লাভিয়া থেকে আলাদা হতে চায়, কিন্তু সার্বিয়া শক্তভাবে কসোভোর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। বিদ্রোহীদের সাথে চরম নির্দয় আচরণ করা হয়। কসোভোর মতো মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশ সানজাকও ভাগাভাগি করে নেয় সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো।

বসনিয়া যুদ্ধের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, কুয়েত-সমস্যা ও সামরিক দ্বন্দ্ব নিরসন। বসনিয়া যুদ্ধের ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালনে পাশ্চাত্য-আমেরিকান নীতি ছিল দ্বিমুখী। অবশ্য এর উত্তর সবার জানা আছে। বিশ্বক্রুসেড শেষপর্যন্ত এক লক্ষ্যে গিয়ে মিলিত হয়। সে লক্ষ্য হলো মুসলিম নিধন। বসনিয়ার যুদ্ধে দুই লাখের অধিক মুসলিমকে হত্যা করা হয়। শরণার্থী হয় এর দ্বিগুণ মুসলিম। অনেক মুসলিমকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়, যাকে বলা হয় জাতিগত শুদ্ধিকরণের রাজনীতি। আর সেই স্থানগুলোতে সার্বিয়ানরা আস্তানা গেড়ে নেয়। তারা মুসলিমদের ওপর এমন নৃশংস হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, যার বিবরণ শুনে গা শিউরে ওঠে। অনেকে বিকলাঙ্গ ও পঙ্গুত্ব বরণ করে। সম্ভ্রম হারায় অনেক মুসলিম নারী। লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের এমন দৃষ্টান্ত আগে কখনো গত হয়নি।

শিশু, যুবতী ও বৃদ্ধাদের সম্ভ্রম লুটেই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং গর্ভবতী হওয়ার আগে তারা যুবতীদের ছাড়ত না, যাতে যুবতীরা অবৈধ সন্তান জন্ম দেয়। অনেক নারীর স্তন কেটে নেওয়া হয়, গর্ভবতী নারীদের পেট চিরে দেওয়া হয়। আমরা যত কথাই বলি না কেন, আসলে আমাদের পক্ষে এর নৃশংসতার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা শুধু বলতে পারি :

حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون.

পোল্যান্ড

তাতাররা যুদ্ধ করতে করতে পোল্যান্ডে এসে পৌঁছে। ইউরোপ অভিযানে পোল্যান্ডে এসে তাতাররা থেমে যায়। তাতাররা ইসলাম গ্রহণের পর পোলিশরা জার্মানির বিরুদ্ধে তাতারদের সাহায্য গ্রহণ করে। তাই কিছু মুসলিম তাতার সৈন্য পোল্যান্ডে থেকে যায় এবং স্থায়ীভাবে জীবনযাপন করতে থাকে। অনেক মসজিদ-মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করে তারা। উসমানি শাসনামলে স্বল্প সময়ের জন্য পোল্যান্ড উসমানি নিয়ন্ত্রণের অধীনে আসে। উসমানিরা পোল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারপর রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও বেলারুশ পোল্যান্ডকে ভাগ করে নেয়। মুসলিমদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি কয়েকবার তো পোল্যান্ডের নামই হারিয়ে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পুনরায় পোল্যান্ডের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তখন পোল্যান্ডে এক লাখেরও বেশি মুসলিম অবস্থান করে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি পোল্যান্ড দখল করে নেয়। যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হয়। তখন রাশিয়ান বাহিনী পোল্যান্ডে ঢুকে পোল্যান্ডকে ওয়ারশ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এই চুক্তির নামে পোল্যান্ডের রাজধানীর নামকরণ করা হয়। রাশিয়া পূর্ব পোল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে নেয়, এর পরিবর্তে পোল্যান্ডকে পূর্ব জার্মানির কিছু অঞ্চল দেয়। পোল্যান্ডে মুসলিমদের সংখ্যা কমতে শুরু করে। একপর্যায়ে মুসলিমদের সংখ্যা পঁচিশ হাজারে এসে পৌঁছে। আমরা জানি না, বাকিরা কোথায় হারিয়ে গেছে। হয়তো তাদেরকে দেশান্তর করা হয়েছে অথবা নিধন করা হয়েছে কিংবা তাদের অনেকেই রাশিয়ার অধিকৃত অঞ্চলে রয়ে গেছে।

সাইপ্রাস

খলিফা উসমান বিন আফফান রা.-এর যুগে মুসলিমরা সাইপ্রাস বিজয় করে। সে সময়েই সাইপ্রাসে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে রোম পুনরায় সাইপ্রাস দখল করে নেয়। তারপর থেকে উসমানিদের শাসনামলের পূর্বে আর মুসলিমরা সেখানে থিতু হতে পারেনি।

খলিফা দ্বিতীয় সেলিমের শাসনকালে উসমানিরা পুনরায় সাইপ্রাস জয় করে। তারপর ৯৭৯-১২৯৬ হিজরি (১৫৭২-১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত তিন শতাব্দীকাল মুসলিমদের অধীনে পরিচালিত হয় সাইপ্রাস। সাইপ্রাসে মুসলিমদের সংখ্যা দাঁড়ায় খ্রিষ্টানদের তিনগুণ। ১২৯৬ হিজরিতে ইংল্যান্ড উসমানিরদেরকে এই মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করে—উসমানিরা ইংল্যান্ডের জন্য সাইপ্রাস ছেড়ে দেবে, আর এর বিনিময়ে ইংল্যান্ড উসমানিদের সব ধরনের বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করবে।

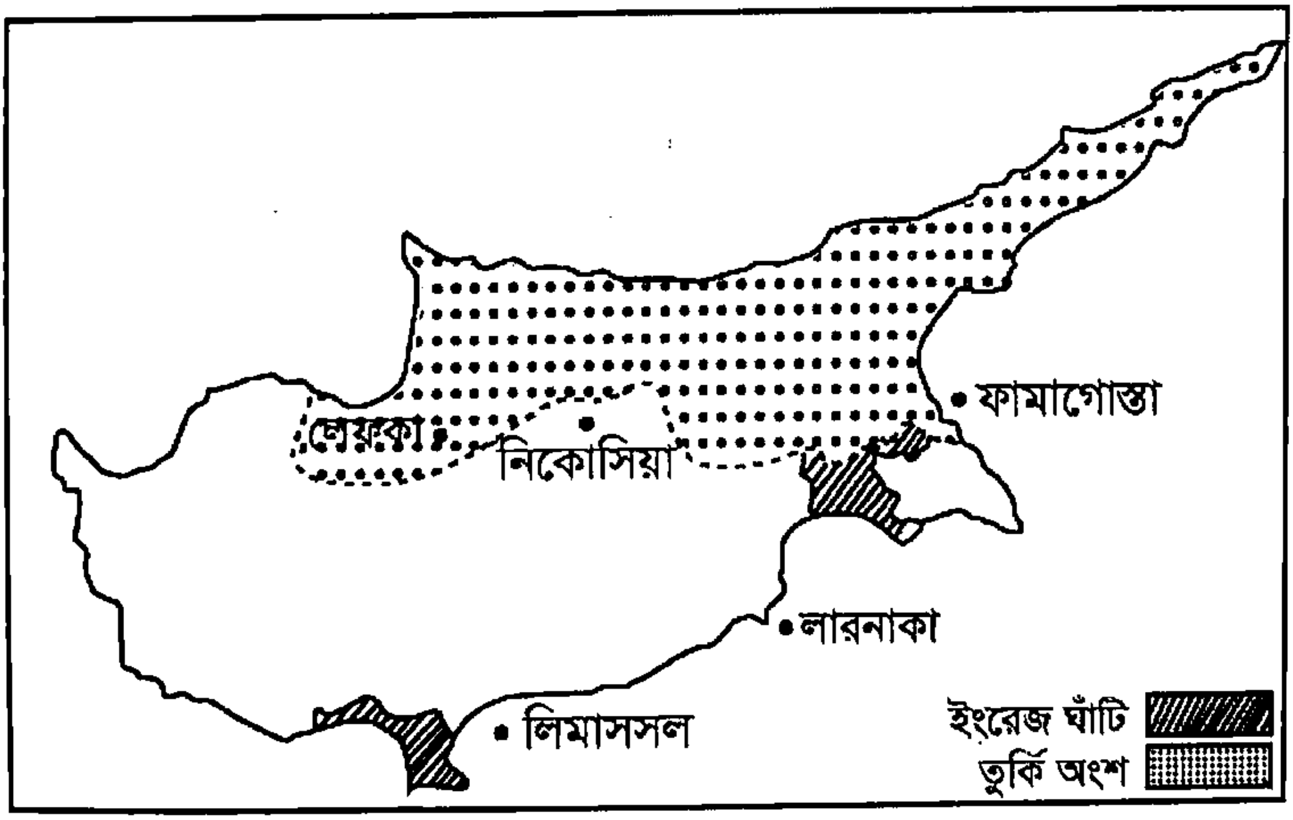
ইংল্যান্ডের স্বার্থ উদ্ধার হওয়ার সাথে সাথেই সাইপ্রাসের জনসংখ্যার অনুপাত পাল্টে ফেলতে শুরু করে। গ্রিকদেরকে সাইপ্রাসে অভিবাসী হতে আগ্রহী করে তোলে তারা। মুসলিমদেরকে দ্বীপ ত্যাগ করতে চাপ দেয়। তখন অনেক মুসলিম হিজরত করে। গ্রিসে কয়েকটি আন্দোলন হয়। এর মাঝে একটি আন্দোলনে গ্রিসের সাথে সাইপ্রাসকে মিলে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। আরেকটিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান করা হয়। মুসলিমদের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। মুসলিমরা গ্রিসের সাথে মিলতে ভয় পায়। কারণ, ক্রিট গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ক্রিটের মুসলিমদের ধ্বংস করা হয়েছিল।

তারপর ১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে) ইংল্যান্ড সাইপ্রাসকে স্বাধীনতা দেয়। স্বাধীনতা দেওয়ার শর্ত ছিল, সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট হবে গ্রিকবংশোদ্ভূত, ভাইস প্রেসিডেন্ট হবে তুর্কি বংশোদ্ভূত। সে সময়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সাইপ্রাসের মুসলিমদের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৯%, গ্রিকদের ৭৮% এবং ইহুদিদের ৩%।

ঞ্চ—দ্রষ্টব্য—ঞ্চ

১৩৯৪ হিজরিতে (১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট তৃতীয় ম্যাকারিয়ুসের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। তুরস্ক আশঙ্কা করে, সাইপ্রাস গ্রিসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তাই তুর্কি সশস্ত্র বাহিনীকে সাইপ্রাসে অবতরণ করার আদেশ দেওয়া হয়। তুর্কি বাহিনী সাইপ্রাসের মুসলিমদেরকে গ্রিসের ক্রুসেডীয় বিদ্বেষ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সাইপ্রাসের ৩৮% ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। সাইপ্রাসের মুসলিমরা তুর্কি বাহিনীকে স্বাগত জানায়। এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তুরস্ক ও গ্রিসের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বর্তমানেও সাইপ্রাসে এই অবস্থা বিরাজ করছে।

ঞ্চ—০—ঞ্চ



মানচিত্র নং-২৬

সাইপ্রাস দ্বীপ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ককেশাস

ককেশাস বা কাফাগাক রাজ্য বলতে ক্যাস্পিয়ান সাগর এবং কৃষ্ণসাগরের মাঝামাঝি অঞ্চলগুলো উদ্দেশ্য ।

আরব

এ অঞ্চলে ইসলাম বিজয়ী বেশে প্রবেশ করেছে। খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামলে ২২ হিজরি সনে (৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) সুরাকা বিন আমর আজারবাইজান জয় করেন এবং আবদুর রহমান বিন রবিয়া দাগিস্তানের ডারবেন্ড দিয়ে প্রবেশ করে জয় পূর্ণ করেন। এভাবে ইসলামি আমলে মুসলিমরা আজারবাইজান ও দাগিস্তান আবাদ করে। অতঃপর সুরাকা বিন আমর তার বিজয়াভিযান ককেশাস পর্যন্ত নিয়ে যান। খলিফা উসমান বিন আফফান রা.-এর আমলে আর্মেনিয়া ও কিরগিজ (জর্জিয়া) বিজিত হয়। অতঃপর আর্মেনিয়ার অধিবাসীরা ইসলাম ত্যাগ করলে হাবিব বিন মাসলামার নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী এসে তাদের পরাস্ত করে।

এ দেশে মুসলমানদের জন্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল ছিল না। সেখানে খাজারদের সাথে অনবরত যুদ্ধ চলছিল। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, ইসলাম পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয়ে চলছে, কিন্তু মধ্যাঞ্চল তখনও অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে আর্মেনিয়া ও কিরগিজ, যেখানে খ্রিষ্টানরা বসবাস করত। মুসলমানদের আনুগত্য থেকে সরে আসার জন্য রোমানরা তাদেরকে উৎসাহ দেয়। তারা প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং সেনাবাহিনী সরবরাহ করতে থাকে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে ৪৬৫ হিজরি (১০৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে। পরিশেষে ককেশাসের অধিকাংশ অংশেই সেলজুকরা প্রভাব বিস্তার করে।

মোঙ্গল

ককেশাসের সমস্ত অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মোঙ্গলীয় শাসন। যা ছিল জোচি বিন চেঙ্গিস খান পরিবারের অধীনে। মোঙ্গলরা ইসলামে প্রবেশ করলেও তারা ছিল এ বিষয়ে আনাড়ি। এজন্য তারা ককেশাসে ইসলাম

প্রচারের জন্য কোনো কাজ করেনি। তারা ককেশাস সীমান্তে ইলখানি রাজ্যের সাথে যুদ্ধ করে অনেকাংশই ককেশাসের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

অটোমান ও পারস্য

উসমানিরা ককেশাস ও ক্রিমিয়ার ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল; বিশেষ করে যখন রাশিয়ান হুমকি তীব্রতর হয় এবং তাতার রাজ্য মুসলমানদেরকে গ্রাস করে তখন উসমানিরা তাদেরকে থামিয়ে দেয়। এদিকে তারা পারস্যের সাথে ককেশাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল আর সাফাভিরা ককেশাসের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে ফেলেছিল। অতঃপর উসমানিরা সাফাভিদের দখল করা অংশ উদ্ধার করে। সাফাভি শিয়া সম্প্রদায়গুলো কখনো কখনো শিয়া মতবাদ গ্রহণের জন্য জনগণকে বাধ্য করেছে। বিশেষ করে তারা আজারবাইজানের লোকদেরকে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছিল। অতঃপর উসমানিরা তাদের সাম্রাজ্য থেকে শিয়া মতবাদের উত্থান বন্ধ করে দেয়।

সেখানে এমন কিছু গোত্র ছিল, যারা সার্কাসিয়ান ও অন্যান্য গোত্রের মতো তখনও ইসলামে প্রবেশ করেনি। উসমানি যুগে ককেশাসের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। অতঃপর কুবার্দি, আদিগে, আবখাজ এবং অস্ট্রিন, চেচনিয়ান, ইঙ্গুশগোত্রীয় লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। আর্মেনিয়ার অধিকাংশ লোক খ্রিষ্টান ছিল। আর ককেশাসের মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল সুন্নি। উসমানিরা তাদের কাছে নিয়ে আসার জন্য কাজ করছিল। এতে ককেশাসবাসী উসমানিদের প্রতি নমনীয় হয়। তারা উসমানিদেরকে তারা রাশিয়ার খ্রিষ্টান ও পারস্যের শিয়াদের ওপর প্রাধান্য দেয়।

পারসিয়ানরা তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে। নিজেদের রাজ্য মনে করে তারা ককেশাসের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেয়। একপর্যায়ে উসমানিরা তাদের থেকে তা দখল করে। এ সময়ে রাশিয়ানরা ককেশাসের দিকে নজর দিতে শুরু করে। কারণ, তারা এটাকে তাদের সাথে মিলিয়ে নিতে পারলে পারস্য ও উসমানিদের সামনে এ অঞ্চলটি রুশদের পক্ষে শক্তিশালী একটি দুর্গ হয়ে দাঁড়াবে। অন্যদিকে যারা তাদের মতাদর্শী ও ধর্মের অনুসারী ছিল এবং যাদেরকে রাশিয়া নিজেদের প্রজা মনে করত তাদেরকে কিরগিজ ও আর্মেনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়।

অতঃপর রাশিয়ানরা ককেশাসের মরু অঞ্চলে পৌঁছে তার আশেপাশের এলাকা দখল করে নেয়।



মানচিত্র নং-২৭
ককেশাস অঞ্চলের গোত্রসমূহ

পারসিয়ানরা ককেশাসের অধিকাংশ এলাকা উসমানিদের থেকে উদ্ধার করে। একসময় সাফাভি পারসিকরা দুর্বল হতে শুরু করে। পরে মির মুহাম্মাদ আফগানি সাফাভিদের রাজ্য দখল করতে আরম্ভ করে। রাশিয়ানরা এটাকে সুযোগ মনে করে দাগিস্তান দখল করে নেয়। এ অবস্থা দেখে উসমানিরা দ্রুত আর্মেনিয়া ও জর্জিয়াকে তাদের সাথে সংযুক্ত করে নেয়।

উসমানিরা রাশিয়ার গ্রেট পিটারকে হুমকি দেয় যে, ককেশাসে কোনোপ্রকার আগ্রাসন চালালে তাতে উসমানিদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। সাফাভিদের শেষ শাসক দ্বিতীয় তাহমাস্প রাশিয়ানদেরকে দাগিস্তান ও শিরভান দিতে বাধ্য হয়। আর উসমানিদের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় জর্জিয়া এবং পারস্যের অন্যান্য অংশ। ককেশাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উসমানি, রাশিয়ান ও পারসিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

রাশিয়ান উপনিবেশ

উসমানীয় ও পারসিকদের শক্তি দুর্বল হতে থাকে। ১১৫২ হিজরিতে (১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) বেলগ্রেড চুক্তিতে উসমানিরা কাবার্দিনো রাজ্যকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। রাশিয়ানরা কাবার্দিনো ও ককেশাসের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মিশন সহজ করতে পূর্বোক্ত চুক্তিটি করেছিল। রাশিয়ানরা ককেশাসে হস্তক্ষেপ করে ও তা অধিগ্রহণ করে। পারসিয়ান ও উসমানিদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিটি বিজয়ে ককেশাসে একটি করে নতুন অংশ সংযুক্ত হয়।



মানচিত্র নং-২৮

ককেশাসের ইসলামি রাষ্ট্র ও অঞ্চলসমূহ

ককেশাস জনগণের প্রতিরোধ

ককেশাসে রাশিয়ানদের আগমন এবং উসমানি ও পারসিয়ানদের প্রত্যাবর্তনের ফলে এখানকার মুসলমানদের একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তারা ১২৪১ হিজরিতে (১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে) দাগিস্তানে সরকার গঠন করে। যাদের অধিকাংশ ছিল আলম। শেখ শামিল ককেশাসে রাশিয়ান ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধে নেতৃত্ব দেন। তিনি শেখ মুহাম্মাদ আমিনকে সার্কাস রাজ্যে প্রেরণ করেন। মুসলিম আলেমগণ জনগণকে ক্রুসেডার ঔপনিবেশিকদের প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান। তখন মুসলমানরা রাশিয়ানদের বিপর্যস্ত করতে শুরু করল। বিশেষ করে এ

অঞ্চলের মানুষ পাহাড়ি প্রকৃতির কারণে কঠিন ও খুবই শক্তিশালী ছিল। তারা যুদ্ধে রাশিয়ানদের সমুচিত শিক্ষা দিতে থাকে। বিশেষ করে ওই সময় রাশিয়ানরা ক্রিমিয়ানদের সাথে যুদ্ধে জড়িত ছিল।

ক্রিমিয়ার সাথে যুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন ককেশাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার জন্য তিন লক্ষেরও বেশি সেনা মোতায়েন করা হয়। ১২৮১ হিজরিতে (১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে) রাশিয়ানরা শেখ শামিলকে বন্দি করে ও দেশের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে ভয়াবহ নির্যাতন চালায় এবং সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ করতে থাকে। বিশেষ করে দেশের জনসাধারণের মাঝে তারা বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়। যারা পূর্বেই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল। এ ছাড়াও মুসলমানদের প্রতি ক্রুসেডারদের স্থায়ী বিদ্বেষ ছিল। অনেক সার্কাসিয়ান, চেচেন, দাগিস্তানি ও অন্যান্য বন্দিরা রাশিয়ান ঔপনিবেশিকদের নির্মম অত্যাচারে বিভিন্ন মুসলিম দেশে হিজরত করে। উসমানিরা তাদের অনেককে স্বাগত জানায় এবং ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে মোতায়েন করে। যাতে তারা রণাঙ্গনে ইসলামের শত্রুদের সাথে বীরবিক্রমে কঠিনভাবে মোকাবিলা করার কৌশল অবলম্বন করে।

১২৯৫ হিজরিতে (১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) বার্লিন চুক্তি অনুযায়ী ইউরোপের সীমানা থেকে উসমানি সৈন্য ও ককেশাসের জনগণকে সরিয়ে নিতে বাধ্য করা হয়। ক্রুসেডারদের নির্যাতন ও প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে উসমানি সাম্রাজ্যের অনেকেই শাম ও ইরাকে আবাসন গড়ে। এবং রুশ ঔপনিবেশিক ককেশাসে যারা বাকি ছিল তারা চরম নির্যাতন ভোগ করে।

১৩৩৬ হিজরিতে (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে) রাশিয়ায় কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা গ্রহণ করলে তারা মুসলমানদের সাথে করা চুক্তি ভঙ্গ করে। তারা দেশকে ছোট ছোট প্রদেশে ভাগ করে। যাতে ককেশাসের গোত্রগুলো বিভক্ত হয়ে যায়। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন বেশিরভাগ ককেশিয়ান জনগণ রাশিয়ান হিংস্র দখলদারদের তুলনায় জার্মানির দখলদারদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। কিছু সংখ্যক লোক জার্মানদেরকে সহযোগিতাও করে। কিন্তু জার্মানরা যুদ্ধে হেরে যায় ও রাশিয়ানরা আবারও তা দখল করে নেয়।

এ সময় রাশিয়ানরা বেশিরভাগ ককেশিয়ানকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে অভিযুক্ত করে। চেচনিয়া ও অন্যান্য জাতির মতো অনেককেই সাইবেরিয়া ও কাজাখস্তানে দেশান্তর করে। অনুরূপ ব্যবহার করেছিল তারা তাতারদের

সাথে। অত্যাচারী স্টালিন মুসলমানদের ওপর ঘৃণা ও ক্ষোভের বিষ ঢেলে দেয়। সে সময় নির্বিচারে মুসলমানদের হত্যা করা হয়, যার সংখ্যা এগারো মিলিয়নে পৌঁছে। অনেকেই সাইবেরিয়ার অজ্ঞাত স্থানে হারিয়ে যায় আর নির্বাসিত অল্পকিছু লোক নিজ দেশে ফিরতে সক্ষম হয়। আর অনেকে তুরস্কে ও অন্যান্য ইসলামি দেশে হিজরত করে। জনসংখ্যা কাঠামো পরিবর্তন করে দিতে এতদঞ্চলে রুশ নাগরিকদের অনুপ্রবেশ ঘটায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও প্রজাতন্ত্র ইউক্রেন যেমনটি করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত ককেশাসের প্রজাতন্ত্র ও প্রদেশগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

দাগিস্তান

এটি পাহাড়ি দেশ হিসেবে পরিচিত। এটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, যা এখন পর্যন্ত রাশিয়ান ইউনিয়নের অনুসরণ করছে। তার রাজধানী হলো মাহাজকিল্লা (ম্যাকাচালা)। আর এখানেই রয়েছে ডারবেন্ড শহর।

উত্তর ওসেটিয়া

এটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র। এর রাজধানী ব্লাদিকাকজ। রাশিয়া ওসেটিয়াকে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত করার পর উত্তর অংশ রাশিয়ার সাথে ও দক্ষিণ অংশ জর্জিয়ার সাথে যুক্ত করা হয়। উত্তর ওসেটিয়ায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়লে রাশিয়া এ ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, কোনোদিন হয়তো ওসেটিয়ার অবশিষ্টাংশেও ইসলাম ছড়িয়ে পড়বে। এজন্য দক্ষিণ ওসেটিয়াকে ভাগ করে খ্রিষ্টান অধ্যুষিত জর্জিয়ার সাথে মিলিয়ে দেয়।

কাবার্দিনো বলকারিয়া

এটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতান্ত্রিক দেশ। এটি রাশিয়ান ইউনিয়নের সাথে যুক্ত। এখানে দুটি গোষ্ঠীর বসবাস। এগুলো হচ্ছে সার্কাসিয়ান বংশোদ্ভূত কাবার্ডিয়ান, আর তুর্কি বংশোদ্ভূত বুলগেরিয়ান। স্টালিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের সমর্থন দেওয়ার অভিযোগ ও বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে বুলগেরিয়াকে অভিযুক্ত করে তাদেরকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করে। অবশেষে তারা নির্দোষ প্রমাণিত হলে তাদের অনেকে দেশে ফিরে আসে।

কারাচাই-চের্কেসিয়া

এটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতান্ত্রিক দেশ। এটি রাশিয়ান ইউনিয়নের সাথে যুক্ত। এখানে দুটি গোষ্ঠীর বসবাস। একটি হলো তুর্কি বংশোদ্ভূত

কারাচাই, আরেকটি হলো সার্কাস । স্টালিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের পক্ষে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অভিযোগ ও বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে কারাচাইকে অভিযুক্ত করে তাদেরকে সাইবেরিয়ার বনাঞ্চলে নির্বাসিত করে। অবশেষে তারা নির্দোষ প্রমাণিত হলে দেশে ফিরে আসে।

আদিগিয়া

এটি হলো সার্কাসদের স্বায়ত্তশাসিত একটি প্রদেশ এবং রাশিয়ান ইউনিয়নের সাথে যুক্ত।

চেচনিয়া-ইঙ্গুশেতিয়া

এটি রাশিয়ান ইউনিয়নের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র। এখানে দুটি জাতির বসবাস। একটি হলো চেচনিয়ান অন্যটি ইঙ্গুশেতিয়ান। উসমানি শাসনামলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। চেচনিয়া ছিল রাশিয়ান ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। রাশিয়ার বিরুদ্ধে শেখ শামিলের যুদ্ধে তাদের বড় ভূমিকা ছিল। রাশিয়ানদের এ দেশটি দখলে নিতে দশ বছর লেগে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চেচেনরা বিশ্বাসঘাতকতা ও জার্মানদের সহযোগিতার কারণে অভিযুক্ত হয়েছিল। ফলে তাদেরকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়। অবশেষে স্টালিনের মৃত্যুর পর তারা স্বদেশে ফিরে আসে।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই, ইতিহাসের বিবর্তনে রাশিয়া কর্তৃক দুর্ভোগের শিকার ককেশীয় ও তাতার জনগোষ্ঠীর মধ্যে আজও পর্যন্ত রাশিয়ার প্রতি রয়েছে তীব্র ক্ষোভ। তাদের মধ্যে চেচেনরা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করত রাশিয়ানদের প্রতি। ফলে ১৪১১ হিজরিতে (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে) সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার সময় চেচেনরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অথচ তখন ইঙ্গুতেশিয়ানরা রাশিয়ার নৃশংসতার ভয়ে তাদের অনুগতই থেকে যায়। এমনইভাবে রাশিয়ার স্বায়ত্তশাসিত মোঙ্গলিয়া ও ককেশাসসহ অন্যান্য প্রদেশও রাশিয়ানদের অনুগামীই থেকে যায়।

চেচনিয়ার স্বাধীনতাকে রাশিয়া স্বীকৃতি দেয়নি। তাই তারা প্রাথমিকভাবে বিরোধীদেরকে সাহায্য করার প্রস্তাব করে এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য তাদেরকে অস্ত্রের জোগান দেয়। আর এটাকে রাজ্য নিয়ন্ত্রণের উপায় মনে করে রাশিয়া। কিন্তু তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। কারণ, জওহার

দুদায়েভের নেতৃত্বে চেচেনরা বিরোধী দলকে ভেঙে দেয়। এতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলতসিন গভীর হতাশা ও ক্ষোভে জর্জরিত হয়। বিশেষ করে রাশিয়া থেকে চেচনিয়া যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তাহলে ককেশাস ও মঙ্গোলিয়ার জনগণও রাশিয়া থেকে স্বাধীনতা অর্জনে উৎসাহিত হবে। এজন্য ১৪১৪ হিজরিতে (১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) রাশিয়ান বাহিনী চেচনিয়ায় আক্রমণ চালায় এবং রাজধানী গ্রোজনিতে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু রাশিয়ার সৈন্যরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং গ্রোজনির রাস্তায় রাস্তায় তাদের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ব্যর্থ হামলার পর বরিস ইয়েলতসিনের বিরোধীরা হইচই শুরু করে দেয়। তারা অভিযোগ করে যে, তার স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যর্থ অভিযানের কারণে রাশিয়ান সেনাবাহিনীকে বিশাল মূল্য দিতে হচ্ছে। এতৎসত্ত্বেও ইলেতসিন তাদের সব অভিযোগ-আপত্তি উপেক্ষা করে গ্রোজনি আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়। রাশিয়ার সেনাবাহিনী এবার গ্রোজনিতে আক্রমণ করে সমস্ত ভবন ও স্থাপনা ধ্বংস করে ফেলে। এতে শহরটি প্রজ্বলিত আগুনের শহরে পরিণত হয়। তাদের প্রতিশোধের আগুন থেকে কোনো জায়গাই বাকি ছিল না, যেখান থেকে কোনো প্রতিরোধ আসতে পারে। তারা গ্রোজনির পেট্রোলের খনিগুলোতেও আগুন লাগিয়ে দেয়। ধ্বংসাত্মক আক্রমণের পর রাশিয়ানরা শহরটি নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়। প্রচুর মানুষ মারা যায়; অথচ এতে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিল না। একদিকে তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করতে থাকে, অন্যদিকে তারা তাদের দেশের দিকে অগ্রসর হয়।

চেচনিয়া শক্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং চেচেন প্রেসিডেন্ট জওহর দুদায়েভ যুদ্ধকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে স্থানান্তর করে মরণপন অপারেশন পরিচালনা করার জন্য হুঁশিয়ারি প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'যদি চেচেন জনগণকে মৃত্যুগ্রহণ ও রুশ উপনিবেশ হিসেবে বেঁচে থাকার মধ্য হতে যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে রাশিয়ার দাসত্বের উপর তারা মৃত্যুকেই প্রাধান্য দেবে।'

রাশিয়ানরা এ হুঁশিয়ারির প্রতি কোনো কর্ণপাত করেনি। ইতিমধ্যে দুর্ধর্ষ গেরিলা কমান্ডার শামিল বাসায়েভ আবির্ভূত হলেন। রাশিয়ানরা চেচনিয়া আক্রমণকালে তিনি তাদের পুরো ইউনিট ধ্বংস করে দেন। তিনি চেচনিয়ার ওপর রাশিয়ার নৃশংস আক্রমণ থামাতে এবং রাশিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে দাগিস্তানের একটি হাসপাতাল দখল করেন। কিন্তু

রাশিয়ানরা হাসপাতালের রোগীদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল না। তারা তাতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তারা প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। চেচেন মুজাহিদরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ অব্যাহত রেখে রুশদেরকে ক্লান্ত করে দেয়। হামলার প্রচণ্ডতায় রাশিয়ার এক সামরিক কমান্ডার বলেছিল যে, আফগানিস্তানে যুদ্ধ করা চেচনিয়ার তুলনায় একটি পিকনিকের মতো।

চেচেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওপর এক আক্রমণে চেচেনের নেতা জাওহার দুদায়েভ শাহাদাতবরণ করেন। এতে চেচনিয়ার জনগণ গভীরভাবে দুঃখিত হয়। এমনকি বিশ্বের সকল প্রান্তের সমস্ত মুসলমানও এ সংবাদে শোকাহত হয়। রাশিয়ানদের ধারণা ছিল, দুদায়েভের মৃত্যুর ফলে তাদের অভিযান সফল হয়েছে এবং চেচনিয়ার জনগণ এখন পরাজয়ের সাদা পতাকা উত্তোলন করবে। কিন্তু দুদায়েভের শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে দিয়ে রাশিয়া চরম ভুল করেছিল। মুজাহিদগণ রাশিয়ার দখল থেকে চেচনিয়াকে মুক্ত করতে যখন বদ্ধপরিকর, ঠিক সে সময় তাঁর শাহাদাতের খবরে তারা আরও কঠিনভাবে রাশিয়ানদের ওপর আক্রমণ শুরু করে এবং রাশিয়ান সৈন্যদের লাশ একের পর এক রাশিয়ায় ফিরতে থাকে।

চেচনিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী আসলান মাসখাদভ মুজাহিদ আক্রমণের মাধ্যমে রুশ বাহিনীকে পরাস্ত করেন। আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকেন। এর বেশিরভাগের নেতৃত্বে ছিলেন অভিজ্ঞ কমান্ডার শামিল বাসায়েভ। এতে রাশিয়ানরা কঠিনভাবে বিপদের মধ্যে পড়ে যায়। রুশ বাহিনীর ওপর চেচেন প্রতিরোধ আক্রমণ অব্যাহত থাকে। ১৪১৬ হিজরিতে (১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) তারা গ্রোজনি দখল করে এবং এর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। মুজাহিদদের আক্রমণে সহস্রাধিক রাশিয়ান সৈন্য নিহত হয়। তখন রাশিয়ানরা পুরাপুরি উপলব্ধি করতে পারে যে, চেচনিয়ায় তাদের অবস্থান বিশ্ববাসী ও নিজেদের দেশবাসীর কাছে লাঞ্ছনাকর ও কলঙ্কজনক এক অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

৯৩—দ্রষ্টব্য—৫৩

১৪২২ হিজরিতে (২০০২ খ্রিষ্টাব্দে) তারা চেচনিয়া ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে মুজাহিদদের সাথে একমত হয় এবং চেচনিয়ার স্বাধীনতার ব্যাপারে একটি গণভোটের আয়োজন করা হয়। চেচেন সন্তানদের দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়। এতে আসলান মুসখাদাভ বিজয়ী হন। চেচনিয়ার স্বাধীনতার চিন্তা রদ করতে রাশিয়া নতুন পন্থা অবলম্বন করে। পুনরায় তারা চেচনিয়ায় আসে এবং চেচনিয়া দখল করে নেয়। কিন্তু চেচেন জাতি রাশিয়া থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য দাঁড়াতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ থাকে এবং দৃঢ়তার সাথে আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করে। ২০০৫ সালের ৮ মার্চ রাশিয়ানরা আসলান মুখাদেভকে হত্যা করে। মুজাহিদগণ তার স্থলে সাইদ লায়িভকে নির্বাচিত করেন, যিনি লাগাতার জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার শপথ করেছিলেন।

৯৩—০—৫৩

ট্রান্সককেশাস

ট্রান্সককেশাস বলতে আজারবাইজান, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্রকে বলা হয়। এ সংযুক্ত প্রজাতন্ত্রটি ছিল সেভিয়েত ইউনিয়নের একটি অংশ, যা এমন আরও বারোটি প্রজাতন্ত্র নিয়ে গঠিত হয়েছিল। অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ায় ১৪১১ হিজরিতে (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে) এ তিনটি প্রজাতন্ত্রই স্বাধীনতা লাভ করে।

১. **জর্জিয়া** : একে কিরগিজস্তান বলা হয়। তিবিলিসি শহর হলো এর রাজধানী। এটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ। এর অধীন আবখাজিয়া স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র। এর রাজধানী সাখুমি। এর অধিকাংশ নাগরিক মুসলিম। প্রজাতন্ত্র আজারিয়ার রাজধানী হলো বাতুমি। এর অধিকাংশ জনগণই মুসলিম। দক্ষিণ ওসেটিয়ার প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসী খ্রিষ্টান। উত্তর ওসেটিয়ায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ায় রাশিয়ানরা এ শঙ্কায় ছিল যে, পুরো ওসেটিয়ায় ইসলাম

ছড়িয়ে পড়বে। তাই উত্তর ওসেটিয়া থেকে দক্ষিণ ওসেটিয়াকে আলাদা করে দেওয়া হয়।

প্রজাতন্ত্র জর্জিয়ায় জনসংখ্যার প্রায় ২০% মুসলমান। এ অঞ্চলে রাশিয়ানদের আগমনের আগে তারা আরও বেশি ছিল। এখান থেকে অনেকে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করে বিশেষ করে আবখাজ ও আজারিয়া থেকে। এ ছাড়াও অনেককে নির্মূল করা হয়েছে এবং বাকি অনেককে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সাইবেরিয়ার জঙ্গলে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে।

১৪১১ হিজরিতে (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে) জর্জিয়া স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড শেভারদনাদজের শাসনাধীন ছিল। স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে তাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিভিন্ন তৎপরতা প্রকাশ পায়, তবুও আবখাজিয়াতে তার নজরদারি ছিল কেবল মুসলমানদেরই ওপর। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর জর্জিয়া ও আবখাজিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আবখাজিয়া থেকে একটি প্রতিনিধিদল আসে। শেভারদনাদজে জর্জিয়ার সেনাবাহিনীকে আবখাজিয়াতে পাঠায় এবং রাজধানী সাখুমি দখল করে।

সেখানে স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে দিলে আবখাজিয়ায় ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। খ্রিষ্টান অধ্যুষিত জর্জিয়া থেকে আগত খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে আবখাজ মুজাহিদরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুসলমানরা তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। ১৪১৩ হিজরিতে (১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে) তারা আবখাজিয়া থেকে বিতাড়িত হয়। রাশিয়া সব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। রাশিয়ার আশা ছিল, জর্জিয়া নত হয়ে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুক এবং এতে তাদের হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দিক। আবখাজ ও জর্জিয়ানদের মধ্যে কয়েকবার সংলাপ হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি।

২. **আজারবাইজান :** এর রাজধানী বাকু। এটি তেলসমৃদ্ধ ধনী দেশ। এর অধিকাংশ জনগণ অর্থাৎ ৭০% শিয়া এবং অবশিষ্ট ৩০% সুন্নি মুসলমান। স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র নাখচিভান, যা আর্মেনিয়া-

তুরস্কের মাঝে অবস্থিত এবং নাখচিভান ও একইসাথে নাগারনো কারাবাখ প্রজাতন্ত্র আজারবাইজানের সাথে যুক্ত। ১৪১১ হিজরিতে (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে) আজারবাইজান স্বাধীনতা অর্জন করে।

৩. **আর্মেনিয়া :** এর রাজধানী ইরিবান। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা খ্রিষ্টান এবং মাত্র ১২% নাগরিক মুসলিম। ১৪১১ হিজরিতে এটা স্বাধীনতা লাভ করে।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার দ্বন্দ্ব

আজারবাইজানের নাগারনো কারাবাখ প্রদেশের কারণে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মাঝে দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ, সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল আর্মেনিয়ান, তারা দাবি করে যে, এর অধিকাংশ ভূমি আরমেনিয়ার সাথে সংযুক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষদিকে দুই রাজ্যের মধ্যে প্রচুর সংঘর্ষ হয়। এ সুযোগে আর্মেনিয়ায় রাশিয়ানদের আগমন ঘটে। প্রজাতন্ত্রদুটি স্বাধীন হওয়ার পর তাদের মাঝে সীমানার দৈর্ঘ্য নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ লেগে যায়।

রাশিয়া আর্মেনিয়াকে সহযোগিতা করে। বিশেষ করে আর্মেনিয়ার প্রতি স্থায়ী পক্ষপাতের কারণেই আজারবাইজান রাশিয়ার কমনওয়েলথে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল। আর্মেনিয়া আজারবাইজানের বিরুদ্ধে বিশাল বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ, রাশিয়া তাদেরকে আধুনিক অস্ত্র ও অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল এবং তাদের সাথে এ নিয়ে একটি যৌথপ্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। আর্মেনিয়নরা নাখচিভান অঞ্চলটি দখল করে নেয়। তারা আজারবাইজানের ১০%-এরও বেশি এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়, যে অংশ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ চলছিল।

অতঃপর রাশিয়ানদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আজারবাইজান কমনওয়েলথে যোগ দিতে বাধ্য হয়। আর্মেনিয়ানরা রাজনীতিতে পরিচ্ছন্নভাবে নীতিমালা করতে ইচ্ছা করে এবং ওই সমস্ত ভূমি থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেয়, যা আজারবাইজান থেকে তারা দখল করেছে।

আর্মেনিয়ানরা আজারবাইজানে কী করছে, বিশ্ব সব দেখেও চুপ করে থাকে। জাতিসংঘ আর্মেনিয়াকে তাদের বাহিনী আজারবাইজান থেকে

প্রত্যাহার করার আবেদন জানায়, কিন্তু তারা তাতে কোনো কর্ণপাত করেনি। রাশিয়া আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান উভয় দেশে আরও বেশি হস্তক্ষেপের সুযোগ পাওয়া এবং আজারবাইজানের পেট্রোলের খনিতে দখলদারি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে দেয়। তবে উভয় দেশের মধ্যে পরিস্থিতি স্থির থাকা সত্ত্বেও আজারবাইজানে দখল করা অঞ্চল থেকে আর্মেনিয়ানরা সৈন্য প্রত্যাহার করেনি। এ সমস্ত লক্ষণ দুই দেশের মধ্যে আবারও যুদ্ধের শঙ্কা জাগিয়ে তোলে ।

* * *

অষ্টম অধ্যায়

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম আসে দাওয়াত ও ব্যবসার যোগসূত্র ধরে। এসব অঞ্চলে ইসলামের দিগ্বিজয়ী বীরেরা আসেননি। দাওয়াতের মাধ্যমে এর প্রত্যেকটি অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করে। স্পেন থেকে মুসলমানদের নির্মূল করার পর ইউরোপ থেকে এসব দেশে প্রথমে পর্তুগিজ ও স্প্যানিশরা, এরপর হল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও আমেরিকানরা ক্রুসেডীয় বিদ্বেষ নিয়ে আগমন করে। এসব অঞ্চলে ইসলামের প্রসারে তারা অবাক হয়ে যায়। অতঃপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা বিদ্বেষ ও ঘৃণা উদ্‌গিরণ করতে থাকে এবং জঘন্য সব অপরাধ ও মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালাতে থাকে।

যদিও হিন্দুধর্মের কিছু স্বভাব-বৈশিষ্ট্য এসব এলাকার মুসলমানদের মধ্যে তখনও অবশিষ্ট ছিল; যেমনটি ভারত ও চীনের মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়। এর কারণ হলো, এসব অঞ্চলে শাসকরা ছিল নওমুসলিম। কিন্তু যখন ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ক্রুসেডীয় বিদ্বেষ প্রকাশ পেতে শুরু করল, তখন এই এলাকার মুসলমানরা ক্ষোভে ফেটে পড়ল এবং সেই নিষ্ঠুর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল, যারা মুসলমানদের নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মাঠে নেমেছিল। মুসলমানরা ত্যাগ, কুরবানি ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অনুপম এক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করল। যা আমরা ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই জানতে পারব ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, চীন ও ফিলিপাইনের আলোচনায়।



মানচিত্র নং-২৯
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

মালয়েশিয়া

হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে প্রধানত ব্যবসার যোগসূত্রে মালয়েশিয়ায় ইসলাম পৌঁছে। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও অন্যান্য) ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজ সবচেয়ে বেশি করেছে মালাক্কা রাজ্য। এ রাজ্যের রাজা হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচারে এটি এ অঞ্চলের প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। বরং রাজ্যটি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রচার-প্রসারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়।

মালাক্কা রাজ্যটি একসময় থাইল্যান্ডের অধীনে ছিল এবং স্বায়ত্তশাসনের বিনিময়ে তাকে কর দিয়ে চলত। এর কিছুদিনের মধ্যেই ৮০৮ হিজরিতে (১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে) চেং হো নামক একজন চীনা মুসলিম আমির এ রাজ্যে আগমন করেন। এখানে এসে তিনি থাইল্যান্ডের যেকোনো হস্তক্ষেপের

বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলেন। অতঃপর রাজ্যটির গভর্নর থাইল্যান্ড থেকে এর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে ইসলামের বিস্তার ও বিজয় লাভের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করেন।

মালাক্কার শাসনব্যবস্থায় লাগাতার সাতজন শাসক আসেন। তাদের মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত ছিলেন মনসুর পাশা। তিনি তুর্কিদের সম্মানে 'পাশা' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু উসমানি সুলতানদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং তাদেরকে খিলাফতের প্রতিনিধি মনে করাতে তিনি 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেননি। তিনি বার্মার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত মালয় উপদ্বীপ বিজয় করতে সক্ষম হন। তার রাজ্য সুমাত্রা থেকে ব্রুনাই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার শাসনামলে মালয়ের বেশিরভাগ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।

ঔপনিবেশিকতা

পর্তুগাল

৯১৫ হিজরিতে (১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দে) পর্তুগিজরা মালাক্কা দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। এরপর তারা আবারও তা দখলের চেষ্টা করে। আক্রমণের আগে তাদের কমান্ডার অলবুকাক তাদেরকে বলেছিল, 'প্রথম কথা হলো, এটা একটি মহান সেবা, যা আমরা পালনকর্তার কাছে পেশ করতে পারব, যখন এই দেশ থেকে আমরা মুসলমানদের বিতাড়িত করব এবং মুহাম্মাদি বাহিনীর এ উত্থান থামিয়ে দিতে পারব, যা আর কখনো জেগে উঠতে পারবে না। এমন একটি ফলাফলের জন্য আমি খুবই উৎসাহী। যখন আমরা বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হব, তখন তারা সম্পূর্ণ ভারত আমাদের জন্য ছেড়ে যাবে। মুসলমানদের অধিকাংশ বা বলা যায় সবাই-ই এ দেশে ব্যবসার মাধ্যমে জীবনযাপন করে। এতে তারা ধনী হয়ে গেছে এবং প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েছে। মালাক্কা তাদের ইসলামের মূলকেন্দ্র। প্রতি বছর তারা তাদের দেশে মশলা ও ওষুধ আমদানি করে থাকে; অথচ আমরা তাদেরকে বাধা দিতে পারিনি। যদি আমরা এই প্রাচীন বাজার-ঘাট থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করতে পারি, তাহলে ব্যবসা পরিচালনা করার মতো এ অঞ্চলে তাদের আর কোনো বন্দর বা উপযুক্ত স্টেশন অবশিষ্ট থাকবে না। আমি তোমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, যদি মালাক্কাকে মুক্ত করতে সক্ষম হই তাহলে আমাদের হাতে কায়রো ভেঙে চুরমার হবে। সর্বশেষ মক্কাও ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

এরপর ভেনিসকে তাদের ব্যবসায়ীদের পর্তুগালে পাঠাতে হবে, যদি তারা মশলা কিনতে চায়।'

৯১৭ হিজরিতে (১৫১১ খ্রিষ্টাব্দে) পর্তুগাল মালাক্কা দখল করতে সক্ষম হয়। এতে ইউরোপের সর্বত্র আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পোপকে পবিত্র ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইউরোপে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পর্তুগিজরা মুসলমানদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করে। এ সময় মালয়ের সর্বত্র পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। বরং জনসাধারণের সাথে খারাপ ও অমানবিক আচরণের প্রতিক্রিয়ায় ইসলাম আরও প্রসার লাভ করে। সাধারণ জনতা দখলদার নৃশংস খ্রিষ্টান বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। পরে তাদের মিশন মালাক্কা থেকে সুমাত্রা দ্বীপের আশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়।

হল্যান্ড

স্প্যানিশরা ৯৮৯ হিজরিতে (১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে) পর্তুগাল দখল করে। তখন হল্যান্ড পর্তুগালের অনেক উপনিবেশ দখল করে নেয়। এর মধ্যে ছিল মালয়, জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি। তারা ১০৫২ হিজরিতে (১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে) মালাক্কা থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। তারা সেখানে ভারতের ব্রিটিশ নীতি অনুসরণ করে ১০১১ হিজরিতে (১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে) ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে। তবে মুসলিম নিধনে তারা পর্তুগিজ পদ্ধতি অনুসরণ করে।

ইংল্যান্ড

নেদারল্যান্ডস সাম্রাজ্যের দুর্বলতা শুরু হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধের কারণে। তাই ইংল্যান্ড এটাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে ১০২৩ হিজরিতে (১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে) পূর্বভারতে আসে এবং ১২০৭ হিজরিতে (১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) মালাক্কা তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। পরে ১২৩৩ হিজরিতে (১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে) তা নেদারল্যান্ডকে ফিরিয়ে দেয়। অতঃপর ১২৩৯ হিজরিতে (১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে) হল্যান্ডের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এতে হল্যান্ড মালাক্কা ও মালয় উপদ্বীপে ইংল্যান্ডের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। তারা ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় হস্তক্ষেপ ছাড়া রাজ্য চালানোর

ব্যাপারে আরও প্রভাব বিস্তার করেছে মালয়, সাবাহ, ব্রুনাই, সারওয়াক ও অন্যান্য রাজ্যের সুলতানদের ওপর।

—দ্রষ্টব্য—

এ অঞ্চলগুলো ব্রিটিশ বলয়ে পরিণত হয় এবং ইংরেজরা জনসংখ্যা কাঠামো পরিবর্তনের পদ্ধতি গ্রহণ করে। মালয়ে ও অন্যান্য প্রদেশে হিন্দু ও চাইনিজদেরকে অভিবাসনের জন্য ডাকে। শর্ত থাকে অমুসলিম হতে হবে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও চাইনিজ অভিভাসন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়। এতে মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাসে একটি বড় ধরনের প্রভাব পড়ে, একপর্যায়ে মুসলমানদের সংখ্যা ৫২%-এ নেমে আসে। রাজ্যে খ্রিষ্ট ধর্মপ্রচার, অমুসলিমদের দেশে আনয়ন ও রাষ্ট্রের উচ্চপদে স্থান দেওয়াসহ বিভিন্ন কর্মতৎপরতা আরও বাড়তে থাকে।

—০—

জাপান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত মালয়েশিয়ার আংশিক দখল করে নেয়। অতঃপর জাপানের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ দখলদাররা আবার ফিরে আসে। ১৩৭৭ হিজরিতে (১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশরা মালয়ে ইউনিয়ন গঠন করার কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করে। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনে রাজা এনুডি বার্তুয়ানের নেতৃত্বে একটি রাজ্য গঠন করে। ব্রুনাই দ্বীপের কিছু অংশ ইংল্যান্ডের অধীনে থাকে। অথচ সারওয়াক, সিঙ্গাপুর, উত্তর ব্রুনাই ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীন হয়ে ১৩৮২-১৩৮৩ হিজরি (১৯৫৪-১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মালয়েশিয়া ইউনিয়নের সাথে যুক্ত থাকে। অতঃপর ১৩৮৫ হিজরিতে (১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে) সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ান ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যায় এবং সে বছরই স্বাধীনতা লাভ করে এবং ব্রিটিশ রুলস অনুসারে মুসলমানদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে ১৬%-এ নিয়ে আসে। ব্রিটিশরা ব্রুনাইকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরে ১৪০৪ হিজরিতে (১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে) স্বাধীনতা লাভ করে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হয়। এর রাজা একজন মুসলমান এবং বিশ্বের ধনী ব্যক্তি ছিলেন।

সুকার্নো ছিল ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট। ব্রুনাইয়ের উত্তরাঞ্চলীয় দ্বীপকে বিচ্ছিন্ন করে মালয়েশিয়ার সাথে একীভূত করার ব্যাপারে সে বিরোধিতা করে, কারণ সে ব্রুনাইকে ইন্দোনেশিয়ার অংশ মনে করত। উত্তর ব্রুনাইয়ের প্রতি ফিলিপাইনেরও আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া উভয় রাজ্যের প্রধানদের মতামত অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়। তারা মালয়েশীয় ইউনিয়নের স্বীকৃতি দেয়। তারপর ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড মিলে ১৩৮৭ হিজরিতে (১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসংস্থা (আসিয়ান) গঠিত হয়।

মালয়েশিয়া ইউনিয়নের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলো টেংকু আবদুর রহমান। দেশের মধ্যে দাঙ্গা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৩৮৯ হিজরিতে (১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) সে পদত্যাগ করে। উক্ত পদে আসে টান আবদুর রাজ্জাক। তারপর তার জায়গায় আসে হুসাইন বিন আওন জাফর। অতঃপর ১৪০১ হিজরিতে (১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে) তার জায়গায় আসে সুরি মাহাথির মুহাম্মাদ।

পাত্তানি সমস্যা মোকাবিলায় মালয়েশিয়ার নীতি

পাত্তানি মুজাহিদরা ১৩৮৯ হিজরিতে (১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) সামরিক শক্তি অর্জন করতে শুরু করে। আর মালয়েশিয়ায় অবস্থিত তাদের ভাইয়েরা তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে। পাত্তানিরা কখনো কখনো মালয়েশিয়ার কেলান্টন রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ, সেখানকার বেশিরভাগ লোক ইসলামি পার্টিকে সমর্থন করে। আর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমান পাত্তানিদেরকে সাহায্য করা বাতিল করে দেয়। কেননা, তার মা ছিল থাইল্যান্ডের অধিবাসী।

এরপর এলো টান আবদুর রাজ্জাক। সে থাইল্যান্ডে মুজাহিদদের আন্দোলন দমন করার ঘোষণা দিয়ে মুসলমানদেরকে বিস্মিত করে। থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার যৌথ সহযোগিতায় শাসনব্যবস্থা শুরু হয়। যেহেতু কম্যুনিস্টদের বিরোধিতার কারণে মালয়েশিয়ায় সমস্যা সৃষ্টি হয়; আর পাত্তানি মুজাহিদদের কারণে থাইল্যান্ডের কষ্ট হয়। এমতাবস্থায় থাইল্যান্ড কম্যুনিস্টদের সহযোগিতা করা বন্ধ করে দেয় এবং মালয়েশিয়া মুজাহিদদের সহযোগিতা করা বন্ধ করে দেয়। অতএব, বিরোধী দল ও মুজাহিদদের প্রভাব সমানভাবে কমতে থাকে।

মুজাহিদদের প্রতি সমর্থন থাকায় ১৩৯৭ হিজরিতে মালয়েশিয়ান ন্যাশনাল ফ্রন্ট থেকে ইসলামি দলকে বহিষ্কার করা হয়। থাইরা তখন থাই মুজাহিদদের দমনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

দ্রষ্টব্য

মালয়েশিয়ায় মোট জনসংখ্যার ৫৬% মালয়, ৩২% চীনা বংশোদ্ভূত ও ১০% হিন্দুদের মাঝে পরস্পর ঝগড়া লেগেই থাকে।

o

ইন্দোনেশিয়া

মুসলিম ব্যবসায়ী ও তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম বিস্তৃত হয়। সমস্ত এলাকায়ই ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে এবং অনেক ইসলামি প্রদেশ গঠিত হয়। ইন্দোনেশিয়া শব্দের অর্থ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। ঔপনিবেশিকরা ইন্দোনেশিয়া ও আশপাশের দ্বীপগুলোকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বলত।

ক্রুসেডীয় উপনিবেশবাদ

৯১৭ হিজরিতে (১৫১১ খ্রিষ্টাব্দে) পর্তুগিজরা ইন্দোনেশিয়ার মালাক্কা দখল করে তাকে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ দখলের ঘাঁটি বানায়। এদিকে স্প্যানিশরা প্রভাব বিস্তার করে ব্রুনাই দ্বীপ ও মালুকু দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

সাধারণ প্রতিক্রিয়ায়, ক্রুসেডিয়ানদের দ্বারা দখলীকৃত অংশগুলোতে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে যায়।

হল্যান্ড ঔপনিবেশিকতা

পর্তুগিজ ও স্প্যানিশদের কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়লে ইংরেজ ও ডাচদের উত্থান ঘটে। এ সময় স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ দখলীকৃত বিরাট এলাকা ডাচদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এমনকি স্প্যানিশরা হল্যান্ডের অধিকৃত হয়ে যায়। স্পেনের রেখে যাওয়া এলাকাগুলো হল্যান্ড গ্রহণ করতে শুরু করে এবং পূর্বভারতের দ্বীপগুলোর মধ্য থেকে ছেড়ে যাওয়া এলাকাগুলোর মধ্যে যা তারা পছন্দ করে তাও। ডাচরা মুসলিমদেরকে এ ভ্রান্তিতে ফেলে দেয়

যে, অত্যাচারী পর্তুগিজদের তাড়াতেই তাদের আগমন। হল্যান্ড পূর্বভারতের দ্বীপগুলোতে অবস্থানরত পর্তুগিজদের উচ্ছেদ করে দেয়। হল্যান্ড দ্বারা প্রতারিত মিত্ররা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এ কারণে হল্যান্ড অন্য নীতিমালা অনুসরণ করতে থাকে। তারা দ্বীপে বাণিজ্যিক কোম্পানি গঠনের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করার নিমিত্তে ১০১১ হিজরিতে (১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে) ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে। অতঃপর তারা দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম রাজ্যের সাথে সরাসরি যুদ্ধ শুরু করে। তারা এখানে পরের রাজ্যের রাজত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। তারা মুসলিমদের অনৈক্য-বিচ্ছিন্নতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে ফরাসিদের সাথে যুদ্ধ করার কারণে হল্যান্ডের কর্তৃত্ব দুর্বল হতে শুরু করে। ১২১০ হিজরিতে (১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) ফরাসিরা তাদের দেশ দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। অতঃপর ইংল্যান্ড ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে হল্যান্ড কোম্পানির ভান্ডার দখল করে নেয়। আর পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ ফিরিয়ে দেবে যখন ফরাসিদের দুর্বলতা শুরু হলে হল্যান্ড তাদের থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়। তাদের এবং ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। অতঃপর এ কথার ওপর সমঝোতা হয় যে, ব্রিটিশরা শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ, আমেরিকা মহাদেশের ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে হল্যান্ডের প্রধান প্রধানরা পূর্বভারতের দ্বীপগুলোতে চলে যাবে।

ডাচ কোম্পানির পরিবর্তে হল্যান্ড কর্তৃত্ব শুরু করে। ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম রাজ্যসমূহের সাথে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করে। তারা মুসলিম সুলতানদেরকে প্রতারিত করার জন্য কেন্দ্রে তাদেরকে বহাল রেখে দেশের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হল্যান্ড দেশের ওপর তার শক্তিকে দৃঢ় করে এবং মুসলমানদের ওপর চাপ বাড়িয়ে দেয়। হল্যান্ড উপনিবেশের বিরুদ্ধে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন কমিটি সংঘ এবং ইসলামি আন্দোলনের দল গঠন করে।

ইসলামি আন্দোলন হল্যান্ড ঔপনিবেশিকতার জন্য বড় হুমকি হয়ে ওঠে। এতে হল্যান্ড কর্তৃপক্ষ মুসলিম জাগরণের বিরুদ্ধে নতুন নীতিমালা গ্রহণ করে। তারা মুসলিমদের আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। যেমন : নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিস্ট প্রবণতাকে উৎসাহিত করা, যাতে তাদের ও

মুসলমানদের দ্বন্দ্বকে ইসলাম ও কম্যুনিজমের মাঝে স্থানান্তর করতে পারে। এভাবে তারা ফিতনা সৃষ্টির জন্য উৎসাহিত করে এবং এমন কিছু করে যা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে দায়মুক্ত রাখে। যাতে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার বিপরীতে মুসলমানদেরকে অন্য দিকে ব্যস্ত রাখতে পারে। ভ্রান্ত মতবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা দানে তারা ইংরেজদের অনুসরণ করে। তাই তারা কাদিয়ানিদেরকে সহযোগিতা করে যারা ঔপনিবেশিকদের কল্যাণে কাজ করে।

জাপানি দখলদারি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৩৬১ হিজরিতে (১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে) জাপান ইন্দোনেশিয়া দখল করে। মুসলমানদের প্রতিরোধের কারণে মিত্ররা জাপানকে পরাজিত করে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে। চুক্তির আলোকে মিত্রদের আশা বাস্তবায়ন হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘটে। এতে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা পাওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা মুসলমানদের স্বাধীনতাকে আটকে রাখে। তদুপরি ১৩৬৪ হিজরিতে (১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্দোনেশিয়ায় আহমাদ সুকার্নো তার নেতৃত্বে একটি জোটবদ্ধ সরকার গঠন করার ঘোষণা দেয়। তবে মিত্ররা নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের নেতৃত্ব জাপানি সৈনিকদের হাতে তুলে দেয় এবং মিত্র সৈনিকরা তাদের জায়গা দখল করে।

হল্যান্ড থেকে স্বাধীনতা

ব্রিটিশদের শক্তি ও সহযোগিতায় হল্যান্ডের সৈন্যবাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ করে। ফলে ১৩৬৪ হিজরিতে (১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় মুসলমানদের একটি সম্মেলন হয়। তারা ইসলামের ছায়াতলে খ্রিষ্টানদের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হতে একমত হয়। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা একটি মজলিশে শুরা গঠন করে, যা মাশুমি নামে পরিচিত। তারা হল্যান্ড ও তার সহযোগী বাহিনীকে প্রতিহত করতে থাকে। তখন হল্যান্ড প্রতিনিধিদের সাথে একটি অধিবেশন হয়। হল্যান্ড সর্বদা ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর ভিত্তি করে সরকারের কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দেয়। সময়ের ব্যবধানে তারা চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের রক্ত ঝড়ায়। ফলে ডাচদের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতিরোধ তীব্রতর হয়।

অবশেষে ১৩৬৯ হিজরিতে তারা (১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

নিউগিনি

জার্মানরা ইরিয়ান দ্বীপের পূর্ব অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে, যা পাপুয়া নামে পরিচিত। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা পরাজিত হলো তখন এটা অস্ট্রেলিয়ার সাথে যুক্ত হয়। তারপর স্বাধীন হয়ে নিউগিনি রাজ্য হয়। ইরিয়ান দ্বীপের পশ্চিম অংশ হল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করত, তাই এ অংশটি পশ্চিম ইরিয়ান নামে পরিচিত ছিল। আর ১৩৬৯ হিজরিতে (১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে) যখন হল্যান্ড থেকে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হলো তখন এ অংশটি নিয়ে কোনো সমঝোতায় পৌঁছতে পারেনি।

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত হল্যান্ডই এর নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করছিল। অতঃপর ১৩৮২ হিজরিতে (১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে) এটা ইন্দোনেশিয়ার সাথে সংযুক্ত হয়। ১৩৯৭ হিজরিতে (১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্দোনেশিয়া থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য এবং পূর্ব অংশ তাদের সাথে যুক্ত করার জন্য তারা বিদ্রোহ করে। কিন্তু তাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। আর এতে ইন্দোনেশিয়া ও নিউগিনির মধ্যে সীমান্ত নির্ধারিত হয়।

পূর্ব তিমুর

ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব দ্বীপের তিমুর এবং তিমুরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উকসি ও আবিনো অঞ্চল পর্তুগাল নিয়ন্ত্রণ করছিল। ১৩৯৫ হিজরিতে (১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) এই অংশ স্বাধীন হয় এবং ইন্দোনেশিয়ার সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু পূর্ব তিমুরের রামিয়া দ্বীপ স্বাধীন করার জন্য পর্তুগাল বিরোধী দলকে সমর্থন দেয়। বিশেষত যেহেতু এর অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ক্যাথলিক খ্রিষ্টান। ১৩৯৭ হিজরি (১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত ইন্দোনেশীয়রা দখলদারদের বিরোধিতা করে। কিন্তু জাতিসংঘসহ বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র পূর্ব তিমুরকে ইন্দোনেশিয়ার সাথে যুক্ত করার বিরোধিতা করে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং বিশেষ করে জাতিসংঘের সমর্থনে শেষ পর্যন্ত পূর্ব তিমুর স্বাধীনতা লাভ করে।

অভ্যন্তরীণ অবস্থা

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আহমদ সুকার্নো দেশের রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব গ্রহণ করে ইসলামি আন্দোলনকে তছনছ করে দেয়। সে কম্যুনিস্টদের

প্রতি আসক্ত ছিল। তার সময়ে ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্টদের দুটি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পূর্বে ১৩৬৭ হিজরিতে (১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে) গা শিউরে ওঠা ত্রাসের মাধ্যমে জনগণকে আত্মসমর্পণ করার জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রত্যাশা বিফল করেছেন। মুসলমানরা তাদেরকে দমন করে। কম্যুনিস্ট নেতাদের নাস্তিকতা ও কুফরির কারণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। যাতে উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য এটাও উপদেশ হয়। ১৩৮৫ হিজরিতে (১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে) কম্যুনিস্টদের দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটে। এতে রাষ্ট্রপতির নিজের সমর্থন ছিল। কিন্তু প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনার মাধ্যমে বিপ্লব রোধ করা ও তাদের বিপ্লব থেকে দেশকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হয়।

সুকার্নো পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অতঃপর সুহার্তো ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, সে খ্রিষ্টান মিশনের জন্য দরজা খুলে দেয় এবং তাদেরকে ক্ষমতাও দেয়; অথচ ইসলাম প্রচারকদের সে এ সুযোগ দিত না। খ্রিষ্টান মিশনারি, চার্চ ও পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থন পাওয়ার জন্য তাদেরকে সম্পদ দিত। এ ক্ষেত্রে ইসলাম প্রচারকদের জন্য সম্পদ বরাদ্দ একেবারেই নগণ্য ছিল। ইসলামের ক্ষেত্রে সুকার্নো ও সুহার্তোর অবস্থান একই। তারা উভয়ই পথভ্রষ্ট অবাঙ্গান জোট থেকে এসেছে। তারা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মকে মিশ্রণ করার চেষ্টা করে। মূর্তিপূজারিদের আবাসিক এলাকায় খ্রিষ্টান মিশনারি বেশ সফলতা অর্জন করেছে।

ফিলিপাইন

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে মুসলিম ব্যবসায়ী ও দ্বীনের দাঈরা ফিলিপাইনে পৌঁছে। আল্লাহ তাআলা এ উপদ্বীপের জনগণের অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন। লোকজন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে থাকে, ফলে উত্তর দ্বীপের চেয়ে দ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক পরিসরে ইসলামের প্রসার ঘটে। ফিলিপাইনের বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক শরিফ কাবু বখসওয়ান ফিলিপাইনের মিন্দানাও ও সুলু দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম বিস্তার করেছিলেন। এমনইভাবে আরবের কারিম মাখদুম, যিনি মালাক্কাতে ইসলাম প্রচার ও প্রসার করে দক্ষিণ ফিলিপাইনের সুলু দ্বীপপুঞ্জে চলে যান এবং সেখানে ইসলাম প্রচার করেন। এর পরে আসেন আবু বকর, তিনিও আরবের। সুলু দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রচার করার জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন। তিনি

সুলুর রাজকন্যাকে বিয়ে করে পরবর্তী সময়ে তার সিংহাসনে আসন গ্রহণ করেন এবং বাকি জীবন সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সময়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেই সময়ে মুসলমানগণ সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছেছিল। কিছু রাজ্যে মূর্তিপূজারীদের অধিক্য থাকলেও অধিকাংশ রাজ্যের নেতৃত্ব দিত মুসলিমরা। তারা মুসলমানদেরকে সম্মান ও নেতৃত্বের আসন দিত। কেননা, তারা ব্যক্তিত্ব, ভদ্রতা, নৈতিকতা, শিক্ষা ও কর্মদক্ষতার দ্বারা মুসলমানদের পরিমাপ করত। সুলু, ম্যানিলা ইত্যাদি ফিলিপাইনের বিখ্যাত রাজ্য ছিল। উল্লেখ্য যে, ফিলিপাইনের বর্তমান রাজধানী ম্যানিলাকে আমানুল্লাহ বা আল্লাহর নিরাপত্তা বলা হয়। যার প্রমাণ বহন করে ফিলিপাইনে আরব ইসলামি নিদর্শন।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে স্প্যানিশ আক্রমণ

৯২৭ হিজরিতে (১৫২১ খ্রিষ্টাব্দে) স্প্যানিশরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আসে। ম্যাগেলানের নেতৃত্বে দখলদার বেশে তারা এ দেশে আসে এবং তারা ঘোষণা করে এ দেশের জনগণের জন্য খ্রিষ্টধর্ম বাধ্যতামূলক। এটি ছিল উত্তর দ্বীপে, দক্ষিণ দ্বীপে তারা তা করতে সক্ষম হয়নি। ম্যাগেলান সিবু দ্বীপের রাজার সাথে সমঝোতা করে যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা স্পেনের পক্ষ সমর্থন করবে। এরপর শাসন করে তা একত্র করতে মনস্থ করে। কিন্তু মুসলমানরা একের পর এক তাদেরকে প্রতিহত করে এবং স্প্যানিশরা অস্ত্রসমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দ্বীপপুঞ্জ থেকে তাড়িয়ে দেয়। ম্যাগেলান এ দ্বীপকে নিয়ন্ত্রণে আনতে অন্য পথ অনুসরণ করে। সে মুসলিম শাসক লাবু লাবুর কাছে গিয়ে বলে, আমি ইসা মাসিহের নামে শপথ করে বলছি আপনি আত্মসমর্পণ করুন। আমরা শ্বেতাঙ্গ ও সভ্যতার ধারকবাহক। তাই আমরা আপনাদের চেয়ে এ দেশের শাসন পরিচালনার অধিক উপযুক্ত। লাবু লাবু তার কথা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, নিশ্চয়ই ধর্ম কেবল আল্লাহর জন্য। আর আমি যে উপাস্যের ইবাদত করি, তিনি হলেন জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমস্ত মানুষের উপাস্য। অতঃপর ম্যাগেলানকে তিনি নিজ হাতে হত্যা করেন। তার দলবলকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। তার মরদেহ স্পেনে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর স্পেন ফিলিপাইন থেকে স্প্যানিশদেরকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যায়। এ পর্যন্ত স্পেনকে অনেরক লোকবল ও নৌপরিবহণ খোয়াতে হয়েছে। অতঃপর

স্প্যানিশ ক্রুসেডাররা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আবার আক্রমণ শুরু করে। স্পেন সেখানে চারটা অভিযান চালায়, যার একটার নেতৃত্বে ছিল রুই লোপেজ। যাকে দ্বিতীয় ফিলিপ বলা হয়। যেহেতু এ চারটি অভিযান মুসলিম অধ্যুষিত মিন্দানাও দ্বীপে পরিচালিত হয়েছে, যেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, স্প্যানিশ ক্রুসেডাররা মুসলমানদের ওপর ক্রুসেডীয় বিদ্বেষ ছড়াচ্ছিল।

এরপর ৯৭৩ হিজরিতে (১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দে) ফিলিপাইনের ওপর স্পেনের আক্রমণ আরও গুরুতর হয়। তারা দেশের জনগণকে খ্রিষ্টান বানানোর জন্য নীতি ঘোষণা করে। ফিলিপাইনের উত্তর দ্বীপপুঞ্জ তাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু মিন্দানাও দ্বীপ ও সোলো দ্বীপপুঞ্জের মতো দক্ষিণ দ্বীপগুলো দখল করতে ব্যর্থ হয়, যা মুসলমানরা শাসন করছিল। স্প্যানিশরা মুসলিমদের আন্দালুস শাসনকালের সময় থেকে তাদেরকে মুরু বলে, আরব ও বার্বারদের প্রথম পরিচয় মুসলিম।

স্প্যানিশরা তাদের দখল করা এলাকা আয়ত্তে রাখার জন্য জনগণকে খ্রিষ্টানধর্মে রূপান্তরিত করতে এবং মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে খুব জোর দিয়েছিল। একই সময়ে তারা জনগণের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে থাকে এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করে। তাদের প্রতি জনগণের ঘৃণার কারণে দেশে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব ছিল ১২৯০ হিজরি (১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) ও ১৩১৪ হিজরির (১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের) বিপ্লব। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে স্পেনের কাছ থেকে ফিলিপাইন কিনে নেয়। কেননা, আমেরিকানরা স্প্যানিশদের ঔপনিবেশিকতা থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার সহায়তার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তারা স্প্যানিশদের তাড়িয়ে দেয় এবং প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী ফিলিপাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ বলে স্পেন স্বীকার করে নেয়।

ফিলিপাইন এ চুক্তি ভঙ্গ করে এবং ১৩১৯ হিজরিতে (১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে) একটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যা যুক্তরাষ্ট্র দমন করে ফেলে। ফিলিপাইনে এটি দমন করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের নীতি অব্যাহত রাখে। তাদের এলাকাসমূহ ব্যাপকভাবে অবহেলা করতে থাকে, ফলে তথায় দারিদ্র্য, মূর্খতা ও দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

১৩৫৩ হিজরিতে (১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে) ফিলিপাইন স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৩৫৮ হিজরির (১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান আবার তা দখল করে নেয়। ফিলিপিনোদের সাথে মুসলমানরা ঔপনিবেশিক জাপানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এতে ফিলিপিনোরা জাপানিদের হটাতে সক্ষম হয়। ১৩৬৫ হিজরিতে (১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে) ফিলিপিনোরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু সামরিক ঘাঁটি সেখানে চালু রাখে, যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক নীতিকে সহায়তা করে, যাতে দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিদ্যমান থাকে।

ঔপনিবেশিকদের সময়কার অজ্ঞতায় নিমজ্জিত অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে ফিলিপাইনের মুসলমানরা নিজেরাই উদ্বুদ্ধ হয়। সন্তানদের ইসলামি শিক্ষা দিতে এবং ইসলামি চেতনা বিস্তার করতে মাদরাসা ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে।

রাষ্ট্রপতি মার্কোস তার সময়ে মুসলমানদের নির্মূল ও নিঃশেষ করে ফিলিপাইনকে ইহুদি ও খ্রিষ্টরাজ্যে পরিণত করার কাজ করে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সে এটা করতে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির জন্য, তাদের সম্পত্তি লুট করার জন্য এবং দেশ থেকে তাদেরকে বের করার জন্য। সে এর জন্য কয়েকটি বাহিনী গঠন করে। সবচেয়ে ভয়াবহ বাহিনী ছিল অক্টোপাস বাহিনী ও ইঁদুর বাহিনী; যাদের কাজ হলো মুসলমানদের জমি দখল করা। মুসলমানদের মধ্যে নিষ্ঠুর অপরাধ, হত্যা, ভাঙচুর, অপহরণ ও ঘর থেকে বের করে দেওয়া, যাতে মুসলমানরা জমি ছেড়ে চলে যায়।

তারপর ফিলিপাইনের ভূমিতে বসবাসের জন্য তাদের দ্বিতীয় ধাপটি আসে এবং তাদের জমিতে দেশের খ্রিষ্টানদের আবাসন গড়া ও খ্রিষ্টানদের নামে রেজিস্ট্রি করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৩৯০ হিজরিতে (১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে) এই কার্যক্রম শুরু হয়। ফিলিপাইন সরকার এদেরকে সাহায্য করেছিল। মুসলমানরা ফিলিপাইন সরকারের কাছে অভিযোগ দায়ের করলে তাতে সে কোনো কর্ণপাত করেনি। এতে তারা জিহাদ ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পায়নি।

এ পরিস্থিতিতে ১৩৯২ হিজরিতে (১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে) তারা মরো লিবারেশন ফ্রন্ট গঠন করেন। যাতে ফিলিপিনো খ্রিষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত গণহত্যা

ও যুদ্ধকে মুসলমানরা নিজেরাই প্রতিরোধ করতে পারে। এতেই ১৩৯২ হিজরিতে ফিলিপিনো সেনাবাহিনী ও মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। ফিলিপিনো সৈন্য সংখ্যা ও শক্তিতে অধিক ছিল। তাদের ইহুদিরা এবং যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্রের জোগান দিত। এদিকে মুজাহিদদের শুধু হালকা অস্ত্র ও ঈমানি জোর ছিল। তারা এর দ্বারাই শত্রুদের মোকাবিলা করে এবং তাদেরকে চরমভাবে পরাজিত করে। ফলে ফিলিপাইন সরকার মুসলমানদের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়।

ত্রিপোলি সম্মেলন (১৩৯৭ হিজরি)

ফিলিপাইনে মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে ত্রিপোলি সমঝোতা চুক্তি হয় এবং এতে দক্ষিণ রাজ্যের মুসলমানরা স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। সম্মত হয়।

চুক্তি সম্পাদনের পর এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মার্কোস এ আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে মুসলমানদের ওপর একটি নতুন হামলার প্রস্তুতির জন্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। ফিলিপাইন সরকার ঘোষণা করে যে, আমরা মুসলমানদের সাথে যে চুক্তি করেছি তা প্রত্যাহার করে নিয়েছি। ফলে আগ্রাসী সরকারি বাহিনী ও মোরো লিবারেশন ফ্রন্টের মধ্যে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়। এতে মার্কস সৈন্যরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যাসহ মারাত্মক অপরাধ ঘটিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা বীরত্বের সাথে ইসলামের শত্রুদের সাথে মোকাবিলা করে টিকে থাকে। এতে সেনাবাহিনীর সরঞ্জাম বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দেশে মার্কোসের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। মার্কোসের স্বৈরশাসনের বিরোধিতা শুরু হয় এবং এ সময় বিরোধী নেতা বেনিগনো অ্যাকুইনো নিহত হয়। এতে মার্কোসকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং সে ক্ষমতা ও দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। ফলে বিরোধী দলের প্রয়াত নেতার স্ত্রী কোরাজন অ্যাকুইনোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। সে ঘোষণা করে যে, মুসলমানদের অধিকার প্রদান করবে। কিন্তু সেও সেরকম কিছু করে না; বরং যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। এরপর ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ফিদেল রামোস ক্ষমতা গ্রহণ করে। ফিলিপাইন সরকার জনসংখ্যার কাঠামো পরিবর্তন করতে দক্ষিণ দ্বীপের দখলীকৃত স্থানগুলোতে উত্তর ফিলিপাইনের খ্রিষ্টানদের স্থানান্তর করতে কাজ করে। মিন্দানাও দ্বীপে খ্রিষ্টানদের আগমনের ফলে জনগণের শতকরা হারে

৫০% হয় খ্রিষ্টান। অতঃপর সে ফিলিপাইন সরকারের দখলীকৃত অংশগুলো থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করে।

ঌ—দ্রষ্টব্য—৻

মুসলমানদের বিভক্ত করার জন্য সরকার কাজ করে। মোরো লিবারেশন ফ্রন্টের সাথে ১৪১৭ হিজরিতে (১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) একটি চুক্তি হয় যে, মানুষ স্বায়ত্তশাসন চায় না, বরং ফিলিপাইন সরকারের অধীনে থাকতে চায়, এর ওপর দক্ষিণ দ্বীপে তিন বছর অন্তর একটি গণভোট দেওয়া হবে। খ্রিষ্টানদের চুক্তি ভঙ্গ করা এবং বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিজ্ঞতার কারণে মোরো লিবারেশন ফ্রন্ট চুক্তি বাতিল করে। ফলে এখন পর্যন্ত ফিলিপাইন সরকার ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বিরাজমান।

ঌ—০—৻

ইন্দোচীন

বর্তমানে মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস ইত্যাদি দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে ইন্দোচীন। এ সকল এলাকায় দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রবেশ করে। কিন্তু ব্যাপকভাবে প্রসারিত না হলেও কিছু কিছু রাজ্যে, যেমন আরাকানে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।

মায়ানমারে দাওয়াত ও বাণিজ্যিক পথে ইসলাম পৌঁছে। মায়ানমারকে তখন বার্মা বলা হতো। পশ্চিম বার্মায় একটি রাজ্য ছিল, তার নাম আরাকান। মুসলিম বাংলার প্রতিবেশি হওয়ার কারণে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বার্মার বাকি অংশেও তা বিস্তৃত হয়। কিন্তু বৌদ্ধরা ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কারণ, ইসলাম প্রসার লাভ করলে বৌদ্ধ পুরোহিতদের স্বার্থহানি ঘটবে। সম্পদশালী ও সরকারি টাকার সাহায্যে পুরোহিতরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। বৌদ্ধদের শক্তিশালী প্রতিরোধের কারণে ইসলাম স্বল্প পরিসরে প্রসারিত হয়।

চীনের পথ ধরে ৬৮৬ হিজরিতে (১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দে) তাতার মুসলিমরা বার্মায় আক্রমণ করে এবং অত্যাচারী রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সাধারণ মানুষকে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয়। তখন কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ

করে। অতঃপর আওরঙ্গজেবের ভাই সুজা ভারত থেকে পালিয়ে অনুগতদের সহ বার্মায় প্রবেশ করে জনসাধারণের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেলে ইসলাম প্রসারিত হতে থাকে। যখন বার্মাকে কম্যুনিস্টরা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল তখন তারা সেখানে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ ও নির্যাতন চালায়। বার্মিজ জনগণের মধ্যে প্রায় ৭% মুসলমান। তারা চরম নির্যাতন ও দারিদ্র্যের মাঝে বসবাস করে; চরম ইসলামবিদ্বেষী বৌদ্ধদের শাসন ও কম্যুনিস্টদের শাসন উভয়ই তাদের সাথে এক আচরণ করে।

চম্পা (Campa)

চম্পা হলো ভিয়েতনামের মধ্যবর্তী একটি রাজ্য। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে দাওয়াত ও ব্যবসার মাধ্যমে এখানে ইসলাম পৌঁছে। এরপর কিছুদিনের মধ্যেই একজন আরব ব্যবসায়ীর সাথে চম্পার রাজা তার কন্যাকে বিয়ে দেন। রাজ্যের প্রত্যেক এলাকায় তিনি ইসলাম প্রসার করেন। ৮৭৫ হিজরিতে (১৪৭১ খ্রিষ্টাব্দে) পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের বিরাট অংশ নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছেন। এরপর চম্পা উত্তর ভিয়েতনাম সাম্রাজ্যের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১২৩৮ হিজরি, ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে ভিয়েতনাম চম্পার মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালায় এবং চম্পার সমস্ত অঞ্চল দখল করে নেয়।

—দ্রষ্টব্য—

মুসলিম জনতা গণহত্যা থেকে বাঁচার জন্য আশেপাশের দেশে পালিয়ে যায়। বড় একটি অংশ কম্বোডিয়ায় এবং অন্যরা লাওস, ভারত, চীন ও মালয়ে হিজরত করে। ভিয়েতনামে থাকা মুসলমানরা গণহত্যা ও কঠিন নিপীড়নের শিকার হয়। অবশেষে ফরাসিরা ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওসে আক্রমণ করে, কিন্তু গণহত্যার শিকার মুসলমানদের ইসলামের প্রচারাভিযান থেমে যায়নি। মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালাতে বৌদ্ধরা ইসলামের শত্রুদের আহ্বান জানায়। ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার কম্যুনিস্টরা তাদের সাথে অংশগ্রহণ করে। তারা মুসলমানদের সাথে চরম অসদাচরণ করে এবং বড় বড় মসজিদ ও মাদরাসাগুলো আয়ত্তে নিয়ে নেয়। উত্তর ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ের মসজিদ এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গুনোর মসজিদ—এ দুটি

ছাড়া ভিয়েতনামে আর কোনো মসজিদ অবশিষ্ট রাখেনি। এমনকি সরকারের অনুমতি ছাড়া জুমার নামাজ আদায় করা বন্ধ হয়। জুমার নামাজে এলে তাদের নাম-ঠিকানা রেজিস্ট্রিভুক্ত করতে বাধ্য করা হয়।

—০—

—দ্রষ্টব্য—

এ ছাড়াও কম্বোডিয়ায় মুসলমানদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। গণহত্যা, গা শিহরে ওঠার মতো লোমহর্ষক ঘটনা, অপমানকর আচরণ ও কঠিন অবমাননার শিকার হয় তারা। এমতাবস্থায় যারা প্রতিবেশী রাজ্যে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, পথিমধ্যে তাদের অনেকে মৃত্যুবরণ করে। কম্যুনিস্টদের পৃষ্ঠপোষকতা ও ক্ষোভ মুসলমানদের নির্মূল ও পরাজিত করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ভিয়েতনামে মুসলমানদের সংখ্যা ৩%, লাওসে কয়েক হাজারের বেশি হবে না আর কম্বোডিয়ায় ৭.১৪%। ফলে শীর্ষস্থানীয় মুসলমানরা তাশামিবায় চলে আসতে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার নীতিতে সবাই এক থাকে। যদিও তাদের নীতির ধরন ভিন্ন। মুসলিমনিধন আক্রমণ চলতে থাকে। নিধনযজ্ঞ ও মিডিয়ার লুকোচুরি চলতে থাকে। ইন্দোচীনের কম্যুনিস্টরা হত্যা ও অপদস্থ করা অব্যাহত রাখে।

—০—

পাত্তানি

মালয়েশিয়ার মালয় উপদ্বীপের পাশে এবং দক্ষিণ থাইল্যান্ডের শেষ সীমান্তে পাত্তানি রাজ্য অবস্থিত। হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে এখানে ইসলাম পৌঁছে এবং চারশত বছর ধরে এখানে ইসলাম চলতে থাকে। এখানে মুসলমানরা প্রভাবশালী হতে থাকে এবং প্রত্যেক অঞ্চল তাদের কাছাকাছি আসতে থাকে। ফলে ৮৬৫ হিজরিতে (১৪৬১ খ্রিষ্টাব্দে) মালাক্কাও তাদের অনুসারী হয়।

থাইল্যান্ডের বৌদ্ধরা ৯১৭ হিজরিতে (১৫১১ খ্রিষ্টাব্দে) পাত্তানি দখল করে। পরে মালাক্কায় দখল করা এলাকায় পর্তুগিজদের আক্রমণের কারণে তারা দখল প্রত্যাহার করে নেয়।

পাত্তানিরা পর্তুগিজ, জাপানিজ, ইংরেজ ও ডাচদের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। পাত্তানিতে তাদের বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। অতঃপর থাইল্যান্ডের নজর পড়ে পাত্তানির ওপর এবং ১২০১ হিজরিতে (১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) বিভিন্ন যুদ্ধের পর তারা তা দখল করতে সক্ষম হয়। পাত্তানি থাই দখলদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে। আর থাইল্যান্ড অধিকাংশ পাত্তানি মুসলমানদেরকে ব্যাংককে স্থানান্তরিত করতে থাকে। তাদের বসবাসের জায়গায় থাই নাগরিকদের নাগরিকত্ব দিয়ে পাত্তানিদের বসবাসের জনসংখ্যা কাঠামোতে পরিবর্তনের চেষ্টা করে। মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করতে তারা পাত্তানিকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করে।

মুসলমানরা বারবার দেশটিকে থাইল্যান্ড থেকে স্বাধীন করার জন্য আন্দোলন করে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। আর থাইল্যান্ড পাত্তানিদের তাদের সাথে সংযুক্ত করার জন্য আন্দোলন চালায়। তারা পাত্তানিদের ওপর থাইল্যান্ডের সভ্যতা, তাদের ভাষা ও নাম আবশ্যক করে দেয়। মুসলমানদের তাদের ধর্মের দাওয়াত দিতে নিষেধ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানিরা পাত্তানি ও মালয়ের ওপর আক্রমণ করে। আর ইংরেজরা জাপানিদের প্রতিহত করতে পাত্তানি নেতা মাহমুদ মহিউদ্দিনের সাথে আঁতাঁত করে নেয়। জাপানিরা সেখান থেকে চলে গেলে তাদেরকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। যদিও যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জাপানিরা সে দেশ থেকে চলে গেলে ইংরেজরা তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়নি; বরং পাত্তানিদের মালয়েশিয়ার সাথে মিলিত হতেও বাধা দেয়–যে মালয়েশিয়াকে পাত্তানিরা একসময় পদানত করেছিল–এমনকি তাদের একজন ঘোষণা দেয় যে, তাদের অবস্থান পাত্তানি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।

꧁—দ্রষ্টব্য—꧂

পাত্তানিরা থাইল্যান্ডবাসীদের তাদের অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করার জন্য সশস্ত্র অবস্থান নেয়। এর জন্য পাত্তানিরা স্বাধীনতা সৈনিক গঠন করে। তাদের উত্থান হয় ১৩৮৯ হিজরিতে (১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে)। তখন থাইল্যান্ডে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১৪%। যাদের অধিকাংশরাই ছিল পাত্তানি। তারা পাত্তানি অঞ্চল ও রাজধানী ব্যাংককের আশেপাশে অবস্থান নিয়েছিল।

꧁—০—꧂

নবম অধ্যায়

আফ্রিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রুসেডার ঔপনিবেশকদের আগমনের পূর্বে ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের অন্যায় দখলদারি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আফ্রিকায় স্বাধীন রাষ্ট্র

আফ্রিকা

পৃথিবীর একমাত্র মহাদেশ, যেখানে অধিকাংশ মুসলমান বাস করে। এ কারণে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের একটি বড় অংশ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা এ মহাদেশকে পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র ও শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া মহাদেশে পরিণত করেছে।

আফ্রিকা

অন্যান্য মহাদেশ থেকে আফ্রিকা মহাদেশকে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ যে দিক থেকে আলাদা করা যায়, তা হলো এটিই একমাত্র মহাদেশ, যেখানে বাস করা মানুষের অধিকাংশ মুসলমান।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদসমূহে আমরা মহাদেশটির উত্তর অংশ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছি, যেখানে খোলাফায়ে রাশিদিন ও উমাইয়া যুগের আগেই ইসলাম পৌঁছেছে, যা ভূমধ্যসাগরের তীরে এবং আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী মারাকেশের তীরাঞ্চলে অবস্থিত। এ কারণে আমরা এই পরিচ্ছেদে সেই দেশগুলো সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করব না। তবে এই পরিচ্ছেদে আফ্রিকার অবশিষ্ট অঞ্চলের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হবে, যেখানে ইসলাম প্রবেশ করেছে বিভিন্নভাবে। যেমন : দেশবিজয়, দাওয়াত, ব্যবসাবাণিজ্য ও হিজরত।

এই মহাদেশের মানুষেরা ইসলামকে সাদরে গ্রহণ করেছে। কারণ, ইসলাম হলো স্বভাবজাত ধর্ম এবং এটি মানুষকে প্রশংসিত গুণাবলির অধিকারী করে। যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আমানতদারি, সত্যবাদিতা, প্রফুল্লতা, সংস্কৃতি ও মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার। সেখানে বিশেষভাবে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি এবং সাধারণভাবে অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি মহাদেশের অধিবাসী এবং পৌত্তলিক শাসকদের সম্মান ও শ্রদ্ধা ছিল। এ মহাদেশে ইসলাম প্রসারের আরও একটি কারণ হলো নিন্দনীয় চরিত্রের প্রতি ইসলামের বিতৃষ্ণা। যেমন [নৈতিকতা বিবর্জিত] দাসপ্রথা ও বর্ণবৈষম্য, যা ঔপনিবেশিক শাসকেরা আফ্রিকার মানুষের সাথে করেছিল।

ওই সময়ে পৌত্তলিক রাষ্ট্রসমূহে ইসলাম বিস্তার লাভ করেই থেমে থাকেনি; বরং মহাদেশে বেশ কয়েকটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে কতগুলো ইসলামি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল পূর্বের পৌত্তলিক রাষ্ট্রের ধ্বংসাবশেষের ওপর এবং অন্যান্যগুলো গঠিত হয়েছিল নতুনভাবে। এরপর পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে এর বিস্তৃতি ঘটে। ক্রুসেডাররা এ মহাদেশে আগমন করে, সেখানে অবস্থান করা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এবং এর অধিবাসীদেরকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য। কিন্তু মহাদেশের মধ্যে দমন-পীড়ন, নির্যাতন ও দাসত্বে বাধ্যকরণ সত্ত্বেও মুসলমানদের প্রতিরোধ থেমে যায়নি।

আফ্রিকা মহাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কতগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, যেগুলো শাসন করে মুসলমানরা এবং অন্যগুলো শাসন করে খ্রিষ্টানরা। মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ঔপনিবেশিক শাসকরা চলে যাওয়ার আগে খ্রিষ্টানদের শক্তিশালী করে এবং তাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়ে যায়। আর এ কারণে আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সত্ত্বেও তাদের শাসক অমুসলিম। এই অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। যথা :

প্রথম পরিচ্ছেদ : আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ, কীভাবে সেখানে ইসলাম পৌছল এবং ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসকেরা আগমনের পূর্ব পর্যন্ত কীভাবে তা প্রসারিত হলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ক্রুসেডারদের শাসনাধীনে আফ্রিকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আফ্রিকায় স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ।



মানচিত্র নং-৩০

আফ্রিকার ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ (ছায়া আচ্ছাদিত অংশ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রুসেডার ঔপনিবেশিকদের আগমনের পূর্বে ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ

১. পশ্চিম আফ্রিকা

মালি রাজ্য

ঘানা থেকে ভেঙে মালি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঘানা ছিল পৌত্তলিক রাজ্য। সেখানে ইসলামের আগমন ঘটে উত্তর দিক থেকে এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানরা পৌঁছে যায় সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে, যেখানকার পৌত্তলিক রাজারা তাদেরকে উপদেষ্টা এবং প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। অতঃপর পশ্চিম দিক থেকে সেখানে মুজাহিদরা আসেন, এ দেশকে বিজয় করেন এবং বড় আকারে ইসলামের প্রসার ঘটান। এরপর শুরু হয় মুজাহিদদের দেশ দখল করা; যে কারণে অধিকাংশ গোত্র স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। এতে ঘানার ভূতপূর্ব রাজারা পুনরায় শাসন ক্ষমতায় ফিরতে সক্ষম হয়। কিন্তু এবারে ইসলাম দেশকে নেতৃত্ব দেয় এবং অধিকাংশ রাজা মুসলমান হয়ে যান। এরপর শুরু হয় নওমুসলমান মানডিংগো সম্প্রদায়ের প্রভাব, যা ঘানার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এমনকি তারা এর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং মালি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা সানডিয়ানার আমলে সম্প্রসারিত হওয়া শুরু হয়। তিনি তার রাজ্যকে উত্তরে সাহারা মরুভূমি এবং দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগর, পূর্বে নাইজেরিয়ার উত্তর অংশ থেকে পশ্চিমে এটলাস পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হন। রাজা সানডিয়ানা হজ পালন করেন এবং তার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ইসলাম প্রচারে কাজ শুরু করেন।

রাজা সানডিয়ানার পর তার পুত্র মানসা মুসা[১৯] মসনদে বসেন, যিনি তার পিতার মতো রাজ্য সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখেন। তিনি নাইজার নদীর তীরে এবং পশ্চিমে টকুলার রাজ্যের পাশে অবস্থিত মুসলিম সানগাই রাজ্যকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি ইসলাম প্রচারের পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখেন। তার সময়ে ইসলাম নাইজেরিয়া পর্যন্ত

---

১৯. মানসা মুসা। তিনি ছিলেন বর্তমান মালির শাসক। মানসা মুসাকে বলা হয় সর্বকালের ধনীদের একজন। ২০১৫ সালে টাইম ম্যাগাজিন ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী ১০ জনের তালিকা করে। এতে সর্বকালের সেরা ধনী বলা হয় মানসা মুসাকে। ১৩০৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ক্ষমতায় বসেন। আল্লামা মাকরিজির বর্ণনামতে, মানসা মুসা হজ করেন ৬২৪ হিজরিতে। তার এই হজের সফরই ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। সফরের শুরুতেই তিনি পৌঁছেন মিশরে। সেখানে তখন আল-মালিকুন নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউনের শাসন চলছিল। মানসা মুসার আগমনের সংবাদ শুনে সুলতান তাকে অভ্যর্থনা জানান। সুলতান তার নিজের কেল্লায় মানসা মুসাকে অবস্থান করার অনুরোধ করেন। প্রথম যেদিন মানসা মুসা সুলতানের দরবারে উপস্থিত হন তাঁকে বলা হয় দরবারের রীতি মেনে সুলতানের সামনে মাটি চুম্বন করতে। তখন মানসা মুসা বলেন, 'আমি শুধু আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সামনেই মাথা নিচু করি।' সুলতান এ কথায় প্রভাবিত হন। তিনি মানসা মুসাকে খুব সম্মানের সাথে রাখেন। তাকে অনেক উপহার দেন। মানসা মুসার বিশাল কাফেলার আগমনে মিশরের অর্থনীতিও প্রভাবিত হয়। একদিকে তাঁর স্বর্ণ বিতরণের কারণে সোনার দাম কমে যাচ্ছিল, আবার তার কাফেলার কাছে জিনিসপত্র বিক্রির মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা খুব লাভবান হচ্ছিল। এ সময় সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীরা বেশ মুনাফা লুটে নেয়। তারা এক দিনার মূল্যের কাপড় ৪৬ দিনারে বিক্রি করতে থাকে। এরপর মানসা মুসা পৌঁছলেন মক্কায়। সেখানেও তিনি প্রচুর দান করেন। তবে মক্কার আবহাওয়া তার কাফেলার সদস্যদের জন্য সহনীয় হয়নি। তার কাফেলার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যই এই সফরে মারা যায়। মানসা মুসা ছিলেন প্রজাবান্ধব শাসক। সাম্রাজ্যের উন্নতিতে তিনি প্রচুর কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলেন। হজের সফর থেকে ফেরার সময় তিনি আন্দালুসের কবি আবু ইসহাক ইবরাহিম সাহেলিকে সাথে নিয়ে আসেন। তিনি নিজের রাজ্যে প্রচুর মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করেন। থিমবুকতু শহরেও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে তা মাদরাসায় রূপান্তরিত হয়। তারও পরে এটি ইউনিভার্সিটি অব শাংকোর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্তমানে এর কার্যক্রম খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। আটলান্টিকের তীর থেকে তিম্বাকতু পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার মাইল এলাকায় মানসা মুসা রাজত্ব করেছিলেন। সুদানের অমুসলিম গোত্রগুলোর সাথে বারবার তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। শত্রুপক্ষের সেনারা বন্দি হলে তাদের পাঠানো হতো স্বর্ণের খনিতে। শ্রমিক হিসেবে। ২৫ বছরের শাসন শেষে ১৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মানসা মুসা মারা যান। বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আযযাহাবুল মাসবুক ফি যিকরি মান হাজ্জা মিনাল খুলাফায়ি ওয়ালমুলুক*, পৃ-১৪০, আল্লামা মাকরিজি। *মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার*, ৪/৫৮, শিহাবুদ্দিন উমারি। *আদ-দুরারুল কামিনাহ*, ৪/৩৮৩, ইবনু হাজার আসকালানি। *The Encyclopaedia Of Islam*, part-6, page-422 (E J Brill, 1991) - সম্পাদক

বিস্তৃত হয়। মালি খনিজসম্পদের কারণে ধনী রাষ্ট্র ছিল। যেমন স্বর্ণ, যার মজুদ ছিল রাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে এবং লবণের ব্যাপকতা ছিল উত্তরাঞ্চলে। মানসা মুসার ভাই সুলাইমান মুসা মারা যাওয়ার পর রাজ্যটি দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজ্যটির ভাঙন শুরু হয়, বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এর অধিকাংশ অঞ্চল স্বাধীন হয়ে যায়। রাজ্যটি এতই সংকুচিত হয়ে যায় যে মালির উৎপত্তিস্থল নাজাবা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা পরবর্তী সময়ে এটিও দখল করে নেয়।

সানগাই রাজ্য

এটি ছিল একটি পৌত্তলিক রাজ্য। এর একজন রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এটিকে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করেন। এই রাজ্যের সাথে কানজাবা রাজ্যের প্রায়ই যুদ্ধ হতো, যেটি শাসন করত মানডানজো সম্প্রদায়, যারা পরবর্তী সময়ে মালি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। শুরুর দিকে সানগাই রাজ্যের প্রাধান্য ছিল। পরবর্তী সময়ে মালি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর পূর্ববর্তী পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। সে সানগাইকে নিজেদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে সানগাই রাজার দুই পুত্রকে বন্দি করে। অতঃপর মালি রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সানগাই রাজার দুই পুত্র পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তারা সানগাইতে ফিরে আসে। সানগাইয়ের যুবকেরা তাদের নিকট জড়ো হয় এবং মালির সাথে যুদ্ধ শুরু করে। তারা তাদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়, এমনকি মালির বিশাল অংশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সানগাই রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল, এটি নাইজার নদীর চারদিকের সকল ভূমি নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তারা মাওশা জানজিয়া রাজ্যকে নিজেদের সাথে যুক্ত করে এবং উত্তর নাইজেরিয়া, মানডানজো, ফুলানি, উত্তর দিকে তুওয়ারেখ রাজ্যের কিছু অংশেও প্রবেশ করে। সানগাই রাজ্যটি আসকিয়া মুহাম্মাদের আমলে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয়েছিল। সানগাই রাজ্য সে সময়ে পশ্চিমে মানডানজো এবং ফুলানি থেকে পূর্বে আগাদিস এবং হাউসা রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মাওশা রাজ্য থেকে উত্তরে কাআজা রাজ্য পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সানগাই রাজ্যে একের পর এক অনেক রাজা শাসন করেছিলেন। রাজা আসকিয়া নুহ মারাকেশের সাথে যুদ্ধ করার সময় নিহত হন এবং সানগাই সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে। পশ্চিম মারাকেশিরা এর কর্তৃত্ব পায় এবং তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। সেখানে তারা একটি রাষ্ট্র গঠন করে, যার

রাজধানী ছিল তিম্বুকতু[২০]। পরবর্তী সময়ে রাজ্যটি ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

হাউসা রাজ্য

হাউসা অঞ্চলটি বর্তমানে উত্তর নাইজেরিয়ায় অবস্থিত। এখানে অনেক পৌত্তলিক রাজ্য ছিল। এখানকার কানু রাজ্যের রাজা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন। এখানে মুসলমান আলেমগণ এলে তারা রাজা উসমানের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার রাজ্যে ইসলামের প্রসারে কাজ করেন। কানুর রাজাদের মধ্যে যিনি ইসলামের প্রসার বৃদ্ধি করেছিলেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন রাজা উমর।

হাউসা রাজ্যে ইসলামের প্রসার শুরু হয়। পশ্চিম অঞ্চলে মানডানজো সম্প্রদায় দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে অবদান রাখে। আর মিশর ও সুদানের দাঈগণ রাজ্যের পূর্ব দিকে এবং মধ্যাঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। ফুলানিরাও এ অঞ্চলগুলোতে ইসলামের প্রসারে অবদান রাখেন।

হাউসা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত থাকলেও এক রাজ্য অন্য রাজ্যের ওপর কর্তৃত্ব করার ফলস্বরূপ একসময় তা ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। হাউসা কখনো কখনো তাদের প্রতিবেশি রাজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করত। সেগুলোর মধ্যে ছিল কুবা, কাতসিনা, জানফারা ও জুবার রাজ্য।

হাউসা রাজ্যে ইসলামের প্রসারে যারা কাজ করেছেন, তাদের অন্যতম হলেন, উসমান দান ফিদো[২১], যিনি জুবারের পৌত্তলিক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সংকল্প করেছিলেন। জুবারের রাজা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল। দান ফিদো পৌত্তলিক শাসকের বিরুদ্ধে

---

২০. তিম্বুকতু হলো পশ্চিম আফ্রিকার মালির উত্তর অংশে অবস্থিত একটি বিস্ময়কর শহর। ফরাসি ভাষায় এটি তোম্বৌকুত নামে অভিহিত। অরফিক আফ্রিকান শহরটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এটি ধারণা করা হয় যে, দ্বাদশ শতকে তুয়ারেগ যাযাবররা এই শহরটির প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তীকালে এটি লবণ, পরিবহন ও সাহারার স্বর্ণ বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে উঠেছিল। এখানে প্রচুর মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করা হয়েছিল। -সম্পাদক

২১. উসমান দান ফিদো। তিনি ছিলেন মালেকি মাজহাবের একজন আলেম এবং সেনাপতি। তার জন্ম ১৭৫৪ সালে, মৃত্যু ১৮১৭ সালে। তিনি সকোতো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার উপাধি ছিল আমিরুল মুমিনিন। -সম্পাদক

বিজয়ী হতে সক্ষম হন এবং জুবারের বিস্তৃত রাজ্যকে নিজের কর্তৃত্বে নিয়ে আসেন। তিনি সেখানে ইসলামকে প্রসারিত করেন এবং একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হাউসা রাজ্যের পৌত্তলিকতার কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করতে শুরু করেন। দান ফিদো একটি বিশাল রাজ্য গঠন করেন এবং এর সাথে কয়েকটি ইসলামি রাজ্যকেও অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। তার পুত্র ও ভাই রাজ্যকে বিভক্ত করার আগ পর্যন্ত তার রাজ্য কখনো দুর্বল হয়নি। দান ফিদো দাওয়াতি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে সেখানে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা আসে এবং তা দখল করে নেয়।

বরনু-কানিম

বরনু হাউসা রাজ্যের পূর্ব দিকে অবস্থিত। বর্তমানে এটি নাইজেরিয়া সীমান্তকে সংযুক্ত করেছে। কানিম হলো বরনুর পূর্ব দিকে চাদ হ্রদের তীরে অবস্থিত এবং এটি চাদের সাথে সংযুক্ত। বরনু ও কানিমির ইতিহাস পরস্পর সংযুক্ত। কারণ, তারা উভয়েই বেশিরভাগ সময় একই শাসকের অধীনে শাসিত হয়েছিল।

কানিম রাজ্যে যে রাজা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হলেন হুমিয়া জাইলামা। তাকে মুহাম্মাদ নামে ডাকা হতো। কানিমে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। এটি একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়, যেটি বরনু ও অন্যান্য রাজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। একসময় এটি নীলনদ ও নাইজারের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজ্যে পরিণত হয়। অতঃপর কানিম রাজ্য দুর্বল হওয়া শুরু করে এবং রাজ্যের অভ্যন্তর সংঘাতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এতে বুলালা সম্প্রদায় রাজ্যটি দখল করে নেওয়ার সুযোগ পায় এবং তারা রাজধানীতে প্রবেশ করে। কানিমের শাসকরা বরনুতে পালিয়ে যায় এবং হারানো কানিম রাজ্যকে পুনরায় হস্তগত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

রাজা ইদরিস কানিম পুনর্দখল করতে সক্ষম হন এবং তিনি বুলালাদেরকে তাড়িয়ে দেন। তিনি তার রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করতে শুরু করেন এবং ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য কাজ করতে থাকেন। তার শাসনামলে দলে দলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছিল। তার মৃত্যুর পর অনেক রাজা রাজ্য শাসন করেছিলেন। তাদের মধ্যে রাজা আলি বিন উমর প্রসিদ্ধ। অতঃপর রাজারা দুর্বল হতে থাকে এবং তাদের কারণে রাজ্যও দুর্বল হতে থাকে। একসময় রাজ্যটি সংকুচিত হয়ে পড়ে।

উসমান দান ফিদো এসে বরনুকে একত্র করেন। অতঃপর আমির মুহাম্মাদ আমিন কানিমির আবির্ভাব হয় এবং তিনি রাজ্যটি স্বাধীন করতে সক্ষম হন। তিনি রাজা ইদরিসের আমলে অধিকৃত ভূমিগুলো পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন এবং তা ইদরিসের আমলের সমান হয়ে যায়। কানিমি বংশের অনেক রাজা এরপর শাসন করেছিলেন। একসময় রাজ্যটি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন রাবাহ জুবাইরি সুদানি আসেন এবং দেশটিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। বলা বাহুল্য, রাবাহ ছিলেন জুবাইরের সেনাধ্যক্ষদের একজন, যিনি মিশরীয় শাসনের অধীনে সুদান বিজয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। রাবাহ সুদান থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা করে বাগরিমি, কানিম ও বরনু সাম্রাজ্য বিজয় করেন এবং কানিম পরিবারের দেশ পরিচালনার ইতি টানেন। রাবেহ দেশ শাসন করতে থাকেন। অতঃপর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা আসে। বরনুদের সাথে উসমানিদের যোগাযোগ ছিল। তারা তাদেরকে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা সাহায্য করত, যা তাদের দেশ গঠনে বিশাল অবদান রাখে।

বাগরিমি

বাগরিমি কানিমের দক্ষিণ দিকে বর্তমানে মধ্য আফ্রিকার চাদ প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত। এটি ছিল একটি পৌত্তলিক রাজ্য। ব্যবসা ও দাওয়াতের মাধ্যমে সেখানে ইসলাম পৌঁছেছে। পৌত্তলিক রাজা মালোর আমলে সেখানে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। তার ভাই আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। আবদুল্লাহ বাগরিমি অধিকার করতে সক্ষম হন। তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কাজ শুরু করেছিলেন এবং আশপাশের অনেক অঞ্চলকে তার রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাগরিমি রাজ্য বরনুর রাজা ইদরিসকে জিজিয়া দিত। রাজা ইদরিসের মৃত্যুর পর বাগরিমি রাজ্য জিজিয়া দেওয়া বন্ধ করে দেয়। রাজা আবদুর রহমান জাওরানজের আমলে বাগরিমি দুর্বল হয়ে পড়ে। ওয়াদাইয়ের রাজা আবদুল করিম সাবুন সুযোগ পেয়ে বাগরিমি দখল করে নেন। অতঃপর ওয়াদাই রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বাগরিমি রাজ্য তাদের থেকে স্বাধীন হতে সক্ষম হয়। এরপর রাবাহ জুবাইরি বাগরিমিকে তার নিজ রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করে নেন। বাগরিমির রাজা ফরাসিদের সাথে রাবাহ জুবাইরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। রাবাহ পরাজিত হয় এবং ফরাসিরা বাগরিমিকে দখল করে নেয়।

ওয়াদাই

ওয়াদাই বাগরিমির পূর্ব দিকে অবস্থিত। এটি বর্তমানে চাদ প্রজাতন্ত্রের একটি অংশ। জাগাওয়া নামে এক মুসলিম গোত্র ওয়াদাইতে আসে। অতঃপর তানজুর ও অদাই গোত্র দখল করে। তারাও নুবিয়ান মুসলিম কিন্তু তারা ইসলাম প্রচারে যত্নবান ছিল না। অতঃপর আবদুল কারিম সালিহ আবির্ভূত হলেন তিনি ইসলাম প্রসারে কর্মসূচি গ্রহণপূর্বক চারপাশের সৈন্যদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তানজুরের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেন। পূর্বের শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন আবদুল কারিম সাবুন, তিনি বাগরিমিকে যুক্ত করেছিলেন। অতঃপর বাগরিমি ওয়াদাই থেকে স্বাধীন হয়েছিল। রাবাহ জুবাইর ক্ষমতায় আসার পর আবার বাগরিমিকে ওয়াদাইয়ের সাথে যুক্ত করা হলো। কিন্তু ফরাসিরা রাবাহকে পরাজিত করতে সক্ষম হয় এবং পরে ফরাসিরাই দখলদার হয়ে পড়ে।

২. আরব সুদান

আরব বলা হতো সাহারার দক্ষিণে অবস্থিত বিশাল অঞ্চলের যেখানে কৃষ্ণাঙ্গরা বসবাস করছিল। আর সাওদুন (কৃষ্ণ/কালো) শব্দ থেকে 'সুদান'-এর ব্যবহার। আরবরা এখন পর্যন্ত এ নামটি ধরে রেখেছে।

আরবরা সুদানে আসার আগে এটি বহু গোত্র ও রাজ্যে বিভক্ত ছিল । জনসাধারণ মূর্তিপূজায় জর্জরিত ছিল। এখানে আমরা সুদানের অঞ্চলগুলো এবং তথায় কীভাবে ইসলাম প্রবেশ করেছে এবং ঔপনিবেশিকদের আগমনের আগ পর্যন্ত আরব সুদানে বিভিন্ন সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রের উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করব।

দারফুর[২২]

হিজরতকারী আরব গোত্রগুলোর এখানকার নাগরিকদের সাথে মিলেমিশে বসবাসের মাধ্যমে এখানে ইসলামের প্রসার ঘটে। মূল অধিবাসীরা আরবদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হতে থাকে। এভাবে তাদের অধিকাংশ

---

২২. **দারফুর :** সুদানের একটি অঞ্চল। কয়েকশ বছর ধরে এখানে সুলতানাতের শাসন বিদ্যমান। অঞ্চলটি তিনটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ নিয়ে গঠিত। এই তিনটি প্রদেশ হচ্ছে: পশ্চিম দারফুর, দক্ষিণ দারফুর এবং উত্তর দারফুর এবং এগুলো ট্রানজিশনাল দারফুর রিজিওনাল অথরিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ২০০৩ সাল থেকে যুদ্ধের কারণে অঞ্চলটিতে চরম মানবিক বিপর্যয় বিদ্যমান। -সম্পাদক

লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে এবং আরবি ভাষারও প্রসার হতে থাকে। আরবের প্রসিদ্ধ গোত্রের মধ্যে যারা দারফুরে হিজরত করে তারা তিউনিসের তানজুর গোত্র। তাদের মধ্যে আহমাদ নামক এক ব্যক্তি দাওয়াত দিয়ে পৌত্তলিক রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজা তাকে পছন্দ করলেন, তাকে কাছে টানলেন এবং তার হাতে দেশ চালানোর দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন।

ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি দেশে সংশোধনী, ঐক্যবদ্ধতা ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসেন। তিনি পৌত্তলিক রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন রাজার মৃত্যুকালে কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। ফলে আহমাদ উত্তরাধিকারীভাবে রাজ্যের রাজা হলেন। তার সুলাইমান নামে এক পুত্রসন্তান হয়, যিনি তার পিতার মৃত্যুর পরে রাজ্যের রাজত্ব লাভ করেন। এমনইভাবেই দারফুর ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এরপর লাগাতার এখানে মুসলিম শাসকদের রাজত্ব চলতে থাকে। অতঃপর মুহাম্মাদ আলির শাসনকালে জুবাইর পাশা এ দেশে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং এ অঞ্চলকে মিশরের সাথে যুক্ত করে পরে এটার সাথে সোমালিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করে। দারফুরে (মিশরীয় ও ইংরেজদের) দ্বৈত আক্রমণ হতে থাকে। অতঃপর আহমাদ পরিবারের সদস্য আলি বিন দিনার ক্ষমতার প্রত্যাবর্তন করে। সুদান সরকার ইংরেজদের অনুগত ছিল। পরে আলি বিন দিনার ও সুদান সরকারের মাঝে যুদ্ধ হয়, এতে সরকার বিজয়ী হলে দারফুরকে দখল করে নেয়।

কুর্দফান[২৩]

ফাতিমি শাসনের অবসান হওয়ার পর মিশর থেকে অনেকে চলে আসে এবং অনেক আরব গোত্র কুর্দফানে হিজরত করে। মুহাম্মাদ আলির পরিবারের শাসনামলে কুর্দফান মিশরীয় শাসনাধীন হয়। সেখানে ইসলামের প্রসারে মিশরীয়দের জন্য বড় ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। সেখানে অনেক দাঈর আগমন ঘটে। তাদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন মুহাম্মাদ উসমান আল মিরঘানি। তিনি সেখানকার অনেক মানুষকে সফলভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। সেখান থেকে

---

২৩. মধ্য সুদানে অবস্থিত একটি এলাকা। এর আয়তন তিন লক্ষ আশি হাজার বর্গকিলোমিটার। -সম্পাদক

মাহদি আন্দোলন শুরু হয়। যা সুদানে প্রবেশ করে কিন্তু ইংরেজরা তা থামিয়ে দেয় এবং মিশরীয় ইংরেজ দ্বৈত শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

আল-বাজ্জা

এটি পূর্ব সুদানে অবস্থিত। আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ এটা জয়ের জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রাস্তার কণ্টকাকীর্ণতা ও পানি সংকট এর বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া এখানকার বাসিন্দারা কর প্রদানেও সম্মত হয়ে যায়। তবে আব্বাসি শাসনামলে মুসলমানদের সাথে করা চুক্তি ভেঙে দিয়েছিল, ফলে মুসলমানদের সাথে তাদের যুদ্ধ বেধে যায়। প্রত্যেকবারই মুসলমানরা বিজয় লাভ করে এবং বাজ্জা অধিবাসীদের থেকে বশ্যতার স্বীকারোক্তিমূলক চুক্তি সম্পাদন করে। কিন্তু এ সম্প্রদায় বারবার বিদ্রোহ করে এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে। আরব গোত্রগুলো বাজ্জাতে হিজরত করে জনগণের সাথে মিশে যায় এবং তথায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বাজ্জা ছিল ফুনজ রাজ্যের অধীনে। যা মাগরা ও আলওয়াজুড়ে বিদ্যমান ছিল। মুহাম্মাদ আলি পরিবারের শাসনামলে এগুলো মিশরের সাথে যুক্ত হয়।

ফুনজ রাজ্য

নীলাভ নীলনদ[২৪] শ্বেত নীলনদের সাথে মিলিত হওয়ার আগে দক্ষিণ নুবিয়া রাজ্যের সীমান্তে মাগরা ও আলওয়া নামে দুটি খ্রিষ্টান রাজ্য ছিল। যখন মিশরে ইসলামের আগমন ঘটে তখন ওই রাজ্যদ্বয় এবং

---

২৪. **নীলনদ :** আফ্রিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদ। বিশ্বের দীর্ঘতম নদও বলা হয় একে। যদিও ব্রাজিল দীর্ঘতম হিসেবে অ্যামাজন নদীকে দাবি করে। নীলনদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৬৫০ কি. মি.। আফ্রিকায় মোট এগারোটি দেশ তথা তানজানিয়া, উগান্ডা, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, কঙ্গো, কেনিয়া, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, দক্ষিণ সুদান, সুদান ও মিশরে প্রবাহিত হচ্ছে নীলনদের পানি। তবে বিশাল মরুভূমি অঞ্চল সুদান ও মিশরের পানির মূল উৎস এই নদ বিধায় এ দুটি দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে নীলনদের নাম অধিক উচ্চারিত হয়। নীলনদের দুটি উপনদ রয়েছে : শ্বেত নীলনদ ও নীলাভ নীলনদ। শ্বেত নীলনদ দীর্ঘতম। এর উৎপত্তি আফ্রিকার মধ্যভাগের হ্রদ অঞ্চল থেকে এবং নীলাভ নীলনদের উৎপত্তি টানা হ্রদ থেকে যা ইথিওপিয়ায় অবস্থিত।

সুদানের দক্ষিণাঞ্চল দিয়ে শ্বেত নীলনদ এবং পূর্বাঞ্চল দিয়ে নীলাভ নীলনদ প্রবাহিত হয়ে সুদানের রাজধানী খার্তুমে এসে মিলিত হয়ে দেশটির উত্তরাঞ্চল দিয়ে মিশরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। মিশরের দক্ষিণাঞ্চল থেকে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার অতিক্রম করে নীলনদ দেশটির উত্তরাঞ্চলে নদী মোহনায় বিশাল ব-দ্বীপ সৃষ্টি করে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। নীলনদের সম্পূর্ণ প্রবাহ মানচিত্র লিংক : https://bit.ly/3kgnTkC -সম্পাদক

মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। তারপর একটি শান্তিচুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, যা আলবাকত চুক্তি নামে পরিচিত। এতে উত্তর ও দক্ষিণ উপত্যকার মধ্যে অর্থনৈতিক বিনিময়-সমঝোতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাগরা রাজ্য মামলুক শাসনকালে চুক্তি ভঙ্গ করে মামলুকদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের সাহায্য গ্রহণ করে। জাহের বাইবার্স বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অভিযান চালায়, সেখানে মামলুক রাজা নির্ধারণ করা হয়। এখানে অনেক আরব গোত্র হিজরত করে এবং দেশের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ব্যবহার করে ইসলাম প্রচার করতে থাকে। ফলে আরব গোত্রের হাতে ক্ষমতা আসে।

অনেক মুসলিম এবং আরব আলওয়ায় হিজরত করার পরও মুসলমানদের হাতে নিয়ন্ত্রণ আসতে অনেক সময় লেগেছে। অতঃপর আবির্ভাব ঘটে ফুনজের, যারা উমাইয়া বংশোদ্ভূত ফুনজ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত এবং আবদালাতের, যারা কাসিম বংশোদ্ভূত আবদুল্লাহ জেমার সাথে সাথে সম্পৃক্ত। তারা এটাকে বৃহৎ কেন্দ্রীয় ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল, যা ফুনজ রাজ্য নামে পরিচিত। ফুনজরা আবাদালাতকে মাগরা অঞ্চলে শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করে, আর ফুনজ রাজত্ব করে আলওয়া অঞ্চলে। ফুনজ রাজ্য প্রশস্ত করতে থাকে এবং এতে বাজ্জা ও কুর্দফানের অধিকাংশ ভূমি শামিল করতে সক্ষম হয়। হাবশি খ্রিষ্টান ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফুনজ বিজয় লাভ করে। আর ফুনজ রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়, যা পরে মুহাম্মাদ আলির পরিবারের শাসনকালে মিশরের সাথে যুক্ত হয়েছিল। অতঃপর ইংরেজরা এসে সব দখল করে নেয়।

মিশরীয় শাসনামলে সুদান

মুহাম্মাদ আলির শাসনামলে মিশর আরবি সুদান অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। মিশরের বিবরণে আমরা এর কথা আলোচনা করেছি। খেদিভ ইসমাইলের যুগে সুদানের বিভিন্নমুখী অভিযান থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, তিনি সুদানকে অতিক্রম করে আরও সম্প্রসারণ করেছেন। যাতে নীলনদের উৎস, লোহিত সাগরের সমস্ত উপকূল, আফ্রিকান হর্ন ও ইথিওপিয়ার হারার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে।

আফ্রিকায় মিশরের বিজয়গুলো এর চেয়েও বেশি ব্যাপক হতে পারত, যদি মিশরীয় সেনাবাহিনীতে দুইজন ইংরেজ অধিনায়ক না থাকত। তারা হলো স্যামুয়েল ও গর্ডন। মিশরীয়দের ধারাবাহিক বিজয়ে তারা বাধা সৃষ্টি করেছিল। জানজিবার গভর্নর মিশরের সুরক্ষায় থাকার আবেদন করলে

অধিনায়ক গর্ডন বিষয়টি বাতিল করে দেয় এবং জানজিবারের গভর্নরকে মিশরের সুরক্ষায় না থাকার সতর্কবার্তা পাঠায়।

সুদানের মহান বিজেতা জুবাইর পাশাকে, এমনইভাবে তার পুত্র সুলাইমানকে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে গর্ডনের বড় ভূমিকা ছিল। এটা উল্লেখ্য যে, মিশরীয় সেনাবাহিনী আফ্রিকার এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল; এ কারণে এখানে ইসলামের প্রসারে তাদের বড় অবদান ছিল। আমরা এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে এখনো ইসলামের আনুগত্য খুঁজে পাই।

সুদান ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের দ্বৈত শাসনের পূর্ব পর্যন্ত মিশরের অধীনে ছিল। আফ্রিকার মিশরের সম্পত্তি বিভক্ত ছিল ইংরেজ, ফ্রান্স, ল্যাটিন, ইথিওপিয়া ও বেলজিয়ামের মধ্যে। এগুলো নিয়ে আফ্রিকায় ইউরোপিয়ানদের দখলদারি অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

৩. আফ্রিকার পূর্ব উপকূল

দাওয়াত ও বিজয়ের মাধ্যমে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ইসলাম প্রবেশ করে। এ দিক থেকে ইসলাম প্রসারিত হওয়াটি দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত ছিল। বিদেশিদের দখলদারিতে নেওয়া পর্যন্ত সেখানে বিভিন্ন ইসলামি রাজত্ব গঠিত হয়েছিল।

যাইলা ও হেরাত (আদল রাজ্য)

উত্তর সোমালিয়ায় ইসলামি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আরব উপদ্বীপ হতে দাওয়াতের মাধ্যমে এই অঞ্চলে ইসলাম আসে। এ অঞ্চল থেকে প্রথমত যাইলায় ইসলাম প্রসারিত হয়, যেহেতু আরব উপদ্বীপ থেকে মুসলমানরা হিজরত করায় এখানে ইসলামি রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। এরপর তারা অন্য আরও অনেক ইসলামি রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ করে। এগুলোর মধ্যে ছিল আওফাত ও হারার; হারার ছিল আবিসিনীয়দের নিয়ন্ত্রণে। আওফাত শক্তিশালী ও আবিসিনিয়া দুর্বল হওয়ার পর আওফাত হারার শহরকে আবিসিনিয়া থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। ফলে হারার আবিসিনিয়ার মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যকার যুদ্ধের ঘাঁটি হয়ে যায়। অতঃপর আদল রাজ্য গঠিত হয়, যা বিস্তৃত হয়েছিল উত্তর সোমালিয়ার অধিকাংশ এলাকাজুড়ে। তাদের এবং আবিসিনীয়দের মধ্যে যুদ্ধ পুনরুজ্জীবিত হয়। সেখানে মুসলমানরা বড় ধরনের বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়। এতে

আবিসিনিয়ার বিশাল অংশ যুক্ত হয়। বিশেষ করে উসমানিরা তাদের সমর্থনের পর পর্তুগিজ আবিসিনিয়ানদের সাহায্য করেছিল।

আদল রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজাদের মধ্যে সুলতান আহমাদ ছিলেন আবিসিনিয়ার পুরোহিতদের একজন। তিনি পলায়ন করে আদলে এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা করেন, অতঃপর ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হন। তিনি আবিসিনিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং উসমানিদের সহযোগিতায় এর অধিকাংশ এলাকা জয় করতে সক্ষম হন এবং এর বিজিত অংশে ইসলামের প্রসারে নিয়োজিত হন। অতঃপর উসমানি এবং আদল রাজ্যের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এতে আদল রাজ্য দুর্বল হতে থাকে আর আবিসিনিয়ানরা আগের অবস্থানে চলে আসে।

উসমানিরা সোমালিয়ার উত্তর উপকূল তাদের শাসনের সাথে সংযুক্ত করে। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ইয়ামেনের অনুগত ছিল। ইয়ামেনের সাথে যুক্ত হওয়ার পর তারা উসমানিদের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তখন আদলের রাজত্ব হারার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, যা ক্রমেই সংকুচিত হতে শুরু করে। এমনকি খোদ হারার শহর পর্যন্ত ছোট হয়ে আসে। বাকি অংশটুকু পরে আবিসিনিয়া ও গালা উপজাতিদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। খেদিভ ইসমাইতার শাসনামলে উত্তর সোমালিয়া ও হারারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন এবং আবিসিনিয়া ও গালা উপজাতিদের দখলীকৃত অধিকাংশ এলাকা উদ্ধার করেন। এসব অঞ্চল অব্যাহতভাবে মিশরের আনুগত্য করে। ফলে সেখানে ইসলামের প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইংরেজদের দখলদারি অধীনে চলে যায়। ইংরেজরা ফ্রান্সকে সোমালিয়ার একটি অংশ দখল করার অনুমতি দেয় যাকে বর্তমানে জিবুতি বলে। আর আবিসিনিয়াকে হারার এলাকাটি দিয়ে দেয়।

মোগাদিসু

আমরা যখন মোগাদিসুর কথা বলি তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয় দক্ষিণ সোমালিয়াকে। অনেক আরব দক্ষিণ সোমালিয়ায় হিজরত করে মোগাদিসু ও বারাওয়া শহর গঠন করেছে। পূর্ব আফ্রিকায় বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং চতুষ্পার্শ্বে উদ্ভূত রাজ্যের মোকাবিলায় দীর্ঘ মেয়াদে এর স্বাধীনতা বজায় রেখেছে।

সোমালিয়ার আল-আবজাল গোত্র মোগাদিসু নিয়ন্ত্রণে এসেছিল সেখানে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পর। রাজ্যটির প্রতিষ্ঠাতা শাইখ উমর জালুলার পরিবার এর শাসনক্ষমতা পরিচালনা করে। তারা উসমানি শাসকদের সাথে ভালো সম্পর্ক রেখে শাসনকাজ চালায়। তারা উসমানিদের আনুগত্য করে এবং রাজাদের সাহায্য করতে থাকে। পর্তুগিজরা মোগাদিসুতে আক্রমণ করলে উসমানি, আরব ও মোগাদিসুরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মোগাদিসুর অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব চলাকালে ঔপনিবেশিক হুমকিতে এখানকার অধিবাসীরা বিপদ্গ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে মোগাদিসু জানজিবার রাজ্যের কাছে খ্রিষ্টান শত্রুদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি যানজ রাজ্যে প্রবেশে সাহায্য করতে দ্রুত এগিয়ে যান। এমনইভাবে ইসমাইল দক্ষিণ সোমালিয়ার বৃহত্তর অংশে প্রভাব বিস্তার করেন।

ইংরেজরা যখন মিশর দখল করেছিল তখন সোমালিয়া বিভক্ত হতে শুরু করে। তখন মোগাদিসু ও দক্ষিণ সোমালিয়া ইতালিয়ানদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

যানজ রাজ্য

আরব থেকে অনেক লোক হিজরত করে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে আসে এবং অনেক শহর ও রাজত্ব গড়ে তোলে; যেমনইভাবে পারসিকরা করেছিল। কালওয়া নামে পারসিকদের গড়া একটি শহর ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে একটি। মুসলমানদের অধিকাংশ রাজত্ব আফ্রিকার হর্ন অঞ্চল থেকে সাফালা অঞ্চল পর্যন্ত গড়ে ওঠে এবং এখানে ইসলাম প্রসারিত হয়। এখানকার অধিবাসীরা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। সুলাইমান বিন আলি দক্ষিণ মোগাদিসু থেকে সাফালা পর্যন্ত রাজ্যগুলোকে একত্র করেন এবং জানজিবার ও বাম্বা দ্বীপদ্বয় যানজ দ্বীপের সাথে সংযুক্ত করে যানজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

এ রাজত্ব কয়েক শতাব্দী ধরে চলছিল এবং এর শাসন আফ্রিকার মধ্যে বিস্তৃত হয়েছিল, এর সাথে ইসলামও প্রসারিত হয়েছে। এরপর রাজ্য বিভক্ত হতে শুরু করে। মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ পর্তুগিজরা তা দখল করে নেয়। অতঃপর পর্তুগিজরা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ হত্যাযজ্ঞ চালায়। তার কিছুদিন পর পর্তুগিজরাও দুর্বল হয়ে যায় এবং তাদের দখলদারির প্রভাব কমতে থাকে। আরব উপদ্বীপে উসমানিদের সমর্থনে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উসমানিরা এখানেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা ভারত ও পূর্ব আফ্রিকান দখলে

রাখা পর্তুগিজদের পিছু অনুসরণ করতে থাকে। পূর্ব আফ্রিকার মুসলমানরা পর্তুগিজদের তাড়াতে তাদের সাহায্য কামনা করে। ওমানিরা যানজ রাজ্য থেকে পর্তুগিজ জাতিকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছিল। এখানকার অধিবাসীরা তাদেরকে সাদরে সম্ভাষণ জানালে যানজ রাজ্য ওমানের অনুগত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তাই যানজ রাজ্যে ইসলাম বৃদ্ধি ও প্রসারিত হতে থাকে।

ওমানে আবু সাইদরা শাসন করতে আসেন। তখন ওমানের প্রতিষ্ঠাতা সাইদ বিন সুলতান রাষ্ট্র গঠন করে মাস্কাটের পরিবর্তে জানজিবারে রাজধানী স্থানান্তরিত করায় যানজ রাজ্য সম্প্রসারিত হয়ে গৌরব ও সম্মানের শীর্ষে পৌঁছে। আফ্রিকাতেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। ফলে এর সীমা কঙ্গো, উগান্ডা, রুদিসিয়া (জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে) পর্যন্ত পৌঁছে। অতঃপর তিনি বিজিত এলাকায় ইসলাম সম্প্রসারণে কার্যক্রম গ্রহণ করেন। যানজ রাজ্য আফ্রিকার পণ্য সংগ্রহ করে বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে।

আবু সাইদের মৃত্যুর পর এ রাষ্ট্র আফ্রিকা ও এশিয়ায় দুটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, এর মধ্যে একটি হলো যানজ রাজ্য। এর প্রসিদ্ধ শাসক হলেন বারগাশ বিন সাইদ। যিনি মুরজিবি নেতার যুগে ক্ষমতায় এসে যানজ রাজ্যের প্রভাব বিস্তার করে কঙ্গোতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেখানে ইসলাম প্রসারে তিনি কাজ করেন। তার শাসনামলে ইউরোপিয়ান দখলদাররা আফ্রিকায় আক্রমণ করতে শুরু করে। ইংরেজ ও বেলজিয়াম মুরজিবিদের উৎখাত করতে এবং নিজেদের ঔপনিবেশিকতা কায়েম করতে পরস্পরকে সহযোগিতা করে। পরে মুরজিবি ও ঔপনিবেশিক জোটের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। ফলে ঔপনিবেশিক জোট কঙ্গো থেকে মুরজিবিকে হটাতে সক্ষম হয়।

যানজ রাজ্যে ঔপনিবেশিকতা ছড়াতে শুরু করে। পুরো যানজ রাজ্যই জার্মান ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। ইংল্যান্ড যে অংশ দখলে নেয় তা বর্তমানে কেনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে আর জার্মানি যে অংশ নেয় তা বর্তমানে তানজানিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। তারা প্রথমদিকে আফ্রিকা উপকূলে কেবল সংকীর্ণ ও অচল এলাকা ব্যতীত আবু সাইদদের জন্য কিছুই ছেড়ে দেয়নি। তারপর ইংরেজরা যানজ রাজ্যের বাকি অংশ দখল করে নেয়। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা পরাজয়বরণ করলে তানজানিয়ায় ইংরেজদের দখলদারি পূর্ণতা লাভ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের অন্যায় দখলদারি

ইউরোপীয় দখলদাররা আফ্রিকা মহাদেশে এসে সম্পদ শোষণ করা শুরু করে এবং শুধু ইউরোপীয়দের জন্য কাজে লাগাতে থাকে। আর আফ্রিকানদের ওপর চরম অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাতে থাকে। তাদের অধিকাংশের কপালে কী ধরনের নির্যাতন আর অমানবিক লাঞ্ছনা জুটেছিল তা আজ অবধি মানবতা প্রত্যক্ষ করছে। আমরা তিনটি শিরোনামে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। সেগুলো হলো, আফ্রিকা মহাদেশে ঔপনিবেশিক প্রভাব বিস্তার, দখলদারদের নিষ্ঠুরতার স্বরূপ ও মহাদেশে তাদের নীতি, উপনিবেশবাদের প্রতিরোধ।

আফ্রিকা মহাদেশে ঔপনিবেশিক প্রভাব বিস্তার

পুরো আফ্রিকা ইউরোপের নৃশংস খ্রিষ্টান দখলদারদের অধীনে ছিল। তারা আফ্রিকার লাইবেরিয়া ও আবিসিনিয়া ছাড়া আর কোনো এলাকার দখলদারি ছাড়েনি। আর এ দুটি অঞ্চলের দখলদারি ছেড়েছিল আফ্রিকায় খ্রিষ্টানদের জন্য শক্তিশালী দুটি ঘাঁটি তৈরি করার উদ্দেশ্যে। আবিসিনিয়া দীর্ঘ সময় ধরে তার স্বাধীনতা বজায় রেখেছে; যতক্ষণ না ইতালিয়ানরা দখল করেছিল, আর তাদের দখলে ছিল মাত্র সাত বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর তারা চলে যায়। আর লাইবেরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল। পরে তারা স্বাধীনতা দেয়। তারপর আফ্রিকার যে সমস্ত এলাকার আফ্রিকানদের দাস বানিয়ে রেখেছিল এবং খ্রিষ্টধর্মের রূপান্তরিত করেছিল তারা লাইবেরিয়ায় ফিরে আসে। যাতে তারা খ্রিষ্টধর্মের প্রসার ঘটায় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এরপর আফ্রিকা ভাগ হয় ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, জার্মানি, বেলজিয়াম ও স্পেনের মধ্যে। দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু অংশ হল্যান্ডের অধীনে থাকে। পরে তা ইংল্যান্ডের কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর অধিকাংশ কলোনি ইংল্যান্ডের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়।

মহাদেশে ঔপনিবেশিক নৃশংসতার স্বরূপ ও নীতি :

আফ্রিকায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক নৃশংসতা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য হলো:

- বহিরাগত ঔপনিবেশিকতা দেশের সর্বস্তরে ও অর্থনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে। দেশের মূল নাগরিকদের জন্য কোনো অংশ ছাড়া হয়নি। তারা ক্ষুধা, গৃহহীনতা ও মহামারিতে কষ্ট করেছে।

- ঔপনিবেশিকতা দেশের নাগরিকদেরকে শুধু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাদের থেকে সুবিধা ভোগ করারও ইচ্ছা করে। আর তা হলো আফ্রিকায় বিশাল পরিসরে দাসের ব্যবসা চালু করে এবং লাঞ্ছনা, অত্যাচার, হেয় প্রতিপন্ন করার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ঔপনিবেশিকরা নাগরিকদের পরিবর্তন করতে শুরু করে। তারা নারী-পুরুষ ও শিশুদের হাঁকিয়ে বাজারে নিয়ে যায়। তাদের বিভিন্ন ধরনের অপমানকর ও প্রতিশোধমূলক কাজে নিয়োজিত করে, বিশেষ করে মহিলাদেরকে। বিক্রির জন্য যাকে পেশ করা হতো তার ধ্বংস অনিবার্য। তারপর ক্রেতারা তাদের নতুন জমি ও শক্ত দ্বীপে নিয়ে যেত। যেখানে উপনিবেশবাদ তাদেরকে ফসল উৎপাদনে বাধ্য করত।

  দ্বীপে যেতে জাহাজে থাকা অবস্থায় তাদের অসদাচরণ, অবহেলা এবং খাদ্যাভাবে হাজার হাজার লোক মারা যেত। অতঃপর তাদেরকে মাছের খাদ্য হিসেবে সাগরে ফেলে দিত। বেত্রাঘাত ও হত্যা ছিল বিদ্রোহীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যাতে এ থেকে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে। যারা যাত্রাপথে বেঁচে থাকত তাদের অফিসারের দপ্তরে না পৌঁছতেই চরম অসহনীয় কষ্টের সম্মুখীন হতে হতো। যার ভোগান্তি মৃত্যু পর্যন্ত শেষ হতো না। দাসদের মানবাধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করার আইন প্রণয়ন করা হয়। তাদের মালিকরা ইচ্ছানুযায়ী তাদেরকে ব্যবহারের অধিকার রাখত। আফ্রিকায় মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ ও তাদের অস্তিত্ব বিলীন করতে তাদেরকে দাস বানানো ছিল দখলদার খ্রিষ্টানদের প্রধান একটা নীতি। এ নীতি তারা মহাদেশের মুসলিম-অমুসলিম সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। নতুন দেশে দেশান্তর হওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত দাস পথিমধ্যে মারা যায়

তাদের সংখ্যা ছিল আশি মিলিয়নের মতো। এটা ছিল যারা অন্য দেশে পৌঁছেছে তার অর্ধেক।

- ঔপনিবেশিকরা আফ্রিকার উর্বর জমি দখল করে সেখানকার নাগরিকদের তাড়িয়ে দেয়। তারা জঙ্গল ও দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় নির্বাসনে চলে যায়। সেটাকে তাদের আশ্রয়স্থল বানিয়ে নেয়। ওই সময় ঔপনিবেশিকতা নাগরিকদেরকে দেশান্তর হতে ও দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং দেশকে তাদের অধীনস্থ করে।

- ঔপনিবেশিকতা মহাদেশে ফাটল ধরায়। পূর্বের রাজা-বাদশাহদের অপসারণ করে। বিভিন্ন অঞ্চল ও সম্প্রদায়কে বিভিন্ন দেশে ভাগ করার ইচ্ছা করে। দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তারা ফিতনা ও ভাঙনের বীজ বপন করে যায়। এখানে অনেক ভাড়াটে সৈনিক রেখে যায়। তারা ছিল সীমান্তরক্ষী। তারা সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের উসকানি দিত। এটা ছিল আফ্রিকায় দ্বন্দ্ব ও বিবাদের অগ্নি প্রজ্বলিত করার জন্য। যাতে করে আফ্রিকায় অস্ত্রের বিক্রিতে শীর্ষে যেতে পারে।

- ঔপনিবেশিকরা দেশে বর্ণ-বৈষম্যের রাজনীতি প্রয়োগ করে। এতে শ্বেতাঙ্গরা জীবনে সব আনন্দ ও সুখ ভোগ করার সুযোগ পেয়ে যায় আর দেশের প্রকৃত অধিবাসী যারা, তারা এসব থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে। শ্বেতাঙ্গরা জীবনের সর্বোচ্চ আসনে উপনীত হয় এবং তাদের জন্য সর্বোচ্চ পদ ও স্থান নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বিপরীতে কৃষ্ণাঙ্গরা নিম্নমানের জীবনযাপন করতে থাকে এবং বিলাসী জীবন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। চাকচিক্যময় জীবনে প্রবেশ করা তাদের জন্য পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়। দেশের উচ্চপদে সমাসীন হওয়া তাদের জন্য অবৈধ করা হয়।

- ঔপনিবেশিকরা যখন দেখল আফ্রিকায় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তখন তারা সেখানকার কর্মচারীদের হাতে নেতৃত্বের লাগাম ছেড়ে দিলো; যদিও তারা ছিল সংখ্যালঘু। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান থাকতে নেতারা ছিল খ্রিষ্টান। তাদেরকে শক্তিশালী করতে এবং দৃঢ়পদ রাখতে বিশ্বের খ্রিষ্টানরা সহায়তা করত।

- ঔপনিবেশিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও খ্রিষ্টবাদ প্রচারের পক্ষে অবস্থান নেয়। যাতে করে নাগরিকদেরকে এর সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে। তারা উদ্যোগ নেয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মিশনারি হাসপাতাল তৈরি করতে। যাতে করে এটা খ্রিষ্টবাদ প্রচারের প্রধান মাধ্যম হয়। এতসব সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও খ্রিষ্টান মিশনারিদের সফলতা ছিল খুবই কম। এদের সাফল্য অধিকাংশই পৌত্তলিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বিপরীতে অধিকাংশ আফ্রিকানের অন্তরে ঔপনিবেশিকতার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি হয়। অনুরূপ তাদের ধর্ম ও তাদের সাথে সম্পৃক্ত সবকিছুর প্রতিই অনীহা সৃষ্টি হয়। তদুপরি ধর্মগুরু ও পুরোহিতদের মনোনিবেশ সম্পদ অর্জনের প্রতি থাকায় এবং খ্রিষ্টান মিশনারির মিশনে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারই মূল লক্ষ্য হওয়ায় তাদের আবেদন পুরোপুরিই নষ্ট হয়ে যায়।
- ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতা দেশের সভ্যতা ও চিন্তাধারার ওপর বিজয়ী হয়ে যায়। আর আফ্রিকা হয়ে যায় বিশ্বের দরিদ্র ও মূর্খদের মহাদেশ, এখনো পর্যন্ত যাদের সে গ্লানি বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।(২৫)

ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা

আফ্রিকার ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে যখন এর অস্তিত্ব মহাদেশকে কলুষিত করে। এ প্রতিরোধ মহাদেশের নাগরিকদের ওপর ইউরোপীয়দের অত্যাচার ও নিপীড়ন কেবল বৃদ্ধিই করে যায়। তখন মুসলমানদের জন্য ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাটা গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় ছিল। এতে আফ্রিকার অন্যান্য নাগরিকরাও তাদের অনুসরণ করে। যেমন এশিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছিল। এর প্রভাব আফ্রিকায়ও পৌঁছে। তারা আফ্রিকা স্বাধীন করতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রদের পরাজয় আফ্রিকা আন্দোলনে বিরাট প্রভাব ফেলে। আর ঔপনিবেশিকদের প্রভাবও তাদের থেকে দূরীভূত হয়।

আফ্রিকায় ঔপনিবেশিকতার প্রতিরোধে প্রসিদ্ধ আন্দোলন হলো তানজানিয়ায় জার্মানদের দখলের বিরুদ্ধে মুসলিম নেতা বুশিরি বিন

---

২৫. ড. জামাল আবদুল হাদি ও ড. ওয়াফা মুহাম্মাদ আফ্রিকার ইতিহাস বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে তারা আফ্রিকার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ইউরোপিয়ানদের শোষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম *আফ্রিকিয়া ইউরাদু লাহা আন তামুতা জুয়ান*। -সম্পাদক

সালিনের আন্দোলন। যা ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিল। এতে তারা কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দীর্ঘ যুদ্ধের পর জার্মানরা বুশিরিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। এমনইভাবে আফ্রিকার আন্দোলনসমূহের মধ্যে মাহদি সোমালের আন্দোলনও প্রসিদ্ধ, যা সুদানে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের নির্মূল করেছিল।

সোমালিয়ায় তারা এর পুনরাবৃত্তি করতে ইচ্ছা করে। তাদের সাথে প্রথমদিকে খ্রিষ্টান মিশনারিরা যুদ্ধ করে, যারা মানুষকে খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য করত, এরপর ঔপনিবেশিকতার দিকেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। মাহদি আন্দোলনের বিদ্রোহীরা ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। একপর্যায়ে তার বাহিনীর মধ্যে বিশ্বাসঘাতক বের হয়ে আসে, যাদেরকে ইংরেজরা আকর্ষণ করতে ও লোভ দেখাতে পেরেছিল। এতে মাহদির বিদ্রোহ আন্দোলন দুর্বল হয়ে যায় এবং সৈনিকরা বিপর্যস্ত হওয়ার পর মাহদি ইনতেকাল করে।

ঔপনিবেশিকতা দমনে অসংখ্য আন্দোলন সংগঠিত হয়। কঠিন প্রতিরোধ ঔপনিবেশিকদেরকে আফ্রিকা থেকে চলে যেতে বাধ্য করে। এরপর সেখানকার কোনো কোনো দ্বীপ ও ছোট ছোট অঞ্চলেই কেবল কিছু ঔপনিবেশিকতা বাকি থেকে যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আফ্রিকায় স্বাধীন রাষ্ট্র

এখানে আমরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলোর কথা আলোচনা করব। চাই তাতে ইসলামি শাসনব্যবস্থা থাকুক কিংবা খ্রিষ্টান ঔপনিবেশিকদের কর্তৃত্ব থাকুক। এ ছাড়াও মহাদেশের বাকি দেশগুলোতে মুসলমানদের পরিসংখ্যান নিয়েও আলোচনা করব।

এক. মুসলমান শাসিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহ

মৌরিতানিয়া

এটি একটি আরব দেশ, যার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। মৌরিতানিয়া অর্থ মুসলিমদের দেশ; যেমনটি ইউরোপ ও স্পেন এর নাম দিয়েছে। এটা ফরাসি শাসনের অধীনে ছিল। অবশেষে ১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) এটা স্বাধীন হয়। আর সেই স্বাধীন মৌরিতানিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট হন মুখতার। স্পেন থেকে স্বাধীন হওয়ার পর মরক্কো, মৌরিতানিয়া ও আলজেরিয়ার মাঝে পশ্চিম সাহারা নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। অতঃপর ১৩৯৮ হিজরিতে (১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) এ দেশে সিপাহি বিপ্লব ঘটে এবং মুহাম্মাদ সালিকের পুত্র মোস্তফাকে প্রজাতন্ত্রের প্রধান নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর ১৩৯৯ হিজরিতে (১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) তাকে মৌরিতানিয়ার এমিরেট প্রেসিডেন্ট নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল আহমাদ বুশিফের হাতে। সে ওই বছরই বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়। সে মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান নিযুক্ত হয় মুহাম্মাদ খোনা। সে দেশ রক্ষার জন্য সেনা কমিশন গঠন করে। সে মন্ত্রীদের নেতৃত্বে সৈয়দ আহমাদ তায়ির সন্তান মুআবিয়ার সাথে চুক্তি করে। কিছুদিন যেতে না যেতেই সে চুক্তি ভঙ্গ করে। অতঃপর মুআবিয়া ১৪০৫ হিজরিতে (১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) সেনা বিদ্রোহ ঘটিয়ে

মুহাম্মাদ খোনাকে পদচ্যুত করে। এরপর মুআবিয়া প্রজাতন্ত্র, সেনাবাহিনী ও প্রশাসন তিনটিরই প্রধান হয়।

মৌরিতানিয়ায় আফ্রিকান স্বাধীনতাকামীদের সেনাবিদ্রোহ ঘটে, যেখানে ইহুদি ও খ্রিষ্টান মিশনারি সহায়তা করেছিল। ফলে তারা ১৪০৮ হিজরিতে (১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে) সেনা অভ্যুত্থানের চেষ্টা চালায়। এর কারণ বলা হয় যে, প্রশাসনে আরবরা হস্তক্ষেপ করছে এবং নিগ্রোরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারছে না। কিন্তু এ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়।

অতঃপর ১৪০৯ হিজরিতে (১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) মৌরিতানিয়া ও সেনেগালের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে সেনেগালে বসবাসরত মৌরিতানিয়ানদের ওপর কয়েকবার হামলা হয়। এর ধারাবাহিকতায় মৌরিতানিয়ায় বসবাসরত সেনেগালিদের ওপরও কয়েকবার হামলা হয়। অবশেষে উভয় দেশের প্রবাসীদের রদবদলের মাধ্যমে এ সংকটের অবসান ঘটে।

সুদান

সুদান মিশর ও ইংরেজদের দ্বিপাক্ষিক শাসনের অধীনে ছিল। অতঃপর ২৩ জুলাই বিদ্রোহ সংঘটিত হলে সুদানবাসীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ইংরেজদের সাথে অনেক সংলাপ হয়। এসব আলোচনায় সুদানবাসীদেরকে দুটি সুযোগ দেওয়া হয়; হয়তো তারা মিশরের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকবে কিংবা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা গ্রহণ করবে। সুদান মিশর থেকে স্বাধীন হওয়াকে গ্রহণ করে এবং ইসমাইল আজহারির নেতৃত্বে ১৩৭৫ হিজরিতে (১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) প্রজাতান্ত্রিক দেশ ঘোষণা করে। আর ওই বছরই তারা আরবলিগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

যুগপৎ সেনা বিপ্লবে সুদানের ইতিহাস ভরপুর। তন্মধ্যে ১৩৭৭ হিজরির (১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের) বিপ্লব অন্যতম; যদিও সেটা ব্যর্থ হয়। অতঃপর সেই বছরই ইবরাহিম আবুদের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটে। এতে তারা বিজয়ী হয়। অতঃপর ১৩৭৮ হিজরিতে (১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে) আরও তিনটি সেনা বিপ্লব হয়। তন্মধ্যে প্রথমটিতে সফল এবং বাকি দুটিতে বিফল হয়। অতঃপর ১৩৮৪ হিজরিতে (১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) আরেকটি বিদ্রোহ হয়। এতে ইসমাইল আজহারির নেতৃত্বে ক্ষমতা পরিচালনার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়। তারপর সেই বছরই আরেকটি আন্দোলন হয়

এবং এতে তারা পর্যুদস্ত হয়। তারপর ১৩৮৯ হিজরিতে (১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) জাফর নুমাইরির নেতৃত্বে আরেকটি বিপ্লব হয় এবং ১৩৯১ হিজরিতে (১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে) অন্য আরেকটি বিপ্লব হয়, এতেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনইভাবে ১৩৯৫ হিজরির (১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের) আন্দোলনেও বিপর্যয় ঘটে। তারপর ১৩৯৬ হিজরিতে (১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) জাফর নুমাইরিকে পদচ্যুত করার জন্য শক্তিশালী হামলা করা হয়। এতে বহির্বিশ্ব থেকে সুদানিদের অস্ত্রের জোগান দেওয়া হয়। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে সেনা বিদ্রোহ ঘটানো হয়। সেখানে বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী নুমাইরির বিমান ধ্বংসের জন্য একটি পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়। মিশর নুমাইরিকে এই মর্মে সহায়তা করে যে, ইথিওপিয়ার ইহুদিদেরকে সে ইসরাইলে স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ সহায়তা করবে এবং এ চুক্তি দীর্ঘকাল বলবৎ থাকবে।

সুদানে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শক্তিশালী অবস্থান ছিল। প্রশাসনিক সেক্টরে তাদের খুব প্রভাব ছিল। ১৪০৩ হিজরিতে (১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে) সুদানে ইসলামি শরিয়ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের বিশাল ভূমিকা ছিল। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে জাফর নুমাইরি শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফলে ১৪০৫ হিজরিতে (১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) তাদেরকে নির্মূল করার জন্য সে চক্রান্ত করে তাদের ওপর বিভিন্ন অপবাদ দিতে থাকে। তাদের অনেককে সে কবজা করে নেয়। কিন্তু এ নির্মূলীকরণ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৪০৫ হিজরিতে (১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) নতুন আরেকটি সেনা বিপ্লব ঘটে যায়। এ বিপ্লবের সূচনা করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী আবদুর রহমান সাওয়ার সাহাব। সে রাষ্ট্রপ্রধান হয় এবং ১৪০৬ হিজরিতে (১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) সাদেক মাহদিকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। জাফর নুমাইরিকে পুনরায় নিযুক্ত করার জন্য অনেক আন্দোলন হয়, কিন্তু আন্দোলন সফল হয়নি।

অবশেষে ১৪০৯ হিজরিতে (১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) উমর বশিরের নেতৃত্বে একটি সফল সেনা বিপ্লব হয়। ফলে সে সুদানের প্রধান নিযুক্ত হয়ে এখন পর্যন্ত সেই পদে বহাল রয়েছে। তার যুগে মিশর ও সুদানের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বিষয়টি প্রকাশ পায় হাকাইব ও শালাতিনের ক্ষেত্রে। সুদানিরা মনে করল, এটা সুদানের অংশ; অথচ এতে মিশর শাসন করছে। সুদানকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিশেষ করে আদ্দিস আবাবায় মিশরের প্রেসিডেন্ট হুসনি মোবারকের ওপর আত্মঘাতী

ব্যর্থ হামলার পরিকল্পনাকারীদের সুদানে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ ওঠার পর। এতে অনেক বহিরাগত শক্তি বিশাল বাহিনী নিয়ে বিরোধীপক্ষের সহযোগিতার জন্য সুদানে অনুপ্রবেশ করে। সুদানে সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে, যে আগুন প্রজ্বলিত করেছে ধূর্ত ক্রুসেডাররা।

দক্ষিণাঞ্চলীয় সংকট

সুদানে ইংরেজ দখলদারি কার্যকলাপের পর তারা সেখানে দক্ষিণাঞ্চলীয় সংকটের বীজ বপন করে। তারা দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলকে পৃথক করার প্রচেষ্টা চালায়। উত্তরাঞ্চলে মুসলিমদের, আর দক্ষিণাঞ্চলে মূর্তিপূজারিদের বসবাস ছিল। তারা দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম প্রচার নিষিদ্ধকরণের জন্য কাজ করে। আর সেটাকে ক্রুসেডাররা তাদের মিশন বাস্তবায়নের উর্বর ভূমি হিসেবে ধার্য করে। তাদের যে সমস্ত সহায়তা দক্ষিণ সুদানবাসীদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল, তন্মধ্যে খ্রিষ্টান মিশনারির অধীনে হাসপাতাল নির্মাণ, দক্ষিণ সুদানে শিক্ষাবোর্ড স্থাপন ইত্যাদি ছিল অন্যতম। ইংরেজরা দক্ষিণ সুদানকে একচেটিয়া দেশ নির্ধারণ করে। উত্তরাঞ্চলীয়দেরকে সেখানে প্রবেশ করতে বারণ করে। এমনকি দক্ষিণ সুদান থেকে অনেক মুসলিম অন্যান্য দেশে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। এতটুকুতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি; উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধ বাধানোর জন্য চেষ্টা করে। দক্ষিণ সুদানকে সুদানের মূল ভূখণ্ড থেকে পৃথক করার ক্ষেত্রে তারা শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ছোট ছোট আক্রমণ চলতে থাকে, বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পর কুৎসা রটাতে থাকে। যেমন উত্তরাঞ্চলীয়দের দাস ব্যবসার ক্ষেত্রে দক্ষিণাঞ্চলীয়দের থেকে অধিক সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রে।

সুদান স্বাধীন হওয়ার পর উত্তর ও দক্ষিণ সুদানের মধ্যকার সংঘাত শুরু হয়ে যায়। দক্ষিণ সুদানে কয়েকটি সেনা সংগঠন গঠিত হয়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো আনইয়ানয়া সংগঠন, যাদেরকে ইহুদি, আন্তর্জাতিক গির্জা পরিষদ ও খ্রিষ্টান মিশনারিরা সহায়তা করত। এমনইভাবে খ্রিষ্টান দেশ এবং খ্রিষ্টান শাসিত পার্শ্ববর্তী দেশ, যেমন ইথিওপিয়া, উগান্ডা, মধ্য আফ্রিকা, চাদ ইত্যাদি দেশসমূহ তাদেরকে সহায়তা করত। অতঃপর যারা দক্ষিণ সুদানিদের নিপীড়ন ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্রথমদিকে তাদের অনুসরণ করেছিল তাদের ও সেখানকার প্রশাসনের মধ্যে সংঘাত হতে থাকে, যা দক্ষিণাঞ্চলীয়দের ক্ষেত্রে তাদের মনোভাব কঠোর করে তোলে।

অবশেষে জাফর নুমাইরির যুগ আসে। ফলে ১৩৯২ হিজরিতে (১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে) আদ্দিস আবাবা চুক্তি হয়। সেটা দক্ষিণ ও উত্তর সুদানেকে একীভূত করে। কিন্তু দক্ষিণ সুদানবাসীদের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকায় যেকোনো সময় তাদের পুনরায় বিদ্রোহী হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছিল। যেমন: দক্ষিণ সুদানের নিরাপত্তা বাহিনী এককভাবে তাদের অঞ্চল থেকেই গঠিত হবে, কিন্তু উত্তর সুদানের নিরাপত্তা বাহিনীর গঠিত হবে উভয় পক্ষের অর্ধেক-অর্ধেক সৈন্য দ্বারা, এতে উত্তরাঞ্চলে খ্রিষ্টান মিশনারির কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ হয়ে যায়। এই চুক্তির ফলে পার্শ্ববর্তী দেশের মুসলমানের ওপর মন্দ প্রভাব পড়ে। তাই সুদান ইথিওপিয়া থেকে স্বাধীনতার জন্য ইরিত্রিয়াকে সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়। এমনইভাবে চাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম যারা চাদ-প্রশাসনের পতন চেয়েছিল, তাদেরও সহায়তা করা বন্ধ করে দেয়। দেশে ক্রুসেডার সংখ্যালঘুদের মধ্যস্থতায় তারাও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

১৪০০ হিজরিতে (১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে) যখন প্রশাসন দেশটিকে তিনটি ভূখণ্ডে বিভক্ত করতে চায় তখন দক্ষিণ সুদানে পুনরায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কারণ, দক্ষিণ সুদানের দিনকা নামক বেশ বড় গোত্রের জন্য কোনোরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রাখা হয়নি। অতঃপর ১৪০৩ হিজরিতে (১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে) সুদানবাসীরা ইসলামি শরিয়তের প্রয়োগ করায় দেশে উত্তেজনা পুনরায় বৃদ্ধি পায়। জন কারনাক নামে এক ব্যক্তি বিদ্রোহ করে। সে ছিল সামরিক অফিসার। সে মূলত দক্ষিণ সুদানের বাসিন্দা ছিল। তারপর সুদানি সৈনিক থেকে সে একদল সৈনিক নিয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং দক্ষিণ সুদানে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালায়। যখন দক্ষিণ সুদানে স্বাধীনতার আশঙ্কা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন উত্তর সুদানকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখা যায়। আর বিশ্ব-ক্রুসেডার সে সময় সুদানের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে শক্তির জোগান দেয়। এর সাথে ছিল ইহুদিদের সহযোগিতা।

সুদানের সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সাথে বিরোধীদের ঐক্যের পর কঠিন সময় পার করে। আর দারফুরের অবস্থা কঠিন হয়ে স্থায়ী যুদ্ধের অবস্থা তৈরি হয়। এদিকে আজওয়ায় আঞ্চলিক নেতাদের মাঝে চলে দীর্ঘ যুদ্ধ। দারফুরের সংকট প্রকাশ পাওয়ার পর সুদানের শাসন মেনে নিতে ও উত্তর-দক্ষিণ সুদানের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের শর্তে তাদের সহায়তা বন্ধ

করতে আন্তর্জাতিক মহল থেকে নির্দেশ ও চাপ সৃষ্টি করা হয়, যারা ইতিপূর্বে দক্ষিণ সুদানকে বিভিন্ন প্রকার উপকরণ ও অধিকার দিয়ে সাহায্য করত। সংবিধানের সংশোধন সম্পন্ন হয় এবং ২০০৫ সালে জন কারনাককে সুদানের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নিযুক্ত করা হয়। আর সে দেশের অভ্যন্তরে লাগাতার যুদ্ধবিগ্রহ চলাসহ বিভিন্ন কারণ ও লক্ষণ ইঙ্গিত করছে যে, শীঘ্রই সুদান বিভক্ত হয়ে যাবে।

সোমালিয়া

সোমালিয়ার আয়তক্ষেত্র তার বর্তমান আয়তক্ষেত্রের দ্বিগুণ ছিল। খ্রিষ্টান ঔপনিবেশিকরা সেটাকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে দেয়। ফলে ইংল্যান্ড একটি অংশ গ্রহণ করে, যা ইংরেজ-সোমালিয়া নামে প্রসিদ্ধ। এক অংশ দখল করে নেয় ইতালি, যা ইতালিয়ান-সোমালিয়া নামে পরিচিত। ইথিওপিয়াকেও সোমালিয়ার এক অংশ দেওয়া হয়। সেটা হলো ইকলিম অথবা গাদিন। কেনিয়াকে দেওয়া হয় এক অংশ। ফ্রান্সও একটি অংশ দখল করে, যা ফরাসি সোমালিয়া নামে পরিচিত।

ইংরেজ ও ইতালিয়ান সোমালিয়া ব্যতীত সোমালিয়ার অন্যান্য বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে পরে আর কেউই এক করতে পারেনি। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড সোমালিয়ার আরেকটি অংশ ইথিওপিয়াকে দান করে দেয়। আর ফ্রান্সের দখলীকৃত সোমালিয়া স্বাধীন একটি দেশ হয়ে যায়, যা বর্তমানে জিবুতি নামে পরিচিত। ইথিওপিয়া ও কেনিয়া সোমালিয়ার যে অংশ দখল করেছিল, তা আজও তাদের দখলে রয়েছে।

১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) ইংরেজ ও ইতালিয়ান সোমালীয়রা স্বাধীনতা অর্জন করার পর তাদের লক্ষ্য অর্জনে সোমালিয়া ঐক্য গঠন করে। তারা উভয়ে সোমালি প্রজাতন্ত্র হিসেবে গঠিত হয়। তারা ইথিওপিয়া ও কেনিয়ায় তাদের হারিয়ে যাওয়া ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের জন্য কাজ করার ঘোষণা দেয়। ফলে ইথিওপিয়া-কেনিয়া ও সোমালিয়ার মধ্যকার সম্পর্কে বিপর্যয় ঘটে এবং অবশেষে যুদ্ধ হয়। সোমালীয় প্রেসিডেন্ট আবদুর রশিদ আলি শেরমার্কের শাসনামলে প্রথম যুদ্ধ হয়। ১৩৮৪ হিজরিতে (১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) ইথিওপীয় ও সোমালীয়দের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অতঃপর ১৩৮৯ হিজরিতে (১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) সোমালীয় নেতা পরাজিত হয় এবং মুহাম্মাদ সিয়াদ বারি দেশের ক্ষমতা দখল করে। সে রাশিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করে। সে দেশে সমাজতন্ত্র চর্চার ঘোষণা

দেয়। আর সোমালিয়া আরব জোটের অংশ হওয়া সত্ত্বেও আরবি ভাষাকে বিলুপ্ত করার ঘোষণা দেয়।

১৩৯৮ হিজরিতে (১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এবার সোমালীয়রা ইথিওপিয়ায় অবস্থানরত পশ্চিম সোমালীয়দের স্বাধীনতা জোটের পক্ষে সহায়তা করে। সোমালিয়া থেকে অনেক সৈনিক ইথিওপিয়ায় প্রবেশ করে। এ আক্রমণ রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদের কারণ হয়, যারা ইথিওপীয়দের সহায়তা করেছিল। সোমালীয়রাও ইথিওপিয়া থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। এমনকি ১৪০৬ হিজরিতে (১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) উভয় দেশের মধ্যকার শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এতৎসত্ত্বেও ইথিওপিয়া সোমালিয়ার বিদ্রোহীদের সহায়তা করে এবং তাদের সৈন্যরা সোমালিয়ায় অনুপ্রবেশ করে। ১৪০৪ হিজরিতে (১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে) কেনিয়ার সাথে সোমালিয়ার উষ্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। তবে কেনিয়া ১৪১০ হিজরিতে (১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে) সোমালিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে, সোমালীয়রা বিরোধীদেরকে ধাওয়া করে কেনিয়ার সীমান্তে প্রবেশ করেছে।

ইথিওপিয়া সোমালিয়ার বিরোধীদের সাহায্য ও সহযোগিতা করায় সোমালিয়া ও ইথিওপিয়ার মধ্যে আবারও সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এরপর সোমালিয়া ইথিওপিয়ার সমর্থিত বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মাকদিসুতে একটি সেনাচৌকি নির্মাণ করে। এতে ইথিওপিয়াও সোমালিয়া-বিরোধীদের সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। সোমালীয় প্রসাশন ও বিদ্রোহী সৈনিকদের মধ্যে অনেক সংঘাত হতে থাকে। আর এতে বিদ্রোহী শক্তিগুলো প্রশাসনের ওপর বিরাট বিজয় অর্জন করে।

মুহাম্মাদ সিয়াদ বারি দেশ থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। ১৪১১ হিজরিতে (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে) বিদ্রোহীরা মুহাম্মাদ ফারাহ ইদিদের নেতৃত্বে মোগাদিসুতে প্রবেশ করে। আর আলি মাহদিকে সাময়িকভাবে প্রজাতন্ত্রী প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয় দেশের পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য। তারপর বিদ্রোহী সৈনিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, যাদেরকে সোমালিয়ার বিভিন্ন গোত্র থেকে এনে গঠন করা হয়েছিল। ফলে তাদের মধ্যে সংঘাত এবং বিভক্তির লড়াই শুরু হয়ে যায়। তারপর উত্তর সোমালিয়ায় স্বাধীন প্রজাতন্ত্র দেশ ঘোষণা করা হয়। এদিকে মুহাম্মাদ সিয়াদ বারির অধীনে

দক্ষিণ সোমালিয়ায় সমাজতান্ত্রিক দল নেতৃত্ব দিতে থাকে। আবার ওদিকে মোগাদিসুতে মুহাম্মাদ ফারাহ ইদিদ ও আলি মাহদির মধ্যেও কঠিন সংঘাত শুরু হয়।

চলমান গৃহযুদ্ধে হাজার হাজার সোমালীয় নিহত হয়। বিভক্তির যুদ্ধে সন্ধিচুক্তির অসংখ্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। যুক্তরাষ্ট্র এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সোমালিয়ায় তাদের সৈনিক প্রবেশ করানোর চেষ্টা চালায়। এর পর পরই সোমালিয়ায় তার সৈনিক প্রেরণ করে। সাথে সাথে বিভিন্ন দেশের সৈনিকরাও অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এ সৈনিকরা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি। তাদের অনেকেই নিহত হয়। অবশেষে সোমালিয়া পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

সোমালিয়ার চলমান যুদ্ধে মুহাম্মাদ ফারাহ ইদিদ সোমালিয়ায় নিহত হয়। তার ছেলে ক্ষমতা গ্রহণ করতে আসে। সে ১৪১৮ হিজরিতে (১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) সোমালিয়ার বিভিন্ন দলের সাথে কায়রোতে ঐক্যচুক্তি করে। যুদ্ধ ও দরিদ্রতায় হাজার হাজার প্রাণ ঝরার পর অবস্থা শান্ত হয়। আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন সোমালিয়ার পরিস্থিতি পরিপূর্ণ শান্ত রাখেন এবং রক্তপাত বন্ধ করেন।

জিবুতি

জিবুতি ছিল ফরাসি ঔপনিবিশকতার অধীনে, যাকে ফরাসি-সোমালিয়া বলা হতো। তারপর সেটাকে ইফার ও ইসা বলা হয়। এগুলো মূলত দুটি গোত্রের নাম, যারা জিবুতির স্থায়ী বাসিন্দা। ১৩৯৭ হিজরিতে (১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) জিবুতি ফ্রান্স থেকে স্বাধীন হয়। হাসান জুলিদের নিকট তারা নেতৃত্ব সমর্পণ করে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে নিরপেক্ষ রাজনীতি পলিসি অবলম্বন করে। এ দেশটি আরবলিগের সদস্য।

কমোরোস (দ্বীপরাষ্ট্র)

এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বসবাস করত। এখানে ইসলাম প্রবেশ করে দাওয়াতের মাধ্যমে। আরব ও পারস্যের বিভিন্ন দলের হিজরতের মাধ্যমে। কমোরোস উপদ্বীপ ফরাসিদের দখলে ছিল। তাদের এ জবরদখল চলতেই থাকে। অবশেষে ১৩৯৫ হিজরিতে (১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) এটা স্বাধীনতা লাভ করে। মাইয়ুত দ্বীপ ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলকে ফ্রান্স স্বাধীনতা দেয়। কারণ, এখানে ফ্রান্স প্রবাসীদের বড় একটি অংশ আবদ্ধ

ছিল। আর আফ্রিকার অন্যান্য দেশ থেকে কমোরোস উপদ্বীপ যে বিষয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রাখে, তা হলো, এখানে বিশালাকারে ইউরোপীয় ভাড়াটে সৈনিকদের অবস্থান। তারা তাদের আবাসিক এলাকায় রাষ্ট্রের আইনকানুন পরিবর্তনের জন্য এই দ্বীপে কয়েকবার আক্রমণ চালায়।

কমোরোস উপদ্বীপ স্বাধীন হওয়ার পর এখানকার প্রথম নেতা হয় আহমাদ আবদুল্লাহ। তার নেতৃত্ব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অতঃপর ওই বছরই আলি সোয়াইলির নেতৃত্বে বিপ্লব হয়। এতে আহমাদ আবদুল্লাহকে উৎখাত করে সাইদ মুহাম্মাদ জাফরকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সমর্পণ করা হয়। অতঃপর ১৩৯৬ হিজরিতে (১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) আলি মুহাম্মাদ সোয়াইলি সাইদ মুহাম্মাদ জাফরকে পরাজিত করে তার স্থানে নিযুক্ত হয়। তারপর ইউরোপীয় ভাড়াটে সৈনিকরা খেলা শুরু করে। তারা বুব দিনারের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করে প্রেসিডেন্ট আলি সোয়াইলিকে হত্যা করে আহমাদ আবদুল্লাহকে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে। এটা হয়েছিল ১৩৯৮ হিজরিতে (১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে)। এখানে অধিক পরিমাণে ইউরোপীয় ভাড়াটে সৈনিক থাকার কারণে আফ্রিকায় ঐক্য সংগঠন থেকে কমোরোস উপদ্বীপের সদস্যপদ বাতিল করা হয়।

ইউরোপীয় ভাড়াটে সৈনিকদের তৎপরতায় কমোরোসে আন্দোলন চলতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা পরাজিত হয়। অতঃপর ১৪১০ হিজরিতে (১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে) কমোরোস প্রেসিডেন্ট আহমাদ আবদুল্লাহ গুপ্তহত্যার শিকার হলে বুব দিনার রাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য সাময়িক ক্ষমতা গ্রহণ করে অতঃপর সাইদ মুহাম্মাদ জাওহারকে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে । বুব দিনার ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য কৌশল অবলম্বন করে। তখন ফরাসিরা এটাকে সুযোগ মনে করে পরিস্থিতি শান্ত করার যুক্তি দিয়ে কমোরোসে প্রবেশ করে। এতে বুব দিনার একদল ভাড়াটে সৈনিক নিয়ে কমোরোসের বাইরে পালিয়ে যায়।

এরপর প্রেসিডেন্ট সাইদ মুহাম্মাদ জাওহার ঘোষণা করে যে, সে কমোরোসের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রশিক্ষণ মজবুত করার জন্য ফরাসি সৈনিকদের সেখানে থাকার অনুমতি দেবে। অথচ কমোরোস উপদ্বীপ আরবলিগের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। কিন্তু আরবলিগ তাদের অন্তর্ভুক্তি ১৪১৭ হিজরির (১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) পূর্বে গ্রহণ করেনি। বর্তমানে কমোরোস উপদ্বীপ তাদের ইতিহাসে অনেকবার বিভক্ত ও স্বাধীন দেশ হওয়ার চেষ্টার

পর নতুন আরেকটি কঠিন সময় পার করছে। এখানে সমস্ত আন্দোলনের ইউরোপীয় ভাড়াটে সৈনিকরা অংশ নিয়েছিল। তাদেরমধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল ফ্রান্সের ভাড়াটে সৈনিকরা। তারা ১৪১৮ হিজরির (১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের) আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

চাদ

এটা আফ্রিকার অন্তর্গত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ। দেশটি ফ্রান্সের দখলের ছিল। অবশেষে দেশে খ্রিষ্টানরা ক্ষমতার লাগাম সমর্পণ করার পর ১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) স্বাধীনতা লাভ করে। প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হয় ফরানসু তিম্বাল বায়ি। সে ছিল খ্রিষ্টান। দেশে খ্রিষ্টানদের পরিসংখ্যান ৫%-এর বেশি না হওয়া সত্ত্বেও চাদ প্রশাসন গঠন করা হয় এভাবে যে, মুসলমানরা অর্ধেক এবং খ্রিষ্টান ও মূর্তিপূজারিরা অর্ধেক। অথচ মুসলমানদের সংখ্যা হচ্ছে ৮৫%, মূর্তিপূজারিদের সংখ্যা ১০% এবং খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ৫%। এতে মুসলমানদের অধিকার খর্ব করা হয়। আর ফরাসি সেনাশক্তি দেশে খ্রিষ্টীয় শাসনের পৃষ্ঠপোষকতা করে। এটা এ কারণে হয়েছিল যে, চাদে ফরাসি সামরিক ঘাঁটি থাকার ব্যাপারে খ্রিষ্টানরা চুক্তিবদ্ধ হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় দেশের পরিস্থিতি শান্ত ছিল। অতঃপর খ্রিষ্টানদের বিদ্বেষ শুরু হয়। তাদের অল্পে তুষ্টি বিলীন হয়ে আসল রূপ প্রকাশ পায়। এটা তখন হয়, যখন ইহুদি রাষ্ট্রদূত চাদের প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং ১৩৮১ হিজরিতে (১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে) তারা তাকে অভ্যর্থনা জানায়। এতে মুসলমানদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। এর কারণ হলো ইহুদিরাই একমাত্র মুসলমানদের শত্রু এবং অতীত ইতিহাসে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর তাদের শত্রুতা সবসময় অব্যাহত ছিল। ফলে মন্ত্রী ও মুসলিম রাজনীতিবিদগণ ইসরাইলি রাষ্ট্রদূতকে দেশে আমন্ত্রণ জানাতে বিরোধিতা করে। তারা নেতাকে জানিয়ে দেয় যে, তাদের মতের যেন বিরোধিতা না করা হয়।

এদিকে ইসরাইলি রাষ্ট্রদূত মুসলমানদের শাসানোর অঙ্গীকার করে। বাস্তবেও চাদের প্রেসিডেন্ট মন্ত্রীদের মধ্যে পরিবর্তন করে মুসলমান মন্ত্রীদের বহিষ্কার করতে শুরু করে। তাদের স্থানে অমুসলিমদের নিযুক্ত করে। মুসলিম মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদদের বন্দি করে। কিছু নেতা ও মন্ত্রীকে দেশান্তর করে। ফলে দেশবাসী তাদের গভীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। অবশেষে ১৩৮৫ হিজরিতে (১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে) তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে।

চাদ লিবারেশন জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করে সুদানে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। ১৩৮৭ হিজরিতে (১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) বিদ্রোহের আগুন আরও প্রজ্বলিত হয়। এবার তারা চাদ লিবারেশন জাতীয় ফ্রন্টের নেতৃত্বে দেশের উত্তরাঞ্চলে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এদিকে ফরাসিরা চাদ নেতাকে আন্দোলনে প্রকাশ্যে সহায়তা করে। অপরদিকে লিবিয়া বিদ্রোহীদের সহায়তা করে। চাদ লিবারেশন জাতীয় ফ্রন্ট দপ্তর আলজেরিয়াতে স্থানান্তর করা হয়।

১৩৯১ হিজরিতে (১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে) আহমাদ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে আন্দোলন ব্যর্থ হয়। আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে সে নিজেই আত্মহত্যা করে। চাদ অভিযোগ করল যে, এ আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করছে লিবিয়া। এরপর লিবিয়া চাদের বিপ্লবে জোরালো ভূমিকা রাখে এবং বিদ্রোহীদের সহায়তা করার জন্য ১৩৯৩ হিজরিতে (১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) তারা চাদের আওজু সেক্টর দখল করে। ১৩৯৫ সালে (১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) খ্রিষ্টান স্টাফ প্রধান আবদুল কাদির কামুগার নেতৃত্বে সেনাবিপ্লব ঘটে। এতে চাদের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কোইস টম্বালবয়ে নিহত হয়। খ্রিষ্টান ফেলিক্স মালুমকে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্ধারণ করা হয়।

জাতীয় স্বার্থে খার্তুমে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারা ফেলিক্স মালুমকে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট এবং হুসাইন হাবরিকে প্রধানমন্ত্রী স্বীকৃতি দিয়ে ফয়সালা করে। কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। চাদ লিবারেশন জাতীয় ফ্রন্ট গোকুনি ওয়েদির নেতৃত্বে চাদের বিশাল অংশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। যাকে লিবিয়া সহায়তা করেছিল। এটা হয়েছিল ১৩৯৮ হিজরিতে (১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে)। এরপর চাদে প্রশাসন পূর্ণরূপে ধসে পড়ে। হুসাইন হাবরি বাহিনী রাজধানী এনজামেনা প্রবেশ করে। ফেলিক্স মালুম দেশের বাইরে পালিয়ে যায়। তদ্রুপ গোকুনি ওয়েদি রাজধানী এনজামেনাতে প্রবেশ করে। তারপর হুসাইন হাবরি ও গোকুনি ওয়েদির মধ্যে সংলাপ হয়। দেশ শান্ত করার জন্য কয়েক দফা প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু অল্প কিছু সময় ছাড়া এ ঐক্য কার্যকর হয়নি। তারপর পুনরায় দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ১৪০০ হিজরিতে

(১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে) ফ্রান্স চাদ থেকে নিজেদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার পর যুদ্ধের অগ্নি আরও প্রজ্বলিত করার জন্য।

১৪০০ হিজরিতে (১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে) লিবিয়া গোকুনি সরকারের সাথে একটি মিত্রতার চুক্তি করে। গোকুনি ওয়েদি ও হুসাইন হাবরির মধ্যকার চলমান যুদ্ধে লিবিয়ার সৈনিকরা প্রকাশ্যে অংশ নেয়। গোকুনি ওয়েদি বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং হুসাইন হাবরি সুদান সীমান্তে চলে যায়। লিবিয়ার সাথে তাদের বিরোধ থাকার কারণে মিশর ও সুদান হুসাইন হাবরিকে সহায়তা করে। চাদ ও লিবিয়ার মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু গোকুনি তা প্রত্যাখ্যান করে এবং লিবিয়াকে চাদ ছাড়ার দাবি জানায়। লিবিয়া তার দাবিকে স্বাগত জানায় এবং ১৪০২ হিজরিতে (১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে) নিজেদের সৈনিক প্রত্যাহার করে।

লিবিয়ার প্রত্যাহারে হুসাইন হাবরি লাভবান হয় এবং ওই বছরই রাজধানী এনজামেনা প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। নিজের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে এবং প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়। আর গোকুনি দেশ থেকে পলায়ন করে। লিবিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের উত্তরাঞ্চলে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। তখন দক্ষিণাঞ্চল শাসন করছিল আবদুল কাদির কানমের অনুগত সৈনিকরা। সে সময় গৃহযুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত হতে থাকে এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে শরণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ফ্রান্স হুসাইন হাবরিকে সহায়তা করে যখন লিবিয়া গোকুনি ওয়েদিকে সহায়তা করে। খ্রিষ্টদেশগুলো আফ্রিকায় একে অপরকে সাহায্য করে। আর বিশ্বের খ্রিষ্টানরা আবদুল কাদির কানমের সঙ্গ দেয়। যুদ্ধে বিশ্বের অস্ত্র-ব্যবসায়ীরা প্রচুর অর্থসম্পদ অর্জনের মাধ্যমে ফায়েদা ভোগ করে। চাদের অভ্যন্তরে ফরাসি ও লিবিয়ানদের মধ্যে অনেক সংঘাত হয়। অতঃপর লিবিয়ার সৈনিকরা দুর্বল হতে থাকে। অধিকাংশ অঞ্চল গোকুনির নিকট হস্তান্তর করে। চাদের হুসাইন হাবরির অনুগত সৈনিকরা লিবিয়ার সৈনিকদের থেকে আউজু শহর উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। অনেক লিবীয় সৈনিক বন্দি হয়। কিন্তু লিবিয়া তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। লিবিয়া ও চাদের মধ্যকার যুদ্ধ থাকার কারণে জাতিসংঘ আউজুতে ক্ষমতা প্রয়োগ প্রত্যাখ্যান করে। এ বিষয়টি আফ্রিকার ঐক্যফ্রন্টের নিকট ছেড়ে দেয়। চাদের পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। চাদের চিফ অব স্টাফ ইদরিস দিবি ও

মুসতাশার হুসাইন হাবরি বিদ্রোহ করে। ওই সময় হুসাইন হাবরি লিবীয় বন্দিদের থেকে সুবিধা ভোগ করতে কাজ করে। লিবিয়া লিবারেশন জাতীয় ফ্রন্ট তথা বিরোধীদের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য। যাতে লিবিয়া নিষ্কৃতি পায়। যার নেতৃত্বে ছিল মুহাম্মাদ মুকরিফ।

ইদরিস দিবি প্রথমে সুদান তারপর লিবিয়ায় পলায়ন করে মুয়াম্মার গাদ্দাফির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সে তাকে হুসাইন হাবরির বিরুদ্ধে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারপর হুসাইন হাবরি ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। দেশের পূর্বাঞ্চলে জাতীয় ফ্রন্ট নেতা ইদরিস দিবির সাথে হুসাইন হাবরির যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু ইদরিস দিবির কাছে সে পরাজয় বরণ করে। ইদরিস দিবি রাজধানী এনজামেনায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। হুসাইন হাবরি দেশের বাইরে পালিয়ে যায়।

এদিকে গোকুনি ওয়েদি নতুন প্রশাসনের সামনে নতি স্বীকার করে নিয়ে লিবীয় বন্দিদের মুক্তি দেয়। দেশে শান্তি ফিরে আসতে শুরু করে। কিন্তু এরপর আবারও বিদ্রোহ শুরু হয় এবং ১৪১২ হিজরিতে (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে) নতুন করে দুটি বিপ্লব সংঘটিত হতে বসে। তবে উভয়টি অকৃতকার্য হয়। দক্ষিণাঞ্চলীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তারা দাবি করে যে, সৈনিকরা তাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। অনুরূপ উত্তরাঞ্চলে কিছু বিদ্রোহ দেখা দেয়, হুসাইন হাবরির অনুগতদের পরিচালনায়।

নাইজার

১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) নাইজার ফ্রান্স থেকে স্বাধীন হয়। হামানি দেওয়ারি দেশের প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হয়। সে দশ বছরেরও বেশি সময় এ পদে বহাল থাকে। অতঃপর তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সেনাবিদ্রোহ হয় এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান কাউনতাশিকে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্ধারণ করা হয়। তার যুগে ফ্রান্স নাইজার থেকে তাদের অবশিষ্ট সৈনিক প্রত্যাহার করে। ১৪০৮ হিজরিতে (১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে) নাইজারি প্রেসিডেন্ট অসুস্থতায় ইনতেকাল করে। তারপর সাইবুর ওপর নাইজারের নেতৃত্ব অর্পিত হয়।

মালি

ফ্রান্স অধিগ্রহণকালে এটা ফরাসি-সুদান নামে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে ফ্রান্সের অধীনে সেনেগালের সাথে এক হয়ে দেশ গঠন করা হয়।

কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই ঐক্য ভেঙে যায়। ১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) মালিকে স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক দেশ ঘোষণা করা হয়। মালিয়ানদের নেতা মোদিবো কিতাকে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট করা হয়। সে রাজনীতিতে পদচ্যুতকরণ ও স্বৈরশাসনের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিল।

১৩৮৮ হিজরিতে (১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) তার বিরুদ্ধে সেনাবিদ্রোহ ঘটে। তাকে পরাজিত করে মুসা ট্রাওরেকে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয়। তার রাজত্বকালে মালি ও বুর্কিনা ফাসো সীমান্তে যুদ্ধের উত্তেজনা বিরাজ করে। ১৪০৬ হিজরিতে (১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) এদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। অতঃপর উভয় দেশ আন্তর্জাতিক শালিসে ঐকমত্যে উপনীত হয় যে, এলাকাকে উভয় দেশের মধ্যে অর্ধেক হারে ভাগ করা হবে। অতঃপর ১৪১১ হিজরিতে (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে) আহমাদ তোমানি সাওরি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে মুসা ট্রাওরেকে পরাজিত করে।

সেনেগাল

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ফ্রান্সের অধীনে সেনেগাল ও মালি এক হয়ে মালিরাষ্ট্র গঠন করে। এ দেশ মালি থেকে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। ১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) সেনেগাল প্রজাতন্ত্র স্বাধীন দেশ ঘোষণা করে লিওবুলাদ সানজুরকে প্রজাতন্ত্রের প্রধানের দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৪০১ হিজরিতে (১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে) সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয় এবং তার প্রধানমন্ত্রী আবদি জুয়ুফের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

তার রাজত্বকালে গাম্বিয়ার সঙ্গে ঐক্যের সংলাপ হয়। অতঃপর সেনেগাল গাম্বিয়ায় অনুপ্রবেশ করলে তাদের মধ্যকার ঐক্যচুক্তি ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৪১০ হিজরিতে (১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে) সেনেগাল গাম্বিয়া থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে। এমনইভাবে মৌরিতানিয়া ও সেনেগালের মধ্যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এ সম্পর্কে আমরা মৌরিতানিয়া সম্পর্কিত অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি।

গাম্বিয়া

গাম্বিয়া নিয়ে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সংঘাত হয়। ইংল্যান্ডের কাছে ফ্রান্স নত হলে এ সংঘাত শেষ হয়। দেশটি ১৩৯০ হিজরিতে (১৯৭০

খ্রিষ্টাব্দে) স্বাধীন হয়। এখানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। দাউদ গাওরা প্রেসিডেন্ট হন ১৪০০ হিজরিতে (১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে)। তখন সেনেগালের নিকট দাবি জানানো হয়, শান্তি রক্ষায় সহায়তার জন্য তারা যেন গাম্বিয়ায় তাদের সৈনিক প্রেরণ করে। ১৪০১ হিজরিতে (১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে) গাম্বিয়ায় একটি বিপ্লব হয়। এতে দাউদ গাওরাকে পরাজিত করা হয়। কাকু সাম্বা সানিয়ানাকে প্রেসিডেন্ট বানানো হয়। সেনেগালের সৈনিকরা গাম্বিয়ায় প্রবেশ করে বিপ্লব চালিয়ে দাউদ গাওরাকে পুনরায় ক্ষমতায় বসাতে সক্ষম হয়। সেনেগালের সঙ্গে গাম্বিয়াকে মিলিয়ে একক দেশ গঠন করার জন্য একটি পরিকল্পনা গঠন করা হয়। যার নাম হবে সেনেগাম্বিয়া, আবদি জুয়ুফ হবে এর প্রেসিডেন্ট, আর দাউদ গাওরা হবে ভাইস প্রেসিডেন্ট। অতঃপর উভয় নেতার মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে ১৪১০ হিজরিতে (১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) ঐক্য ভেঙে যায়।

তানজানিয়া (তানজানিকা)

তানজানিয়া জার্মানির উপনিবেশ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের পরাজয়ের পর এখানে ইংরেজদের উপনিবেশ তৈরি হয়। এদিকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের সরু সেক্টরও জানজিবার রাজ্য দুই উপদ্বীপ তথা জানজিবার ও বুম্বার ভূখণ্ড ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি ও ইতালির মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়। পরিশেষে তার রাজত্বের অধীনে মাত্র দুটি উপদ্বীপ তথা জানজিবার ও বুম্বা বাকি থাকে। অতঃপর ১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) জানজিবারের সমস্ত রাজ্য ইংরেজদের হাতে ফিরে আসে। তারপর ১৩৮১ হিজরিতে (১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে) ইংল্যান্ড তানজানিয়াকে স্বাধীনতা দান করে। সেটা ব্রিটেশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

জানজিবারকে ১৩৮৩ হিজরিতে (১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এর বাদশাহ ছিল জুলিমশিদ বিন আবদুল্লাহ খলিফা। তার যুগে জানজিবারে আন্তর্জাতিক রাজনীতি খেলা শুরু করে। মুসলমান, আরব ও আফ্রিকানদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে ১৩৮৩ হিজরিতে জানজিবারে আবিদ কুরমির সেনা বিপ্লব ঘটে। বাদশাহ জুলিমশিদ পরাজিত হয়। এতে প্রায় ষোলো হাজারের অধিক আরব নিহত হয়। কেননা ক্ষমতা ছিল আফ্রিকানদের অধীনে। আরবরা উপদ্বীপ দখল করে রেখেছিল, ফলে ক্ষমতা প্রয়োগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এতে মুসলমানদের চুয়ান্ন হাজার লোক নিহত হয়েছিল। আবিদ কুরমি

তানজানিয়ার সরকারের সাথে একাত্মতা পোষণ করে। তার সঙ্গে একটি দেশ হওয়া নিয়ে পরস্পরে চুক্তি করে, যার নাম হবে তানজানিয়া। এতে ক্ষমতা থাকবে জুলিয়াস নাইরের হাতে। প্রেসিডেন্ট হবে জুলিয়াস নাইওে এবং আবিদ কুরমি হবে ভাইস প্রেসিডেন্ট।

আল্লাহ তাআলা আবিদ কুরমি থেকে প্রতিশোধ নিলেন, যে ভেবেছিল তার কর্মের মাধ্যমে সে দেশে উচ্চপদ হাসিল করবে। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল যে, ইসলামের শত্রুরা এক কথায় অটল থাকে না। বিশেষ করে যদি সেই শত্রু নামধারী মুসলিম হয়। শত্রুরা দেখল, তার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে; অথচ দেশে তার বেঁচে থাকাটা ইসলামি প্রভাব সৃষ্টি করবে। তাই ১৩৯৪ হিজরিতে (১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) তাকে গুপ্তহত্যা করা হয়। এরপর আবুদ জাম্বি জানজিবার উপদ্বীপের শাসক নিযুক্ত হয়। জানজিবার সম্প্রদায় জানজিবার ও তানজানিয়ার ঐক্য মেনে নিতে রাজি হয়নি। কেননা, ক্ষমতা ছিল খ্রিষ্টানদের হাতে; অথচ জানজিবার ও তানজানিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা ছিল মুসলমান। খ্রিষ্টান শাসন তানজানিয়ায় মুসলমানদের জঘন্য কষ্ট ও সীমাহীন শাস্তি প্রদান করেছিল।

১৩৯৯ হিজরিতে (১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) উগান্ডার জাতীয় ফ্রন্ট মুসলিম প্রেসিডেন্ট ইদি আমিনকে পরাস্ত করার সময় তানজানিয়ান সেনাবাহিনী তাদেরকে সাহায্য করেছিল। আবুদ জাম্বি ১৪০৩ হিজরিতে (১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে) তার পদ থেকে সরে দাঁড়ায়। তারপর ১৪০৩ হিজরিতে আলি হাসান মুভিনাইকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। সে একই সময় তানজানিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করে। তারপর ১৪০৫ হিজরিতে (১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে) জুলিয়াস নিরির পর সে তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়। তারপর ১৪০৭ হিজরিতে (১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) তানজানিয়া মুজাম্বিক সরকার বিরোধীদের বিরুদ্ধে সৈনিক প্রেরণ করে সহায়তা করে। তারপর ১৪০৮ হিজরিতে (১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং ১৪০৬ হিজরিতে (১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) উগান্ডার ক্ষমতা দখলকারী মুসিভিনিকে সমর্থন দেয়। তখন তানজানিয়ায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৬২% আর খ্রিষ্টান ছিল ২৭% ও পৌত্তলিক ছিল ১১%। আর জানজিবারে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৯০%।

নাইজেরিয়া

১৩৮৩ হিজরিতে (১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) নাইজেরিয়া ইংল্যান্ড থেকে স্বাধীন হয়। সেটা বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে একটি ইউনিয়ন হিসেব গঠিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পূর্বে ক্যামেরুনের একটি অংশ তার সাথে সম্পৃক্ত হয়। নাইজেরিয়া ছিল ইংরেজদের মিত্র দেশসমূহের একটি। নাইজেরিয়ায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৭৫%। খ্রিষ্টান ১৫% আর বাকিরা ছিল পৌত্তলিক। অভ্যাস অনুযায়ী ঔপনিবেশিকরা দেশ ছাড়ার আগে সংখ্যালঘু খ্রিষ্টানদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়। ফলে নান্দী এজিকয়ে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হয়। ওই সময়ই সেনাবাহিনীতে খ্রিষ্টান কর্মকর্তারা উচ্চপদে নিযুক্ত ছিল। তাই সেনাবাহিনীও তাদের হাতে ছিল। যদিও প্রধানমন্ত্রী ছিল আবু বকর তাফাওয়া। উপপ্রধান মন্ত্রী ছিল আহমাদ বিল্লু। তারা উভয়ে মুসলমান ছিল। তারা উভয়ে নাইজেরিয়ায় ইসলামের প্রাণ সঞ্জীবিত করার জন্য এবং ইহুদিদের যেকোনো আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য কাজ করে। এমনকি তারা এ বিষয়টি সভাসদে ঘোষণা করে দেয়।

নাইজেরিয়ায় ইসলামি আওয়াজ স্তব্ধ করার জন্য দেশে আন্তর্জাতিক খ্রিষ্টীয় খেলা শুরু হয়ে যায়। তারা এক নাইজেরিয়ান সেনা কর্মকর্তা চোকো গানসুগুর পৃষ্ঠপোষকতা করে। তার নেতৃত্বে বিদ্রোহ সংঘটিত করে আহমাদ বিল্লু, আবু বকর তাফাওয়া ও সরকারের অনেক মুসলিম মন্ত্রীকে হত্যা করে। এমনকি যাদেরকে মুসলমানদের সহযোগী সন্দেহ করত তাদেরকেও হত্যা করে। এটা হয়েছিল ১৩৮৫ হিজরিতে (১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে)। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র শক্তিশালী করার জন্য চোকো গানসুগু খ্রিষ্টান সেনাপ্রধান জনসন আগাভি ইরানির নিকট আত্মসমর্পণ করে।

উল্লেখ্য যে, উত্তর নাইজেরিয়ার অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল মুসলিম। আর পূর্ব নাইজেরিয়ায় খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ছিল বেশি। তারা ইবো গোত্রের লোক ছিল। ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা তাদের সহায়তায় কাজ করে। যাতে দেশে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। এ দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ইংরেজরা তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে যায়।

এমনকি উত্তর নাইজেরিয়ায় বিভিন্ন অঘটন ঘটলে মুসলমানরা ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারত না। খ্রিষ্টানদের মাধ্যমে গুপ্তহত্যার শিকার হতো। উত্তর নাইজেরিয়ার একজন খ্রিষ্টান প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ইয়াকুব গাউনের পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে খ্রিষ্টীয় নতুন খেলা শুরু হয়। যেখানে খ্রিষ্টান ছিল

সংখ্যালঘু। সে ১৩৮৬ হিজরিতে (১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে) ক্ষমতায় সমাসীন হয়। এটা হয়েছিল উত্তরাঞ্চলের মুসলমানদের শিথিলতার কারণে। কেননা, রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমান থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতা হয়ে যায় খ্রিষ্টানদের। সে বছরই পূর্ব নাইজেরিয়ার সেনাপ্রধান সেখানকার সব মুসলমানকে পূর্ব প্রদেশে একত্র হওয়ার ও উনোতিশা শহরে স্থানান্তরিত হওয়ার নির্দেশ দেয়। এ সময় বিরাট এক গণহত্যা সংঘটিত হয়, যা থেকে অল্পসংখ্যক লোকই মুক্তি পায়।

কালাবার কাতিনা গোত্র তাদেরকে ওই প্রদেশে ভাগিয়ে দেয়। উত্তর প্রদেশের লোকেরা তা জানার পর আন্দোলন করে এবং উত্তর প্রদেশের সেনানিবাসে হামলা করে। অস্ত্রের ওপর তারা দখল নিয়ে উত্তরাঞ্চলে অবস্থানরত ইবো গোত্র থেকে প্রতিশোধ নেয়। আর যারা উনোতিশা শহরে মুসলমানদের গণহত্যা সংঘটিত করেছিল তাদের থেকেও প্রতিশোধ গ্রহণ করে। কিন্তু উত্তরাঞ্চলীয় মুসলমানরা নারী ও শিশু হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তবে তারা কালাবার গোত্রের কাছে যায়নি বা আক্রমণ করেনি। এদিকে পূর্ব প্রদেশের নেতা চোকো মিকা অজুকো নাইজেরিয়া থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ফলে তার ও সরকারের সৈনিকদের মধ্যে মারাত্মক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে সরকারি সৈনিক বিজয় লাভ করে, আর চোকো মিকা অজুকো দেশ ছেড়ে পলায়ন করে।

১৩৯৫ হিজরিতে (১৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) নাইজেরিয়ান প্রেসিডেন্ট ইয়াকুব গাউন যখন উগান্ডায় অনুষ্ঠিত আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিত হয় তখন নাইজেরিয়ার সেনানায়করা মুর্তাজাল্লা রহমত মুহাম্মাদকে দেশের প্রেসিডেন্ট সে এক বছর শাসন করে ১৩৯৬ হিজরিতে (১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) গুপ্তহত্যার শিকার হয়। ফলে উলসিগান উবাসিনজু সামরিক চীপ অব স্টাপ-এর পদ গ্রহণ করে। ১৩৯৮ হিজরিতে (১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শিখোশাগারি আলি বিজয়ী হয়। ১৪০৪ হিজরিতে (১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে) মুহাম্মাদ বুখারির নেতৃত্বে দেশে সেনা বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত সে এ পদে বহাল থাকে। মুহাম্মাদ বুখারি ১৪০৫ হিজরি (১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। অতঃপর পোপ নাগিদার নেতৃত্বে দ্বিতীয় সেনা বিদ্রোহ হলে দেশে নতুন নেতার আবির্ভাব ঘটে।

গ্যাবন

এটা ফ্রান্সের ঔপনিবেশ ছিল। ১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ক্ষমতায় টানা কয়েক বছর খ্রিষ্টানরাই থাকে। অবশেষে ১৩৮৭ হিজরিতে (১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) উমর বঙ্গ গ্যাবনের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়। ১৩৯৩ হিজরিতে (১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) তার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে। তার ইসলাম গ্রহণের ফলে তার পরিবার ও বঙ্গগোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে আরও অনেক গোত্র তাদের ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ করে। যেমন: আলবাও, দুনাও ও বুনু। তখন গ্যাবনে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৫%।

দুই. অমুসলিম শাসিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহ

বিশ্বে একমাত্র আফ্রিকা মহাদেশেরই ব্যতিক্রমধর্মী এই বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে যে, এখানে এমন অনেক দেশ পাওয়া যায়, যা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছে সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। কারণ, খ্রিষ্টান ঔপনিবেশিকরা এ সমস্ত দেশের নেতৃত্বভার স্বজাতীয়দের হাতে অর্পণ করে যায়। এখনও খ্রিষ্টানদের স্বৈরাচারী শাসন দৃঢ়করণে তারা সহায়তা করে যাচ্ছে। আর এসব দেশের ক্ষমতাসীন খ্রিষ্টান শাসকরা সেখানের পরিসংখ্যান করার সময় মুসলমানদের হীনম্মন্য করার জন্য তাদের সংখ্যা কম আকারে প্রকাশ। তাদেরকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয় যে, দেশে শাসকশ্রেণি খ্রিষ্টানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হলো, অনেক ইসলামি দেশ এ পরিসংখ্যান মেনেও নেয়।

অমুসলিমদের শাসনে থাকা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে: গিনি, ক্যামেরুন, গিনি বিসাও, বেনিন, টুগো, বুর্কিনা ফাসো, আইভরি কোস্ট, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, সিয়েরা লিওন, ইথিওপিয়া।

গিনি

১৩৭৮ হিজরিতে (১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) গিনি ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতার এক বছর পর ঘানার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশ গঠন করার ঘোষণা দেয়। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই দু-দেশ আবার পৃথক হয়ে যায়। গিনির প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন আহমাদ সেকোউ তুরে। তিনি ছিলেন ফ্রান্স

বিরোধী বিপ্লবের নেতা। বিপ্লবের জন্য বেশ কয়েকবার প্রচেষ্টা চালানো হয়, কিন্তু সবগুলোই ব্যর্থ হয়। যুক্তরাষ্ট্রে আহমাদ সেকোউ তুরে অপারেশনের উদ্দেশ্যে গমন করেন। কিন্তু সেখানেই ১৪০৪ হিজরিতে (১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে) ইনতেকাল করেন। এরপর সেনাবাহিনী ক্ষমতা হস্তগত করে এবং লানসানা কোন্টেকে দেশের প্রধান নিযুক্ত করে। তিনি ছিলেন খ্রিষ্টান। পক্ষান্তরে দেশের প্রধানমন্ত্রী দিয়ারা ট্রাওরে ছিলেন মুসলমান। নতুন প্রেসিডেন্ট তাকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। ফলে ১৪০৫ হিজরিতে (১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে) গিনির প্রেসিডেন্ট টুগোতে সফরকালে গিনিতে বিপ্লবের প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। দিয়ারা ট্রাওরে নিহত হন। এরপর এই মুসলিম দেশে খ্রিষ্টানরাই একচ্ছত্র নেতৃত্ব দিতে শুরু করে, যদিও এর ৯৩% মানুষ মুসলমান।

ক্যামেরুন

প্রথমদিকে ফ্রান্সের দখলে ছিল। তারপর ফ্রান্স একে জার্মানির কর্তৃত্বে ছেড়ে দেয়। বিনিময়ে তারা জার্মানির থেকে মরক্কোর কর্তৃত্ব লাভ করে। ১৩৩৭ হিজরির সময় (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হলে সেখানে মিত্রবাহিনীর সৈনিকেরা প্রবেশ করে এবং ক্যামেরুনকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড পরস্পরে ভাগাভাগি করে নেয়। এর সিংহভাগ ছিল ফ্রান্সের অধীনে। আর তার পশ্চিমদিকের ছোট একটি অংশ ছিল ইংল্যান্ডের দখলে, যার উত্তরদিকে ছিল নাইজেরিয়া সীমান্ত। তারপর ১৩৭৯ হিজরিতে (১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে) ক্যামেরুন স্বাধীনতা অর্জন করে।

১৩৮১ হিজরিতে (১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে) ইংরেজ অধিকৃত দক্ষিণ ক্যামেরুনও মুক্ত হয় এবং ক্যামেরুনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন আহমাদ আহিদজু। কিন্তু ১৪০৩ হিজরিতে (১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে) খ্রিষ্টান প্রধানমন্ত্রী পলবিয়াকে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ বুঝিয়ে দিয়ে সন্তোষজনক কোনো কারণ ছাড়াই তিনি পদত্যাগ করেন। নতুন রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতায় এসে মুসলিম রাজনীতিবিদদের বরখাস্ত করা শুরু করেন। মুসলিম প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে অপসারণ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তারা নতুন রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করেছে। এমনকি সাবেক রাষ্ট্রপতি আহমাদ আহিদজুকে বিদ্রোহের ছক আঁকার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। তার ব্যাপার গোপনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত আমৃত্যু কারাদণ্ডের

মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। এ পরিস্থিতিতে সাবেক প্রেসিডেন্ট দেশ থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এ বিষয়টি আহমাদ আহিদজুর নিষ্কলুষতা এবং পলবিয়ারের দুরাচারী মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করে।

১৪০৪ হিজরিতে (১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে) কর্নেল সালেহ ইবরাহিম দেশে নতুন শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কিন্তু পলবিয়ার অনুগত সৈনিকরা এ বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। এরপর পলবিয়া অনেক মুসলিম রাজনীতিবিদকে বরখাস্ত করেন। অভিযোগ আনা হয়, তারা সাবেক রাষ্ট্রপ্রধানের পৃষ্ঠপোষক। অনেককে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করে।

আহমাদ আহিদজুর শাসনকালে ইসরাইলের সাথে ক্যামেরুনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু ১৪০৬ হিজরিতে (১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) খ্রিষ্টান রাষ্ট্রপ্রধান ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেন। ক্যামেরুন ও নাইজেরিয়ার সীমান্তে বেশকিছু সংঘাত ঘটে। কিন্তু তা বেশিদিন অব্যাহত হয়নি, একপর্যায়ে উভয় দেশের মাঝে ভালো সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ক্যামেরুনে মুসলিম জনসংখ্যা হচ্ছে ৬০%, অথচ খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ১৬%-এর বেশি না। বাকি অংশ পৌত্তলিক গোষ্ঠী। কিন্তু ক্ষমতার বাগডোর খ্রিষ্টানদের হাতেই রয়ে যায়।

গিনি বিসাও

এ দেশটির কাঁধে নেমে আসে পর্তুগিজ দখলদারির জোয়াল। পর্তুগালের ঔপনিবেশিকরা স্বাভাবিকই নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিল। বিশেষ করে তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল মুসলমানরা। মুসলিমদের ওপর হরেক রকমের নিপীড়ন ও নির্যাচন চালানোর ক্ষেত্রে পর্তুগাল ও স্প্যানিশরা সর্বদাই ছিল অগ্রগামী। ইসলামের শত্রুদের নিকট মুসলিম নিধনের ক্ষেত্রে এ দুই দেশের অবস্থান ছিল আদর্শস্বরূপ।

বহু চড়াই-উতরাইয়ের পর গিনি বিসাও ১৩৯৪ হিজরিতে (১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) পর্তুগাল থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু দেশের ৬০% লোক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও পর্তুগিজরা খ্রিষ্টান সংখ্যালঘুদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে যায়।

বেনিন

ইতিপূর্বে এই দেশের নাম ছিল দাহুমি। একসময় তা ফরাসি উপনিবেশের শিকার হয়। ১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) ফ্রান্স থেকে স্বাধীন হয়। ১৩৯৫ হিজরিতে (১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) তার নতুন নাম হয় বেনিন। দেশের মুসলিম জনসংখ্যা ৬০%, আর খ্রিষ্টানদের জনসংখ্যা ১০%। তবুও এর শাসনক্ষমতা হস্তগত হয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের।

টোগো

দেশটির কর্তৃত্বে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড উভয়ে শরিক ছিল। ১৩৭৯ হিজরিতে (১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে) স্বাধীনতা অর্জন করে। মুসলিম জনসংখ্যা ৫৫%। কিন্তু অন্যান্য দেশের মতো ঔপনিবেশিকরা দেশ ছাড়ার সময় এর নেতৃত্ব ছেড়ে যায় খ্রিষ্টানদের হাতে, যাদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ১৫% হবে। অবশিষ্টরা পৌত্তলিক।

বুর্কিনা ফাসো

দেশটি ১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) ফ্রান্স থেকে স্বাধীন হয়। প্রথমে এটাকে আপার ভোল্টা বলা হতো। এরপর ১৪০৪ হিজরিতে (১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে) তার নাম হয় বুর্কিনা ফাসো। এর মুসলিম জনসংখ্যা ৬৫% হওয়া সত্ত্বেও ঔপনিবেশিকরা তার নেতৃত্ব অর্পণ করে যায় খ্রিষ্টানদের হাতে, যা আজ পর্যন্ত বলবৎ। এই অঞ্চলে বেশ কয়েকবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু সবগুলোর ফলাফল ছিল একইরকম, শাসনক্ষমতা যথারীতি খ্রিষ্টানদের হাতেই রয়ে যায়, যাদের সংখ্যা হবে মাত্র ১০%-এর মতো।

কো দিভোয়ার/আইভরি কোস্ট

দেশটি ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। ১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) স্বাধীনতা লাভ করে। অঞ্চলটি আইভরি কোস্ট নামেও পরিচিত। ১৪০৬ হিজরিতে ফরাসি ভাষায় এর নাম পরিবর্তন করে কোত দিভোয়ার রাখা হয়। দেশের মুসলিম জনসংখ্যা ৬০% হলেও ঔপনিবেশিকরা দেশের নেতৃত্ব খ্রিষ্টানদের হাতে হস্তান্তর করে যায়, যাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২%-এর মতো।

মধ্যআফ্রিকা

দেশটি ১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) ফ্রান্স থেকে স্বাধীন হয়। তার মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৫৫%। এতৎসত্ত্বেও ক্ষমতা ছিল খ্রিষ্টানদের হাতে, যাদের সংখ্যা ছিল ২৫%। সেখানে কয়েকবার বিদ্রোহ হয়, কিন্তু মূল অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। খ্রিষ্টান শাসনই অব্যাহত থাকে।

সিয়েরা লিওন

দেশটি ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের অধীনে ছিল। ১৩৮০ হিজরিতে (১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে) স্বাধীনতা লাভ করে। যদিও দেশের অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলমান ছিল, কিন্তু দখলদাররা প্রত্যাবর্তনের সময় খ্রিষ্টানদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে যায়, যাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০%-এর মতো; অন্যদিকে জনসংখ্যার ৮০%-এর বেশি ছিল মুসলিম।

ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইথিওপিয়া ঔপনিবেশিকদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই ইউরোপীয় শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে। চারপাশজুড়ে মুসলিম রাষ্ট্রের বেষ্টনীতে থাকা এ দেশটিকে তারা খ্রিষ্টরাজ্যে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা পরবর্তী সময়ে তাদের জন্য পূর্ব আফ্রিকায় ক্রুসেডীয় ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আশেপাশের মুসলিম দেশগুলোতে সম্প্রসারণবাদী নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ ভূমিতে মিশে ছিল তাদের স্বপ্ন-আশা। এ ছাড়া, মুসলিম দেশগুলোর স্থিতিশীলতা নষ্ট করার জন্যও এ দেশটি তাদের জন্য উর্বর ভূমি হবে বলে বিবেচনা করা হয়।

তবে মুসোলিনি এ অঞ্চলে তার ক্ষমতা বিস্তারের ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন; এমনকি সেটা গির্জার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কিংবা ভ্যাটিকান সিটির নির্দেশনা বাতিল করে হলেও। তিনি ইথিওপিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার করে কিছুদিনের জন্য তা দখলেও রাখেন। ইথিওপিয়ার সীমানাভুক্ত ছিল তখন তার পাহাড়ি অঞ্চল, হারার প্রদেশ ও ওগাদিন। ইংরেজ ও ইতালিয়ানরা যখন সোমালিয়া ও মিসর দখল করে, তখন এগুলো ইথিওপিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে যায়। এসব অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যার হার ছিল অত্যাধিক। এদিকে ইতালি ইরিত্রিয়াও দখল করে নেয়। মুসোলিনি

তখন ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া ও দক্ষিণ সোমালিয়া নিয়ে ইতালিয়ান পূর্ব আফ্রিকা গঠনের ঘোষণা দেন।

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ইতালি পরাজিত হয়। তখন মিত্রপক্ষের সৈনিকরা ইতালির অধীনস্থ আফ্রিকার দেশসমূহে প্রবেশ করে। ইথিওপিয়া অক্ষশক্তির দেশসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর জাতিসংঘ ইরিত্রিয়া ও দক্ষিণ ও পশ্চিম সোমালিয়া (হারার ও ওগাদিন) থেকে ইথিওপিয়ার সীমানা আলাদা করে এবং ইথিওপিয়াকে স্বাধীন দেশ বলে ঘোষণা দেয়। অর্থাৎ, ইথিওপিয়ায় মাত্র সাত বছরের মতো উপনিবেশ স্থায়ী ছিল। পক্ষান্তরে দক্ষিণ ও পশ্চিম সোমালিয়া এবং ইরিত্রিয়াকে ইতালির অংশ বলে ঘোষণা করা হয়।

এদিকে ইথিওপিয়ার রাজা হাইল স্যালেসি প্রকাশ্যে ইসলামবিদ্বেষী অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি ইতালির বিভিন্ন অংশকে ইথিওপিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। খ্রিষ্টান দেশগুলো নিজেদের মুসলিমবিদ্বেষী স্বপ্ন ইথিওপিয়ার হাতে বাস্তবায়ন হতে দেখে অত্যন্ত পুলকিত হয়। ফলে ১৩৭০ হিজরিতে জাতিসংঘ ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার সম্মিলনে রাষ্ট্রগঠনের ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করে। ইরিত্রিয়া এভাবে ইথিওপিয়ার অংশে পরিণত হয়। ১৩৭২ হিজরিতে ইথিওপিয়া ইরিত্রিয়া দখলের জন্য সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করে। দখল প্রতিষ্ঠার পর সেখানে দমনপীড়ন শুরু হয়, ইথিওপিয়ার বক্রনীতি পৌঁছে যায় ইরিত্রিয়ায়। সেখানে আরবি ভাষা শিক্ষাদান নিষিদ্ধ করা হয়। খ্রিষ্টান বসতি স্থাপন করা হয়। খ্রিষ্টানদের ইরিত্রিয়ার উর্বর ভূমির অধিকার প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানদেরকে দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় নির্বাসন দেওয়া হয়।

এ হলো ইথিওপিয়ানদের অমানবিক আচরণের সামান্য দৃষ্টান্ত, যা তারা ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া ও তাদের শাসনাধীন মুসলিম অঞ্চলগুলোতে চালায়। বহির্বিশ্বে ইথিওপিয়া ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে। দেশের অভ্যন্তরে ইহুদিদের কার্যক্রম পরিচালনা ও সেনা প্রশিক্ষণে তাদেরকে ব্যাপক অনুমতি দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে দেশীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বক্রনীতি বৃদ্ধি করে। এ সময়ে মোগাদিসুতে ইরিত্রিয়া লিবারেশন ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা পায়। এরপর ১৩৮২ হিজরিতে (১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে) ইথিওপিয়ার পক্ষ থেকে ঘোষিত হয় যে, ইরিত্রিয়াকে সামরিক শক্তিবলে

অধিকার করে নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ইরিত্রিয়ায় দখল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।

পশ্চিম সোমালিয়া সংকট

পশ্চিম সোমালিয়ায় ইথিওপিয়ার ক্ষমতা বিস্তারের জন্য ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালি পূর্ণ সুযোগ দেয়। ফলে ইথিওপিয়া হারার ও ওগাদিন দখল করে নেয়। এরপর ইথিওপিয়াকে ইতালি দখল করে নেয়। তারা পশ্চিম সোমালিয়া ও ইতালিয়ান সোমালিয়া সংযুক্তির ঘোষণা দেয়। তারপর ইতালিয়ানদের হটিয়ে ইথিওপিয়ায় মিত্রপক্ষের সৈনিকরা প্রবেশ করে। মিত্রপক্ষ ঘোষণা করে, তারা দশ বছর পর পশ্চিম সোমালিয়াকে স্বাধীনতা প্রদান করবে। কিন্তু ১৩৭৪ হিজরিতে (১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে) ইথিওপিয়ার সাথে একচুক্তির পর তার পথ সুগম করে দিতে দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই পশ্চিম সোমালিয়া থেকে ইংরেজরা সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর ইথিওপিয়া পশ্চিম সোমালিয়ায় প্রবেশ করে তা দখল করে নেয়। এ পদক্ষেপে জাতিসংঘ বিন্দুমাত্রও আপত্তি জানায়নি।

ইথিওপিয়ানরা পশ্চিম সোমালিয়ায় (হারার ও ওগাদিন) তাদের ক্রোধ-বিদ্বেষ উগড়ে দেয়। হিফজখানা বন্ধ করে দেয়। আরবি শিক্ষাব্যবস্থা তছনছ করে। মুসলমানদের ওপর গুম-খুন, জেল-জুলুমের ধারাবাহিকতা বইয়ে দেয়। এ পরিস্থিতিতে ১৩৮৩ হিজরিতে (১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) শায়খ তাহেরের নেতৃত্বে ওগাদিনে বড় ধরনের বিদ্রোহ হয়। তিনি হারার ও পার্শ্ববর্তী অনেক এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ইথিওপিয়ান সৈনিকদের বিরুদ্ধে অনেক বিজয় অর্জন করেন। এ সময় বিশ্বের ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ইথিওপিয়ার পক্ষে অবস্থান নেয়। ইথিওপিয়ান সেনাদের মধ্যে অনেক খ্রিষ্টান ও ইহুদি সৈনিক এবং ইসরাইলি, আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তারা ইসলামি আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়। ইথিওপিয়ানরা পুনরায় মুসলমানদের ওপর তাদের দমননীতি প্রয়োগ করে। মুসলিম নিধন, খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্যকরণ, নারীদের বন্দি করা, শিশুদের অপহরণ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, তাদের ওপর অসাধ্য করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ইথিওপিয়ান ইতিহাসে ভরপুর। এ ছাড়া নিরবচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, শহরে-শহরে গির্জা নির্মাণ ইত্যাদিও ছিল। মুসলমানদের ওপর ব্যাপক নিপীড়ন ও লাঞ্ছিতকরণের ধারা ক্রমান্বয় প্রসারতা ও হিংস্রতার সাথে অব্যাহত থাকে।

দক্ষিণ সুদানের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি

ইথিওপিয়া দক্ষিণ সুদানের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান করে। এর পেছনে তাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল। যেমন : তারা নিজেরাই মূলত দক্ষিণ সুদানকে গ্রাস করে নিতে চাচ্ছিল। যে কারণে দেখা যায়, দক্ষিণ সুদানের বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার নেতৃত্বে ছিল খ্রিষ্টানরা। দ্বিতীয়ত, সুদান ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতাকামী ঐক্যফ্রন্টকে সহায়তা করে। সুতরাং, ইথিওপিয়া সুদানকে চাপে রাখার জন্য এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তৃতীয়ত, এর মাধ্যমে কমপক্ষে ক্রুসেডীয় পরিকল্পনার অংশ বাস্তবায়ন অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী কোনো মুসলিম দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে রাখার বিষয়টি অর্জিত হবে।

রাজা হাইল স্যালেসির পতন

১৩৯৪ হিজরিতে (১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) ইথিওপিয়ায় সামরিক বিপ্লব ঘটে। দেশের দুর্ভিক্ষ ও অবনতিশীল পরিস্থিতির কারণে রাজার পতন ঘটে। ইথিওপিয়ায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হয়। সামরিক শাসক মেঙ্গিস্টুর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট শাসন শুরু হয়। এ সময় নতুন সরকার বিরোধী বেশকিছু সংগঠনের জন্ম হয়।

পশ্চিম সোমালিয়ার পরিস্থিতি

১৩৯৭ হিজরিতে (১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) ইথিওপিয়ার দখলদারিত্ব থেকে পশ্চিম সোমালিয়াকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে সোমালিয়া প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে অনেক আক্রমণ পরিচালিত হয়। ইথিওপিয়ার সৈনিকদের বিরুদ্ধে তারা বিশাল বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু রাশিয়া ও ইহুদিরা ইথিওপিয়ার পাশে দাঁড়ায়। ফলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। সোমালিয়া প্রজাতন্ত্রের সৈনিকরা ইথিওপিয়া থেকে মুখ ঘুরিয়ে সোমালিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। তারপর উভয় দেশের মাঝে সন্ধি হয় যে, উভয়েই আন্তর্জাতিক সীমানার ভেতর ফিরে যাবে।

সোমালিয়া ইথিওপিয়ার অভ্যন্তরীণ সংঘাতে পৃষ্ঠপোষকতা করত। এজন্য ইথিওপিয়াও সোমালিয়ার অভ্যন্তরীণ সংঘাতে পৃষ্ঠপোষকতা করে। ১৪১১ হিজরিতে (১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে) সিয়াদ বারির শাসন পতনে এবং সোমালিয়ার গৃহযোদ্ধা বাহিনীগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার ফলে সেখানকার যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইথিওপিয়ার বিশাল ভূমিকা ছিল।

ইরিত্রিয়ার পরিস্থিতি

১৪০৪ হিজরি (১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ইরিত্রিয়া মুক্তিফ্রন্টের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চলতে থাকে। এ সময় ইরিত্রিয়ান স্বাধীনতাকামীরা সহযোগী হিসেবে তাজরা মুক্তিফ্রন্টকে পেয়ে যায়। এরপর তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় এবং বিজয় অর্জন করতে থাকে। অন্যদিকে তাজরা মুক্তিফ্রন্ট ইথিওপিয়ান রেভ্যুলেশনারি ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের সাথেও যোগদান করে। ইথিওপিয়ার আন্দোলনকারীরা দেশের অধিকাংশ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ঠিক সে সময় ইরিত্রিয়া মুক্তিফ্রন্টও দেশের অধিকাংশ এলাকায় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

এরপর ১৪১১ হিজরিতে (১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে) তাজরা মুক্তিফ্রন্ট রাজধানী আদ্দিস আবাবা দখল করে এবং মেঞ্জিস্টু শাসনের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়। এরপর তারা ইরিত্রিয়ার ভাগ্য নির্ধারণকল্পে গণভোটের আয়োজন করে। এর মাধ্যমে উভয় দেশ পৃথক হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর কার্যতই ১৪১৪ হিজরিতে (১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে) ইসিয়াস আফওয়ারকিকে প্রধান করে ইরিত্রিয়া প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়।

প্রসঙ্গত, ইথিওপিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৬০%-এর বেশি, আর ইরিত্রিয়ায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি। এতৎসত্ত্বেও ইথিওপিয়ার ক্ষমতা মুসলিমবিদ্বেষী খ্রিষ্টানদের হাতেই রয়ে যায়।

ইরিত্রিয়া

ইথিওপিয়ান খ্রিষ্টান নেতাদের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার পর ইথিওপিয়া থেকে ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের কারণে অনেক মুসলিম দেশ আনন্দিত হয়। কিন্তু ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা অর্জনকে ইসরাইল ও আমেরিকা কীভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, তা তখন অনেক মুসলিম দেশের কাছেই অস্পষ্ট থাকে। অবশ্য সময় তাদের এসব অস্পষ্টতার উত্তর প্রদান করে।[২৬]

---

২৬. ইহুদি ও খ্রিষ্টানবিশ্ব ইরিত্রিয়ার ওপর অমুসলিম শাসক চাপিয়ে দেয়। এটাকে কেমন যেন স্বাধীনতার শর্তস্বরূপ রাখা হয়। ইসিয়াস আফওয়ারকি শাসনক্ষমতায় বসেই দেশে আন্তর্জাতিক ক্রুসেডীয় মিশন বাস্তবায়ন করতে শুরু করেন। অথচ এখানকার মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৭০%। ইসিয়াস অনেক মুসলিম অঞ্চলকে খ্রিষ্টান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত=

ইরিত্রিয়া হঠাৎ করেই তার উপকূলীয় এলাকা ইয়ামেনের হানিশ দ্বীপপুঞ্জে আক্রমণ করে বসে। এতে আমেরিকা ও ইহুদিদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইরিত্রিয়াকে তারা মুসলিম ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ সৃষ্টির জন্যই নির্বাচন করেছে। ইরিত্রিয়াকে ব্যবহার করে তাদের এ ছক মূলত ইথিওপিয়ার খ্রিষ্ট-মুসলিম দ্বন্দ্বে সহযোগিতার চেয়েও মারাত্মক ছিল। কারণ, সেখানে ছিল মুসলিম-অমুসলিমের স্বাভাবিক সংঘাত, অথচ এখানে হচ্ছে মুসলিম-মুসলিম ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ। স্বভাবতই এই প্রকারের সংঘর্ষ প্রথম প্রকার থেকে বহুগুণ অনিষ্টকর। তদুপরি আমেরিকা ও ইসরাইলের তৎপরতাও এ অঞ্চলে বৃদ্ধি পায়। ইসরাইলের অনেক সৈনিক হানিশ দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ইয়ামেনের সাথে যুদ্ধের জন্য ইরিত্রিয়াকে তারা ভারী অস্ত্র সরবরাহ করে। অথচ এ সীমালঙ্ঘন দেখে আমেরিকা বা জাতিসংঘ কেউই কোনোরূপ সমালোচনা করেনি। বরং এ দ্বীপপুঞ্জের ক্ষেত্রে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার জন্য ইয়ামেনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। ইরিত্রিয়ার মাধ্যমে ইসরাইল-আমেরিকার নীলনকশা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আরও জোরালো প্রমাণ যে, সুদানের বিদ্রোহীদের প্রতি ইরিত্রিয়া সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় এবং সুদানকে যুদ্ধ-সংঘাতের নাট্যশালায় পরিণত করে।

উল্লেখ্য, উল্লিখিত পরিস্থিতিতে আফওয়ারকির শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে হরকতুল জিহাদ ও স্বাধীনতাফ্রন্ট নামের সংগঠনদ্বয়।

=করেন। তার নবগঠিত সরকারের বারোজন মন্ত্রীর মধ্যে নয়জনকেই নির্বাচন করা হয় খ্রিষ্টান, আর তিনজন মাত্র মুসলমান। ইরিত্রিয়ায় আরবীয় ইসলামি চেতনা নিষ্ক্রিয় করতে কাজ শুরু করেন। আরব লীগের সাথে ইরিত্রিয়ার সংযুক্তি বর্জন করেন। তিগ্রিনিয়া ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হয়। আরবি ভাষাকে কোণঠাসা করা হয়, অথচ দেশে সেই ভাষার প্রচলন ছিল খুব বেশি। সে সময় দেশের গুরুত্বপূর্ণ অনেক ইসলামি ব্যক্তিকে গুপ্তহত্যা করা হয়, অনেককে গ্রেফতার করা হয়। আফওয়ারকি ইসরাইলের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ার প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি অনেক ইসলামি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন। অনেক ইসলামি সংগঠনের কার্যক্রমে বাধ সাধেন। অথচ খ্রিষ্টান মিশনারি কার্যবিস্তারের জন্য সবকিছু উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এ সময় দেশের মুসলমানদের ওপর লিবারেশন ফ্রন্টের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। অনেক গ্রামগঞ্জে গিয়ে তারা সীমালঙ্ঘন করতে থাকে। পাঁচশতেরও বেশি মুসলিম যুবতীকে বন্দি করে নিয়ে যায়। বাচ্চাদের অপহরণ করে। এ ছাড়াও আরও জঘন্য সব কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে, যা কেবল ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের দ্বারাই সম্ভব।

তিন. মুসলিম সংখ্যালঘু স্বাধীন দেশসমূহ

এ আলোচনায় আফ্রিকা মহাদেশের বাকি দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত। তবে আমরা এখানে শুধু কিছু দেশের মুসলিম জনসংখ্যার জরিপ উল্লেখ করার মাধ্যমেই এ আলোচনা সংক্ষিপ্ত করব। যথা:

১। কেনিয়া : ৩৫%

২। উগান্ডা : ৩০%

ইদি আমিনের নেতৃত্বে এ দেশে মুসলমানরা ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল। কিন্তু ১৩৯৯ হিজরিতে (১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রুসেডারদের নীলনকশার ফলে এই সরকারের পতন হয়। এ সংঘর্ষে নেতৃত্বদানকারী উগান্ডায় অনুপ্রবেশকারী তানজানি সৈনিকদের হাতে পাঁচ লাখের বেশি মুসলমান নিহত হয়েছিল। তানজানিয়ায় তখন খ্রিষ্টান শাসন চলছিল। উগান্ডায় ইদি আমিনের শাসন পতনের ক্ষেত্রে খ্রিষ্টানবিশ্ব তানজানিয়াকে পৃষ্ঠপোষকতা করে। আফসোস যে, তারা তাদের পরিকল্পনায় সফলও হয়।

মিশরীয় শাসনকালে উগান্ডার নাম ছিল বুগান্ডা মুসলিম সাম্রাজ্য। ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা এসে তার পতন ঘটায়।

৩। মুজাম্বিক ৩০%

৪। মালাউই ৩৫%

৫। মাদাগাস্কার ২৫%

৬। লাইবেরিয়া ৩৫%

দেশটি সাম্প্রতিককালে গৃহযুদ্ধের শিকার হয়। চার্লস টেইলরের নেতৃত্বে মুসলিম নিধন চলতে থাকে। তারা মুসলমানদের ওপর নিকৃষ্টতম নির্যাতন চালায়, দেহবিকৃতি ঘটায়। তারা মুয়াজ্জিনদের জিহ্বা কেটে দেয়, হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। নির্যাতিতদের কেউ কেউ পার্শ্ববর্তী দেশ গিনি, সিয়েরা লিওন প্রভৃতিতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু টেইলরবাহিনী সিয়েরা লিওনে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের খুঁজে-খুঁজে বের করে অনেককে হত্যা করে। এই পরিস্থিতিতে লাইবেরিয়ার মুসলিমরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেক এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, যা ছিল লাইবেরিয়ার এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল। একপর্যায়ে জাতিসংঘ বিবদমান পক্ষগুলোর মাঝে

সন্ধির প্রয়াস চালায়। লাইবেরিয়ায় মুসলিম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। কিন্তু বিশ্ব ক্রুসেডশক্তি এই শান্ত পরিবেশের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে। পুনরায় লাইবেরিয়ায় গৃহযুদ্ধের ইন্ধন জোগায়। এতে একসামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং মুসলিম প্রেসিডেন্টের পতন ঘটে।

৭। ঘানা ৩০%

৮। নিউ গিনি ৩৫%

৯। মরিশাস ২০%

১০। বুরুন্ডি ২৫%

১১। কঙ্গো ২০%

১২। জায়ার ১০%

পরিশিষ্ট

১ম পরিশিষ্ট

মুসলিমদের সভ্যতাবিষয়ক অবদান

২য় পরিশিষ্ট

ইসলামবিরোধী সংগঠনসমূহ

৩য় পরিশিষ্ট

শিক্ষা ও উপদেশ

মুসলিমদের সভ্যতাবিষয়ক অবদান

মুসলিম জাতি বিশ্বের বুকে জান্নাতি বিধান আনয়নের পাশাপাশি জগৎকে ভরিয়ে তুলেছিল তাদের অনবদ্য সব অবদানে। আল্লাহর বিধান পালনে সহায়তা এবং সৃষ্টির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের জন্য মুসলিম বিজ্ঞানীদের যে অনন্য ভূমিকা, সে ক্ষেত্রে মুসলিম সভ্যতার সোনালি যুগ অকাট্য সাক্ষী। সেই সোনালি যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম জাতি ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিপতি। সে সময় তারা সভ্যতার উন্নয়নে একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।[২৭]

আমরা এখানে কিছু বৈজ্ঞানিক উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। বস্তুত, এগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান, গবেষণা, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ গুরুত্বসহ তাদের দায়িত্ব আদায় করেছেন।

এক. অনুকরণমূলক চর্চার বদলে যাচাই ও নিরীক্ষণ

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের গুরুত্বপ্রদানমূলক প্রাথমিক যাত্রাকাল ছিল আব্বাসি যুগ। এ সময় পূর্ববর্তী সভ্যতাসমূহের বিভিন্ন রচনা সংগ্রহ ও অনুবাদের ধারা শুরু হয়। এজন্য অঢেল অর্থসম্পদ ব্যয় করা হয়। এ সময় অনূদিত হয় গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটিসের গ্রন্থ, এরিস্টটলের *তাহলিলুল কিয়াস*, গ্যালেনের *কিতাবুত তাশরিহ*, টলেমির *বাসারিয়্যাত* ও *মুওয়াযানা*। এ ছাড়াও জলঘড়ি ও ফ্লোটিং বডি (Floating Bodies) সম্পর্কে লেখা আর্কিমিডিসের গ্রন্থসমূহ অনূদিত হয়। মোটকথা, পূর্ববর্তী সভ্যতার অসংখ্য রচনা বিলুপ্তির পথে যাওয়ার সময় মুসলিম বিজ্ঞানীরা সেগুলো রক্ষা করেন। এমনকি মানুষ যেসমস্ত উৎসগ্রন্থ বিলুপ্ত হয়ে গেছে ধারণা করে তা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল, তারা সেগুলোও খুঁজে ফিরতেন। যে কারণে আমরা দেখতে পাই, আল-বিরুনি *সিফরুল আসরার*

---

২৭. পরিমার্জিত। -সম্পাদক

নামক গ্রন্থের তালাশে চল্লিশ বছরের অধিক সময় চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। অবশেষে তিনি সেটা হস্তগত করতেও সক্ষম হন।

শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব নামক গ্রন্থের লেখিকা সিগরিদ হুংকে বলেন, 'ইউরোপিয়ানরা প্রাচীন জ্ঞানের উত্তরাধিকার পেয়েছে একমাত্র আরবদের থেকে। তাদের হাতে গ্রিক পাণ্ডুলিপিসমূহের অনুবাদ, সেগুলোর ওপর তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং (সেসব সম্পর্কে) তাদের স্বরচিত রচনা জার্মানির বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে।'

খলিফা মামুন বাগদাদে 'বাইতুল হিকমা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানে আরব শিশুরা বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করত। এর মাধ্যমে তারা সে ভাষা থেকে ভাষান্তরের যোগ্যতা লাভ করত। এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়নভার অর্পণ করা হয় খ্রিষ্টান ডাক্তার ইয়াহইয়া বিন মাসাওয়াইহ (মৃত্যু: ২৪৩ হি./৮৫৭ খ্রি.)-এর ওপর। কারণ, তিনি সুরিয়ানি ও আরবি ভাষায় দক্ষ ছিলেন।

বৈজ্ঞানিক উন্নতিসাধন ও নবপরিচ্ছদ

প্রথমে মুসলমানরা প্রাচীন জ্ঞানগুলো আয়ত্ত করে। এরপর তারা এতে উন্নতিসাধন ও গবেষণাকল্পে আত্মনিয়োগ করে। ফলে দ্রুতগতিতে তাদের বৈজ্ঞানিক উত্থান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের আসন দখল করে নেয়। সিগরিদ বলেন, 'এই মরুবাসীরা বৈদ্যুতিক গতিতে বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব ঘটিয়েছে। মরুসন্তানেরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেই বিপ্লবের পতাকা বহন করেছে দীর্ঘ আট শতাব্দীর মতো সময়।' তিনি আরও বলেন, 'আরবরা এ উত্তরাধিকার বিনা চিন্তা-গবেষণায় মেনে নেয়নি; বরং তা গ্রহণ করে তাকে নতুন সজ্জায় সাজিয়েছে।'

কিছু উদাহরণ

১. পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার

পূর্বসূরি বিজ্ঞানীদের কর্মপন্থা এরকম ছিল না। তারা এ বিষয়ে গুরুত্বরোপ করতেন না। কিন্তু মুসলমানরা শুধু তত্ত্বের ওপর সন্তুষ্ট হতে পারল না; বরং ছোট থেকে ছোট বিষয়েও তারা পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করল। যেমন, সুলতান আদদুদ্দৌলা নতুন একটি হাসপাতাল তৈরির ইচ্ছা করেন, তখন প্রসিদ্ধ ডাক্তার আবু বকর রাজিকে উপযুক্ত ও নিরাপদ স্থান নির্বাচন করার দায়িত্ব দেন। তিনি কয়েকজন বালককে ডেকে প্রত্যেকের

হাতে এক টুকরা গোশত প্রদান করেন এবং সেটাকে বাগদাদের বিভিন্ন স্থানে রেখে আসার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি লক্ষ করে দেখেন, কোন স্থানের টুকরাটি বেশিক্ষণ ভালো ছিল। তারপর হাসপাতালের জন্য তুলনামূলক নিরাপদ স্থানটি নির্বাচন করেন। এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে, সাধারণ একটি পরীক্ষার মাধ্যমে আবু বকর রাজি রোগজীবাণুমুক্ত স্থান নির্বাচন করলেন।

হাসান বিন হাইসাম তার গবেষণা ও পরীক্ষার মাধ্যমে টলেমি ও ইউক্লিডের ভুল চিহ্নিত করে বলেন, তাদের উভয়ের মতে চক্ষু বস্তুসমূহের ওপর আলো প্রেরণ করে। আর সেটিই চোখের দর্শনের কারণ। কিন্তু সঠিক হলো এর বিপরীতটি। অর্থাৎ, দর্শনযোগ্য বস্তুই চোখের প্রতি আলো প্রেরণ করে। আর চোখের পর্দা সেই আলোকে স্বাগত জানায়। ফলে এর দ্বারা বস্তু দেখা যায়।

ঘটনা হলো, হাসান বিন হাইসাম একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসেন। কিন্তু সেখানে তিনি কোনোকিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। এরপর তিনি প্রকোষ্ঠের একটি বস্তুতে আলো ফেলেন, তখন সেই বস্তুটি দেখতে পান। এতে বুঝা গেল, যদি চক্ষু আলো বিকিরণ করত, তাহলে আমরা অন্ধকারেও দেখতে পেতাম। অথচ বস্তুর ওপর আলো পতিত হওয়ার পর তা থেকে আলো প্রতিবিম্বিত হলে তবেই আমরা দেখতে পাই। এতে তিনি স্বীয় পরীক্ষার ব্যাপারে আশ্বস্ত হন এবং এর আলোকে নীতি প্রণয়ন করেন।

২. সংখ্যা লিখনপদ্ধতি

তৎকালীন যুগে ইউরোপিয়ানরা সংখ্যা লিখতে অমার্জিত রোমানপন্থা ব্যবহার করত। নির্দ্রিষ্ট মানের সংখ্যাগুলো পাশাপাশি বসিয়ে উদ্দিষ্ট অংক প্রকাশ করা হতো। যেমন, আমরা যদি ১৮২৫ সংখ্যাটি রোমানপন্থায় লিখতে চাই, তাহলে এভাবে লিখতে হবে—mdcccxxv। এখানে ১০০০-এর জন্য m, ৫০০-এর জন্য d, ১০০-এর জন্য c, সুতরাং তিন c = ৩০০, ১০ এর জন্য x, সুতরাং দুই x = ২০, আর ৫ এর জন্য v। সব অক্ষর মিলিয়ে ১৮২৫ হলো। এরপর মুসলিম বিজ্ঞানীগণ এ পন্থাকে আধুনিক দশকের পন্থায় পরিবর্তন করেন, যা এখনো আমরা আরবি পদ্ধতি নামে উল্লেখ করে থাকি। এ পন্থা ০ (শূন্য) থেকে শুরু হয়, যার ওপর অঙ্কের বিন্যাস গড়ে ওঠে।

৩. জ্যোতিবিজ্ঞান

গুস্তাভ লি বোন বলেন, 'যেসব পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের ওপর ইউযজানি নির্ভর করেছেন, সেগুলোর মাধ্যমে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কার্যসম্পাদন করা যেত। কেননা, তিনি ২১ ফুট ব্যাসার্ধের এক চতুর্থাংশ সহকারে বস্তুর আকর্ষণ ও প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করতেন। যা বর্তমান যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়।'

৪. ভূগোলবিদ্যা

শরিফ ইদরিসি কর্তৃক প্রণীত উৎস ব্যতীত ইউরোপীয়দের জন্য বিশ্বের আকৃতি অনুমান করার কোনো উৎসস্থল ছিল না। তিনি পৃথিবীর আকৃতি বোঝাতে বিশাল একটি রুপোর গোলক তৈরি করেছিলেন, যা এখনও বার্লিনের জাদুঘরে বিদ্যমান। তার রচিত *নুজহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক* নামক গ্রন্থটি বর্তমানে ইউরোপের অধিকাংশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

৫. চিকিৎসাবিদ্যা

প্রাচ্যবিদ সিরয়ো বলেন, 'আবু বকর রাজি ও ইবনে সিনা তাদের রচিত চিকিৎসাগ্রন্থাদির মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ইবনে সিনা ইউরোপে "চিকিৎসক" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। সেখানকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে আনুমানিক ছয় শতাব্দী পর্যন্ত তার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। তার রচিত পাঁচ খণ্ডের গ্রন্থ *আল-কানুন ফিত তিব্ব* সেখানে অনূদিত হয়ে অনেকবার ছাপা হয়। যেহেতু ফ্রান্স ও ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে একে উৎসগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।'

৬. ফার্মাকোলজি (ওষুধবিদ্যা)

এ ক্ষেত্রে ইবনে বায়তার প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি স্পেন, মাগরিব, মিশর, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর ভ্রমণ করেন। তার রচিত গ্রন্থাবলি হলো, *আল-মুগনি ফিল আদউইয়াতিল মুফরাদা*, *আল-জামি লি-মুফরাদাতিল আদউইয়া ওয়াল আগজিয়া*, *আল-মুগরিব*। সর্বশেষ এ গ্রন্থটিতে তিনি আহার্য ও ভেষজ সম্পর্কে ২৩৩০টি অনুচ্ছেদ স্থাপন করেছেন। এতে তিনি ৩০০টি নতুন ওষুধের নাম উল্লেখ করেন, যা ইতিপূর্বে অজ্ঞাত ছিল। একপর্যায়ে তিনি ইউরোপে উদ্ভিদবিদ্যার জনক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মোটকথা, এ দীর্ঘকালে সভ্যতা বিষয়ক অবদানে মুসলমানদের কৃতিত্ব সম্পর্কে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

গুস্তাভ লি বোন বলেন, 'ইউরোপে পরীক্ষা ও পর্যক্ষেণনির্ভর প্রথম কাজ করেন বেকন। তবে বর্তমান সভ্যতার জন্য একথার স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যক যে, এ ক্ষেত্রে মূলত আরবদেরই একক কৃতিত্ব।'

সিগরিদ হোংকে বলেন, 'গ্রিক চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও কার্যকারণকে দর্শনের মাধ্যমে প্রমাণ করতে উদ্যোগী ছিল। ফলে তা তাত্ত্বিক রসায়ন এবং প্রাকৃতিক দর্শনের হাত ধরে এগিয়ে যায়। এরপর এলো আরবরা। তারাই সর্বপ্রথম সুবিন্যস্ত ও তীক্ষ্ণ নীতিমালার আলোকে পর্যবেক্ষণ শুরু করে।'

তিনি আরও বলেন, 'গোটা পাশ্চাত্য আরবজাতি ও আরব সভ্যতার কাছে ঋণী। ইউরোপসহ অন্যান্য মহাদেশের ওপর আরবদের যে ঋণ রয়েছে, তার পরিমাণ বিশাল। বহুদিন পূর্ব থেকেই ইউরোপীয়দের এ ঋণ স্বীকার করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু ধর্মীয় বিদ্বেষ ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব আমাদের চক্ষুসমূহ অন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের চোখের ওপর পড়েছে অকৃতজ্ঞতার পর্দা। যেজন্য দেখা যায়, আমরা একশটি গ্রন্থ পাঠ করলেও তার আটানব্বইটি মধ্যেই আমাদের প্রতি আরবদের অবদান সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।'

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় এটুকু বিষয় স্পষ্ট হলো যে, মানব জাতির প্রতি মুসলিম জাতির বৈজ্ঞানিক অবদান অনন্য। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রধান উদ্দীপক ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের সুখ-সাচ্ছন্দ্য আনয়ন। কিন্তু কালক্রমে মুসলমানরা যখন তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরে গেল, তখন তারা কাফেলার শেষাংশ হিসেবে পাশ্চাত্যের বর্বর সভ্যতার অনুগামী হয়ে গেল। যারা সেই জ্ঞানবিজ্ঞান ব্যবহার করছে মানবজাতির ধ্বংসের কাজে। বিজ্ঞানের এই অবাধ ব্যবহারে যাদের না আছে কোনো নীতি-আদর্শ, আর না আছে আল্লাহর ভীতি ও তার শাস্তির ভয়।

বিরল প্রতিভার অধিকারী আরও কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানীর নাম এখানে উল্লেখ করছি। বস্তুত, অবাক হতে হয় যে, এখানকার একেকজনই ছিলেন একাধিক বিষয়ে বুৎপত্তিসম্পন্ন। যেমন :

বিজ্ঞানীর নাম	জীবনকাল	যে বিষয়ে প্রসিদ্ধ
জাবির বিন হাইয়ান	(১০৩-২১০ হি./ ৭১২-৮২৫ খ্রি.)	দার্শনিক, রসায়নবিদ। কথিত আছে, তাকে 'জাবির' বলার কারণ হলো, তিনি রসায়নশাস্ত্রকে পরিশোধন করেন। তিনি এর প্রাচীন আঙ্গিক থেকে আধুনিকীকরণে অবদান রাখেন। তিনি আরব রসায়নবিদদের গুরু। তার রচনাবলি প্রায় ১৯০টি।
খোয়ারিজমি	(১৬৪-২৩২ হি./ ৭৮১-৮৪৭ খ্রি.) জন্ম খোয়ারিজমে, মৃত্যু ইরাকে।	জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ। গণিতশাস্ত্রের প্রথম সংকলক। তিনি ০ (শূন্য)-এর আবিষ্কারক। পাশ্চাত্যে তিনি গুরু গণিতবিদ হিসেবে পরিচিত।
জাহেজ	(১৬৪-২৫৫ হি./ ৭৮১-৮৬৯ খ্রি.) জন্ম ও মৃত্যু বসরায়।	সাহিত্যিক ও আলেম। বিভিন্ন শাস্ত্রে তার ৩৫০টি রচনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ দুটি হলো *আল-হাইয়াওয়ান*, *বুখালা*।
সাবেত বিন কুররা	(২২০-২৮৫ হি./ ৮৩৫-৮৯৮ খ্রি.) জন্ম হাররানে (তুরস্ক), মৃত্যু বাগদাদে।	দার্শনিক, চিকিৎসক, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ। তাকে ক্যালকুলাসের ভিত্তিস্থাপনকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্ববিষয়েই তার রচনা রয়েছে।
	(২৪০-৩১৭ হি./	জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি অর্জন

বাত্তানি	৮৫৪-৯২৯ খ্রি.) জন্ম হাররানে, মৃত্যু ইরাকে।	করেন। তাকে আরবের টলেমি বলা হয়। তিনি সূক্ষ্মভাবে সৌরবর্ষের দৈর্ঘ্য ও ঋতুসমূহের সীমা নির্ধারণ করেন। তিনিই প্রথম ত্রিকোণমিতিতে সাইন ও অতিভোজ ব্যবহার করেন।
আবু বকর রাজি	(২৫০-৩১১ হি./ ৮৬৪-৯২৩ খ্রি.) জন্ম ও মৃত্যু ইরানের তেহরানের নিকটবর্তী রায় অঞ্চলে।	দার্শনিক, চিকিৎসক, ওষুধ আবিষ্কারক, রসায়নবিদ, গণিতবিদ ও সুরকার। বলা হয়, চিকিৎসা শাস্ত্র মৃত ছিল, গ্যালেন এসে তা জীবিত করেন। এটা বিক্ষিপ্ত ছিল, রাজি এসে তা বিন্যস্ত করেন। আর ত্রুটিপূর্ণ ছিল, অবশেষে ইবনে সিনা এসে তাতে পূর্ণতা দান করেন। তার রচনা সংখ্যা প্রায় ২২৪টি।
জাহরাভি	(৩২৫-৪০৪ হি./ ৯৩৭-১০১৩ খ্রি.) জন্ম ও মৃত্যু আন্দালুসে।	মুসলিমদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম সার্জন। তার রচনা ল্যাটিনসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
বুযজানি	(৩২৯-৩৮৮ হি./ ৯৪১-৯৯৮ খ্রি.) জন্ম ইরাকের বুযজানে, মৃত্যু বাগদাদে।	গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ। সর্বপ্রথম ত্রিকোণমিতিতে অপেক্ষক ব্যবহার করেন। তিনি এতে সেক্যান্ট এবং কোসেক্যান্টও অন্তর্ভুক্ত করেন। ত্রিকোণমিতিতে তার অবদান অনস্বীকার্য।
	(৩৫৪-৪৩০ হি./	আলোকবিজ্ঞান, গণিত ও

হাসান বিন হাইসাম	৯৬৫-১০৩৯ খ্রি.) জন্ম বসরায়, মৃত্যু কায়রোতে।	জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তার দুইশরও বেশি রচনা রয়েছে। ইতিপূর্বে তার কতিপয় কৃতিত্বের আলোচনা গত হয়েছে।
আল-বিরুনি	(৩৬২-৪৪০ হি./ ৯৭৩-১০৪৮ খ্রি.) জন্ম খোয়ারিজমে, মৃত্যু ইরাকে।	দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, চিকিৎসক, রসায়নবিদ, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ। তার অনেক রচনা রয়েছে। যার পরিমাণ প্রায় ১০৮টি।
ইবনে সিনা	(৩৭০-৪২৮ হি./ ৯৮১-১০৩৭ খ্রি.) জন্ম বুখারার নিকটবর্তী এক এলাকায় এবং মৃত্যু ইরানের হামাদানে।	দার্শনিক, চিকিৎসক, রসায়নবিদ, গণিতবিদ ও কবি। চিকিৎসাশাস্ত্রে তার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আল-কানুন* বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এটা মধ্যযুগীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইউরোপের বিভিন্ন গির্জায় তার প্রতিকৃতি স্থাপিত রয়েছে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকাল্টিও তার স্মৃতিতে ভরপুর। চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তার অনেক রচনা রয়েছে।
শরিফ ইদরিসি	(৪৯৪-৫৬২ হি./ ১১০০-১১৬৬ খ্রি.) জন্ম সিউটায়, মৃত্যু সিসিলিতে।	ভূগোলবিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ বিষয়ে তার *নুজহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক* গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। তা ছাড়া তিনি ভেষজ ওষুধবিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থের নাম *আল-জামি লি-*

		সিফাতি আশতাতিন নাবাত।
ইবনে রুশদ	(৫১৯-৫৯৫ হি./ ১১২৫-১১১৯ খ্রি.) জন্ম স্পেনের কর্ডোভায়, মৃত্যু মরক্কোর মারাকেশে।	দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক। এরিস্টটলের গ্রন্থসমূহ ব্যাখ্যা করেন ও তাতে বিস্তৃতি দান করেন। আন্দালুসের রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে দায়িত্ব পান। কিন্তু কোনো কারণে রাজরোষানলের শিকার হন এবং বেশ কয়েকবার বন্দি হন। তার গ্রন্থাদি নিষিদ্ধ করা হয় এবং তার সামনেই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।
ইবনে বায়তার	(৫৯৪-৬৪৭ হি./ ১১৯৮-১২৪৯ খ্রি.) জন্ম ফ্রান্সে, মৃত্যু দামেশকে।	উদ্ভিদবিদ্যা ও ভেষজ ওষুধ প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।
আল-খাযেন	খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিজ্ঞানী। তিনি বাইজান্টাইন বংশোদ্ভূত ছিলেন।	গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, পদার্থবিজ্ঞানী ও মেকানিক। তিনি বায়ু ও পানিতে বস্তুর ওজন পরিমাপের জন্য একটি স্কেল আবিষ্কার করেন। তার হিসাব ও পরিমাপ অত্যন্ত নিখুঁত ও সূক্ষ্ম ছিল।
ইবনে নাফিস	(৬০৭-৬৮৭ হি./ ১২১০-১২৮৮ খ্রি.) জন্ম দামেশকে, মৃত্যু কায়রোতে।	চিকিৎসক, দার্শনিক, ফকিহ, মাইক্রো সারকুলেশনের আবিষ্কারক। তার ফর্মুলার ওপর নির্ভর করেই তার মৃত্যুর তিন শতাব্দীকাল পর ব্রিটিশ চিকিৎসক হারভে মেজর সার্কুলেশন আবিষ্কার করেন।

নাজমুদ্দিন মিশরি	তার জন্ম মিশরে। তিনি হিজরি ৭ম শতাব্দীর অন্যতম বিজ্ঞানী।	জামিয়া আজহারের শিক্ষানবিশ। জ্যোতির্বিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সময়সূচির গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে আরবি ভাষায় রচিত তার একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যাতে আড়াই লক্ষেরও বেশি জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল্যবান সারণী রয়েছে, যা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পাদন করা হয়েছে।
ইবনে বতুতা	(৭০৪-৭৭৯ হি./ ১৩০৫-১৩৭৭ খ্রি.) জন্ম মরক্কোর টাঙিয়ের শহরে, মৃত্যু মারাকেশে।	পর্যটক ও ভূগোলবিদ। তিনি ১,২০,০০০ কিলোমিটার পথ সফর করেছেন। এই ভ্রমণে তার ৩৮ বছর সময় কাটে।
দামিরি (কামালুদ্দিন দামিরি)	(৭৪২-৮০৮ হি./ ১৩৪১-১৪০৫ খ্রি.) জন্ম মিশরের দামিরা গ্রামে, জামিয়া আজহারে শিক্ষা গ্রহণ করে সেখানে শিক্ষকতা করেন।	জীববিজ্ঞানী, সাহিত্যিক। *হায়াতুল হাইওয়ান আল-কুবরা* তার জীবনের অনবদ্য এক রচনা। এতে একসাথে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও ফিকহের মিশ্রণ ঘটেছে।
জামশেদ	হিজরি ৯ম শতাব্দীর বিজ্ঞানী। ইরানে বেড়ে ওঠেন।	জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ। সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন। এ বিষয়ে তার বেশকিছু রচনা রয়েছে। তিনি গণিতশাস্ত্রে দশমিক ভগ্নাংশ আবিষ্কার করেন।

দুই. রচনা-সংকলন ও মুজতাহিদ-ইমামগণের প্রবাহ

(ইসলামি বিধান আহরণের সোনালি যুগ)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইনতিকালের সময় আমাদের জন্য কুরআন ও হাদিসনির্ভর নীতিমালা রেখে যান। তবে এ নীতিমালার মৌলিক উৎস কুরআন ও হাদিস থেকে সব মুসলমানই মাসআলা ও সমাধান আহরণের যোগ্যতা রাখত না। বিশেষত, প্রথম দিকে কুরআন কেবল বিশেষ কিছু মুসহাফে সীমাবদ্ধ ছিল। সেগুলো নবীজির ঘরে, পাশাপাশি কিছু সাহাবির ঘরেও বিক্ষিপ্তাকারে সংরক্ষিত ছিল। আর যৎসামান্য ছাড়া হাদিস কিছুই লিপিবদ্ধ ছিল না।[২৮]

এরপর খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে উম্মাহর ঐকমত্যে অতি বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্ম নীতি অনুসরণের মাধ্যমে কুরআন সংকলন করা হয়। এর ফলে মাসআলা আহরণের ক্ষেত্রে কুরআন পূর্ণাঙ্গ প্রত্যাবর্তনস্থলের রূপ ধারণ করে।

ইসলামি আইনকানুনের দ্বিতীয় উৎসস্থল হলো সুন্নাহ তথা হাদিস। তবে শুরুকালে সেটাও সম্পূর্ণভাবে সংকলিত ছিল না। বরং তা সংরক্ষিত ছিল প্রখর মেধার অধিকারী এক সম্প্রদায়ের বুকে। বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে যার আদান-প্রদান চলত পরস্পরের মাঝে। এভাবে দ্বিতীয় শতাব্দী প্রবেশ করে। এরপর হাদিসে-নববি সংকলনের তৎপরতা শুরু হয়। সেই যুগে যারা এ কাজের অগ্রনায়ক ছিলেন তারা হলেন, ইবনে শিহাব জুহরি (মৃ. ১২৪ হি.), ইবনে জুরাইজ (মৃ. ১৫০ হি.) ইবনে ইসহাক (মৃ. ১৫১ হি.), সুফিয়ান সাওরি (মৃ. ১৬১ হি.), মালিক বিন আনাস (মৃ. ১৭৯ হি.), ইবনুল মুবারক (মৃ. ১৮১ হি.)। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে উলামায়ে কেরাম এই বিচরণস্থলে অবতরণ করেন।

---

২৮. প্রাচ্যবিদরা এ কথাটিকে পুঁজি করে পুরো হাদিসভান্ডারের ওপর প্রশ্ন তুলে থাকে। তবে নিয়মিত পদ্ধতিতে হাদিস সংকলিত ছিল না মানে এ নয় যে, হাদিস ভান্ডার তৎকালে অবহেলায় পড়ে ছিল। বরং ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাদিস লিপিবদ্ধকরণের ধারা তখনও অব্যাহত ছিল। এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তৎকালীন যুগে তথ্যগত বিষয়াদি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যেই মৌলিক পন্থা ব্যবহারের রীতি ছিল তথা মুখস্থশক্তির চর্চা, সে পদ্ধতিতে হাদিস পুরোপুরিই সংরক্ষিত ছিল। হাদিসের সংরক্ষণপদ্ধতি ও তাদবিনে হাদিস (হাদিস লিপিবদ্ধকরণ) সংক্রান্ত বিভিন্ন বইপুস্তক লেখা হয়েছে প্রাচ্যবিদদের আপত্তি খণ্ডনে। সেখানে উলামায়ে কেরাম তাদের সকল আপত্তি অপনোদন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। বাংলা ভাষায়ও সে সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তক রয়েছে। সেখান থেকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা ও জবাব দেখে নিতে পারি। -সম্পাদক

এরপর ঐশী অভিপ্রায়ে হাদিস সংকলনের জন্য একদল তালেবে ইলমের প্রবাহ সৃষ্টি হয়, যাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। যারা তাদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, কঠোর সাধনা, ধৈর্য, প্রখর মেধাশক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অনারব দেশসমূহ থেকে সবেগে ছুটে এসেছিল তাদের মিছিল। তারা সবকিছু ভুলে একনিষ্ঠ মনে হাদিস সংকলনে প্রবৃত্ত হন। তারা পৃথিবীর দিকে দিকে চষে বেড়ান এবং হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনা ও বিশুদ্ধ সূত্রের তালাশে কান পেতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে তাদের এই পরিমাণ তৃষ্ণা ও অনুরাগ ছিল যে, জ্ঞানপিয়াসু কোনো জাতির ইতিহাসেই তা পরিলক্ষিত হয় না। পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মুহাদ্দিসগণের ভ্রমণের প্রতি লক্ষ করলে আমাদের দাবি অতি সহজেই প্রমাণিত হয়ে যায়।

বর্ণিত আছে, *সহিহ বুখারি* প্রণেতা ইমাম বুখারি (মৃ: ২৫৬ হি.) চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই শিক্ষা সফর শুরু করেন। তিনি বুখারা থেকে মিশর পর্যন্ত সকল শহর ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার হাদিসের শাইখদের থেকে হাদিস আহরণ করেন।

ইমাম আবু হাতেম (মৃ: ২৭৭ হি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আমার প্রথম সফরে সাত বছর অবস্থান করি। এতে পায়ে হেঁটে এক হাজার ফরসাখের[২৯] বেশি অতিক্রম করি। এরপর হিসাব রাখা বাদ দেই। আমি বাহরাইন থেকে মিশর পর্যন্ত, এরপর রামাল্লা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে, এরপর তারাতুস পর্যন্ত ভ্রমণ করি। তখন আমার বয়স ছিল বিশ বছর।

আন্দালুসের মুহাদ্দিস ইবনে হাব্বুন (মৃ. ৩০৫ হি.) আন্দালুস, ইরাক, হেজাজ, ইয়ামেন প্রভৃতি স্থানে হাদিস সংগ্রহের জন্য গমন করেন। এমনইভাবে তানজা হয়ে মিশর পর্যন্ত অতিক্রম করেন, লোহিত সাগর পাড়ি দেন।

এ নিষ্ঠাবানদের কর্ম প্রচেষ্টা শুধু হাদিস সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাদের চর্চা-গবেষণা হাদিসশাস্ত্রের প্রতিটি শাখাকেই বেষ্টন করে নেয়। তারা হাদিসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে

---

[২৯]. এক ফরসাখে তিন মাইল হয়। সুতরাং এক হাজার ফরসাখে তিন হাজার মাইল বা চার হাজার আটশ কিলোমিটার হয়। -সম্পাদক

পরম অবদান রাখেন। এজন্য তারা 'জরাহ-তাদিল/আসমাউর রিজাল' নামক একপ্রকার শাস্ত্রের জন্ম দেন। এ শাস্ত্রে হাদিস বর্ণনাকরী ব্যক্তিবর্গের বিশ্বস্ততা নির্ণয়ের জন্য তাদের জীবনী পর্যালোচনা করা হতো।

বস্তুত, এ শাস্ত্রটি হচ্ছে আমাদের জাতীয় গৌরব। এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ইতিহাস অন্য কোনো জাতির অর্জনে নেই। ড. স্প্রেঞ্জার *আল-ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদে ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেন, 'ইতিহাসে এমন কোনো জাতির পরিচয় পাওয়া যায় না (বর্তমানেও না), যারা "আসমাউর রিজাল" শাস্ত্রের মতো একটি শাস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমানদের এ অবদানেই আজ আমরা প্রায় পাঁচ লাখ লোকের জীবনী ও চরিত জানতে সক্ষম হয়েছি।"

মোটকথা, পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম 'জরাহ-তাদিল' শাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে কোনো বিষয় এড়িয়েও যাননি এবং কাউকে ভয়-সংকোচও করেননি। সুতরাং, তারা কাউকে দুর্বল (দয়িফ) বলেছেন, আবার কাউকে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এটা যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহামূলবান হাদিস! এ কারণে হাদিস বর্ণনাকারীদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা ছিল নিতান্ত অপরিহার্য; সকলের কাছে স্পষ্ট করা প্রয়োজন ছিল যে, সেই বর্ণনাকারী কি মিথ্যাবাদী, নাকি সত্যবাদী। তার মুখস্থশক্তি কি শক্তিশালী, নাকি দুর্বল? তার স্বভাবচরিত্র কেমন? এভাবে যাচাই করে তবেই তারা হাদিসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন।

এরূপ নিবিড় পর্যবেক্ষণের আলোকেই হাদিস সংকলনের এ মহান দায়িত্ব পালন করেছে আমাদের জাতি। এর ফলস্বরূপ আমাদের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশুদ্ধ হাদিসগুলো সংকলিত ও গ্রন্থবদ্ধ হয়ে যায়।

সেগুলোর প্রথম কাতারেই রয়েছে সর্বজন উলামা গৃহীত সাতটি গ্রন্থ। যথা : ১. *সহিহ বুখারি*, ২. *সহিহ মুসলিম*, ৩. *মুয়াত্তা মালেক*, ৪. *সুনানে তিরমিজি*, ৫. *সুনানে আবু দাউদ*, ৬. *সুনানে নাসায়ি*, ৭. *সুনানে ইবনে মাজাহ*।

তবে এগুলোর মধ্যে ইমাম বুখারি রহ. প্রণীত *সহিহ বুখারি* গ্রন্থটি বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তার পরপরই হচ্ছে ইমাম মুসলিম রহ. প্রণীত *সহিহ মুসলিম*।

ফিকহ সংকলন

এরূপ সূক্ষ্ম নীতিমালার আলোকে কুরআন ও হাদিস সংকলিত হওয়ার পর মুজতাহিদিন ও ফুকাহায়ে কেরামের জন্য শরিয়তের উৎসদ্বয় খুবই সহজলভ্য হয়ে দাঁড়ায়। এরই ধারাবাহিকতায় তারা ফিকহ সংকলনেরও উৎসাহ অনুভব করেন।

এ কাজের জন্য ঐশী অভিপ্রায় বিজ্ঞ ও দক্ষ মনীষীদের নির্বাচন করে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চার ইমাম। যথা : ১. ইমাম আবু হানিফা রহ. (মৃ. ১৫০ হি.), ২. ইমাম মালেক রহ. (মৃ. ১৭৯ হি.), ৩. ইমাম শাফিয়ি রহ. (মৃ. ২০৪ হি.), ৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. (মৃ. ২৪১ হি.)। তাদের ফিকহের কারণে তারা আজও অমর। ইলমের জন্য তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। একে তারা সকল প্রকার সুখ, শান্তি ও ধনসম্পদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নিকট দুই-দুইবার প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এর জেরে অবশেষে কারাগারেই তার ইনতেকাল হয়।

ইমাম মালেক রহ.-কে এক মাসআলার ক্ষেত্রে দুইশত বেত্রাঘাত করা হয়। তার উভয় স্কন্ধ থেকে কাপড় খুলে নেওয়া হয়। কারণ, তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, জোরপূর্বক তালাক দেওয়া হলে তা কার্যকর হয় না।

ইমাম শাফিয়ি রহ. তার জীবনের অধিকাংশ সময় দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতায় অতিবাহিত করেন। তিনি নিজের সুস্থতা ও জীবনীশক্তিকে কুরআন-হাদিস থেকে মাসআলা আহরণ ও ফিকহ সংকলনের স্বার্থে ব্যয় করে দেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ আকিদা সংরক্ষণের খাতিরে তৎকালীন বৃহৎ সাম্রাজ্য আব্বাসি খেলাফতের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। যে কারণে তাকে জেলজুলুম ও কঠিন নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়।

তাদের প্রত্যেকেই একেকটি ইলমি বিপ্লব সাধন করেছেন। তাদের সমৃদ্ধ ফিকহি উত্তরাধিকারের মাধ্যমে আমাদের সময়ের বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ জ্ঞানের আলোকবিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে। বর্ণিত আছে, ইমাম আবু হানিফা রহ. ষাট হাজার মাসআলা বলেছিলেন। ফিকহ শাস্ত্রে এমনই অবস্থান রয়েছে ইমাম মালেক রহ.-এরও। তার থেকে বর্ণিত মাসায়েলের ফিকহ সংকলন *আল-মুদাওয়ানাহ* গ্রন্থ ছত্রিশ হাজার মাসআলা সন্নিবেশ

করে। সাত খণ্ডবিশিষ্ট ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর *আল-উম্ম* গ্রন্থে রয়েছে প্রচুর মাসআলা। কতিপয় আলেম ইমাম আহমাদ রহ.-এর মাসআলাসমূহ মোট চল্লিশ খণ্ডে সংকলন করেছেন। যার নাম দিয়েছেন তারা *আল-জামি লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ*।

এরপর তাদের শিষ্যদের নিকট অসংখ্য ফুকাহায়ে কেরাম শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারা হলেন এ অমর উম্মাহর মহান জ্ঞান-ভান্ডার।

তিন. ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের বাস

এ বিষয়ে মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী :

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালিম। [সুরা মুমতাহিনা : ৮-৯]

এ আয়াতে যুদ্ধে লিপ্ত নয়, এমন অমুসলিমদের সাথে আচার-আচরণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

শরিয়তের পরিভাষায়, ইসলামি দেশে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের 'জিম্মি' বলা হয়। আর জিম্মা অর্থ হচ্ছে, আশ্রয়, দায়িত্ব, নিরাপত্তা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে একজন জিম্মি সাধারণ নাগরিকদের মতোই দেশের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে। পাশাপাশি, মুসলিম নাগরিকদের মতো দেশের দায়িত্বগুলোও তার ওপর বর্তাবে।

জিম্মিদের অধিকার

১. তাদেরকে বহিরাগত শত্রু থেকে রক্ষার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য।

২. অভ্যন্তরীণ জুলুম-অত্যাচার থেকে রক্ষা করা। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো জিম্মিকে কষ্ট দিলো, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিলো, আর যে আমাকে কষ্ট দিলো, সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিলো!

৩. তাদের জান-মাল-ইজ্জত রক্ষা করা। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো (কাফের) লোককে হত্যা করল, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

৪. অপারগতা ও বার্ধক্যে নিরাপত্তা দেওয়া।

৫. ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। (এটি বোঝার জন্য 'আল-কুদস চুক্তি' ও আনুষঙ্গিক আলোচনা দেখুন।)

৬. কর্ম ও উপার্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান।

৭. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও চাকরিবাকরিতে নিয়োগদান। তবে যেসব পদে ধর্মীয় সম্পর্ক বেশি, সেখানে অনুমতি নেই। যেমন : দেশের নেতৃত্ব, সেনা পরিচালনা, বিচারক হওয়া, জাকাত বিভাগ দেখাশোনা ইত্যাদি। নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ ছাড়া অন্যান্য পদে তাদের নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। তবে শর্ত হলো, যোগ্যতা থাকা এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে আদায় করা। সুতরাং, মুসলিমবিদ্বেষীদের এ ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া হবে না।

জিম্মিদের দায়দায়িত্ব

১. জিযিয়া, খারাজ ও ব্যবসায়িক শুল্ক আদায় করা।

২. নাগরিক আইন, অপরাধের শাস্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মুসলমানদের মতো ইসলামি আইনকানুন মেনে চলা। তবে জাকাত বা এ জাতীয় ইবাদত বিষয়ক কোনো ব্যাপারে তাদের জন্য ইসলামি আইন মানা আবশ্যক নয়। বরং, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে তারা তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ীই জীবনযাপন করতে পারবে।

৩. মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি ও মর্যাদাপূর্ণ বিষয়াদির মূল্যায়ন করা আবশ্যক। সুতরাং, তাদের জন্য ইসলাম ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়ার ছাড় নেই। মুসলমানদের নিকট মদ বিক্রি করার বৈধতা নেই। তবে তাদের ধর্মে অনুমোদিত কাজ তারা করতে পারবে; যদিও ইসলাম তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু হইচইয়ের সাথে এবং জনগণের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, এমনভাবে হতে পারবে না।

অমুসলিমদের ব্যাপারে এ মহানুভবতা মুসলিমদের নিকট সভ্যতায় শুধু মতাদর্শ ও কাল্পনিক আইন হিসেবে বিবেচিত নয়; বরং বাস্তবে এর যথাযথ প্রয়োগও পাওয়া যায় পুরো কালজুড়ে। আপনারা যদি নিম্নের গ্রন্থটি পাঠ করেন, তাহলে এর বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে পারবেন।

আমিরুল বয়ান (সাহিত্য সম্রাট) শাকিব আরসালান *আল-হাজিরুল ইসলামি* গ্রন্থের টীকায় বর্ণনা করেন, 'সুলতান সেলিম যখন দেখলেন, খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা উসমানি সাম্রাজ্যে কয়েক মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে, আর তা বছরকে বছর বেড়েই চলছে, তখন তিনি চিন্তা করলেন, এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যার মাধ্যমে তাদের বৃদ্ধি কমানো যায়। সুতরাং, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলা হবে, নয়তো উসমানি রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হবে। কিন্তু এ সংবাদ যখন উসমানি শাইখুল ইসলাম আফিন্দি যাম্বিলি রহ.-এর নিকট পৌঁছে, তখন তিনি সুলতানের বিরোধিতা করে সুলতানকে বললেন, "এ সমস্ত খ্রিষ্টান ও ইহুদির থেকে জিযিয়া আদায় ব্যতীত আমাদের অন্য কোনো পন্থা গ্রহণের সুযোগ নেই। যতদিন তারা জিযিয়া আদায় করবে, ততদিন তাদের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা দিতে হবে এবং তাদের উপাসনা ও আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও নির্বিঘ্ন পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে। সুতরাং, তাদের ধর্মের ব্যাপারে তাদের বিরক্ত করা অথবা তাদের ঘরবাড়ি থেকে তাদের বহিষ্কার করার কোনো অধিকার আপনার নেই।" তার এ আপত্তি ও বিরোধিতার মুখে সুলতান সেলিম ইসলামের বিধানের সামনে মাথানত করে তার আপত্তি মেনে নিলেন।'

ইসলামবিরোধী সংগঠনসমূহ

এক. মিশনারি তৎপরতা

খ্রিষ্টান সমাজ ইসায়ি ধর্মশিক্ষা ও তার প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে মিশনারি পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকে।

উৎপত্তি

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমের এক কনফারেন্সে খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রধান স্যামুয়েল ম্যারিনাস যুয়েমার সমগ্র বিশ্বের মিশনারিদের প্রতি মিশনারি তৎপরতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেন :

'হে বীর সাহসী সাথি ভাইয়েরা, আল্লাহ আপনাদেরকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জিহাদে নিয়োজিত করেছেন। আপনাদেরকে মুসলিমবিশ্বে তা প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগের সৌভাগ্য দিয়েছেন। ফলে আপনাদের ঘিরে আছে প্রভুর পক্ষ হতে মহান ও পবিত্র সফলতার নিশ্চয়তা। এর মধ্যে আপনারা নিজ দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে ও কার্যকরভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে আমার মনে হচ্ছে, এ দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা সত্ত্বেও আপনাদের অনেকে এর চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুধাবনে সক্ষম হননি। আমি আপনাদের অবগত করছি, যেসব মুসলমান খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে, তারা কখনও প্রকৃত মুসলমান ছিল না। বরং তারা হলো নিম্নবর্ণিত তিনশ্রেণির একশ্রেণি :

১. অল্পবয়স্ক। যার পরিবারে এমন কেউ নেই, যে তাকে ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

২. যার কাছে ধর্ম গুরুত্বহীন। সে কেবল তার জীবিকা জোগাতেই ব্যতিব্যস্ত থাকে। তার দারিদ্র্য ও জীবনোপকরণের অভাব বড় বেশি।

৩. সে (ধর্ম-কর্ম বিসর্জন দিয়ে) যেকোনো মূল্যে নিজের কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে চায়।

কিন্তু খ্রিষ্টানবিশ্ব আপনাদেরকে মুসলিমবিশ্বে যে গুরুদায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছে, সেটা মুসলমানদেরকে খ্রিষ্টান বানানো নয়। এটা তো তাদের জন্য পথপ্রাপ্তি ও সম্মানের বিষয়। বরং আপনাদের মূল দায়িত্ব হলো, মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে এমনভাবে বের করে ফেলা যে, তাদের সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্কই বাকি থাকবে না। পাশাপাশি তাদের এমন কোনো নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সাথেও সম্পর্ক থাকবে না, যার ওপর ভিত্তি করে কোনো জাতি টিকে থাকে। এরূপ করতে পারলে তবেই আপনারা মুসলিমদের রাজ্যে খ্রিষ্টবাদ প্রতিষ্ঠার সূচনা করতে সক্ষম হবেন। বিগত শতাব্দীতে এ কাজটি আপনারা সর্বোত্তমভাবে সম্পন্ন করেছেন। পুনরায় এ কাজে সক্ষম হলে তবেই আপনারা আমার এবং সমগ্র খ্রিষ্টবিশ্বের পক্ষ হতে অভিনন্দনমাল্যে বরিত হবেন।

হে ভাইয়েরা, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে নিয়ে আজ দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে আমরা শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে আসছি। সেসব অঞ্চলে আমরা ইউরোপ-আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত অনেক মিশনারি কার্যালয়, গির্জা ও খ্রিষ্টান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রিয় সাথিবৃন্দ, আমাদের লক্ষ্য সফলে সমস্ত অবদান একমাত্র আপনাদের। কারণ, আপনারাই নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও উপায়-উপকরণের মাধ্যমে মুসলিমদেশের বুদ্ধিজীবি ও এলিটশ্রেণিকে আপনাদের সৃষ্ট পথে চলতে প্রস্তুত করে তুলেছেন।

আপনারা মুসলিমরাষ্ট্রে এমন যুবকশ্রেণি তৈরি করতে পেরেছেন, যাদের না আছে আল্লাহর সাথে কোনোপ্রকার সম্পর্ক, না এর প্রতি কোনো ধরনের আবেগ-আগ্রহ। আপনারা মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশ না করানো সত্ত্বেও তাদেরকে ইসলাম থেকে পুরোপুরি বের করে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন! পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত এক মুসলিম প্রজন্ম গড়ে উঠেছে। জীবনের মহৎ কোনো লক্ষ্য নেই এদের। আরাম-আয়েশ আর অলসতার মাঝেই জীবন কাটাতে চায় এরা। পার্থিব ক্ষেত্রেও কেবল প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারেই তাদের তোড়জোড়। অর্থসম্পদ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও কেবল কামনাবাসনা পূরণের আশা, আবার উচ্চপদে আসীন হলেও সেই একই উদ্দেশ্যে তাদের বৈধ-অবৈধ সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা।

আপনাদের দায়িত্বপালন ও কার্যক্রম উত্তমরূপে পূর্ণতা পেয়েছে। আপনারাও এতে সর্বোত্তম ফলাফল অর্জন করেছেন। খ্রিষ্টবাদের পক্ষ

থেকে আপনাদের ওপর বরকত অবতীর্ণ হোক, মুসলিমদেশসমূহে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার মঙ্গলময় হোক।

মোটকথা, আপনাদের মিশনারি কার্যক্রম অব্যাহত রাখুন। এ কল্যাণময় জিহাদের বদৌলতে নিশ্চয় আপনারা স্বীয় রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত হয়েছেন।"

খ্রিষ্টান মিশনারিদের আন্তর্জাতিক সংস্থা ১৯৯১ সালে তাদের মিশন ও পুরো বিশ্বে তাদের কর্মতৎপরতা নিয়ে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। সেখানে এসেছে :

খ্রিষ্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠান ও সেবা সংস্থার সংখ্যা বর্তমানে ১,২০,৮৮০-টিতে পৌঁছেছে। খ্রিষ্টান মিশনারিকাজে যুক্ত গির্জাসমূহের আয় হয়েছে ৯,৩২০ বিলিয়ন ডলার। আর মিশনারি প্রকল্পসমূহে ব্যয় হয়েছে ১৬৩ বিলিয়ন ডলার। এ ছাড়াও বৈদেশিক মিশনারিদের আয় হয়েছে ৯.৮ বিলিয়ন ডলার। রিপোর্টটি আরও উল্লেখ করে, তথ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য ৮২ মিলিয়ন কম্পিউটার তাতে ব্যবহার করা হয়। ইতিমধ্যে খ্রিষ্টবাদ প্রচার-প্রসারে ৮৮,১৬০টি বই ও ২৪,৯৯০টি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়েছে। বিনামূল্যে ৫৩ মিলিয়ন ইনজিল (বাইবেল) বিতরণ করা হয়েছে। কেবল খ্রিষ্টান মিশনারি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রেডিও ও টেলিভিশন চ্যানেল আছে ২,৩৪০টি। মোটাদাগে হিসাব করলে আমরা দেখি, মিশনারি খাতে খরচের পরিমাণ ১৮১ বিলিয়ন ডলার।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের পরিচালিত যুদ্ধে তারা পরাজিত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় তাদের মিশনারি তৎপরতা শুরু হয়। খ্রিষ্টান ফাদার মিবাজ বলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে আমাদের ধর্মগুরুদের শুরু করা শান্তিপূর্ণ ক্রুসেডযুদ্ধ আজও চলমান।

মিশনারিদের কর্মতৎপরতা বেশি প্রকাশ পেয়েছে দারিদ্র্যপ্রবণ দেশসমূহে। যেমন : ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফ্রিকা। তারা তাদের চিন্তাধারা প্রসারের ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে সামাজিক সেবাসমূহের আড়ালে কাজ করে থাকে।

দুই. ধর্মনিরপেক্ষতা

রাষ্ট্র বা জীবনব্যবস্থা থেকে ধর্মকে অপসারণ করার ওপর যে দর্শন গড়ে উঠেছে, তাকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে

ফরাসি বিপ্লবের সময় এ দর্শনের উৎপত্তি হয়। এটি মূলত ইহুদিদের তৈরি একটি চিন্তাধারা।

আমেরিকান লেখক উইলিয়াম গায়কার বলেন, 'রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে অপসারণ করার পেছনে মূল কারিগর হলো ইহুদিরা।'
তার এ কথাটি শক্তিশালী হয় *প্রটোকল*-এর ভাষ্য সামনে রাখলে। সেখানে বর্ণিত হয়েছে, 'কয়েক বছর যেতে না যেতেই আমরা খ্রিষ্টবাদের মৃত্যুক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আর অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে কেবল সামান্য প্রচেষ্টা দরকার; এরপর সেগুলোও খ্রিষ্টবাদের পতনপথের অনুসরণ করবে। শীঘ্রই দ্বীন ও দ্বীনের হর্তাকর্তারা সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ হয়ে যাবে। এভাবে একপর্যায়ে তাদের সকল প্রভাব-প্রতিপত্তিও বিলীন হয়ে যাবে।'

মোটকথা, ইউরোপিয়ানরা তাদের বিজ্ঞানবিরোধী ভ্রষ্ট-বিকৃত ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এতে তারা উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে। কিন্তু এগুলো দেখে একদল অজ্ঞ মুসলিম ভাবতে থাকে, তাদের অনুকরণ করে ধর্মকে জীবনব্যবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে তারাও বুঝি অনুরূপ অগ্রগতি লাভ করতে পারবে। ইউরোপীয় সভ্যতা তাদেরকে খুব মুগ্ধ করে। ফলে তারাও ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ গ্রহণ করে নেয়।

আরব ও মুসলিমবিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা

মিশর : ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে খেদিভ ইসমাইল মিশরে ফরাসিদের প্রণীত ধর্মনিরপেক্ষ আইন চালু করে।

ভারত : ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক আইনকানুন চালু ছিল। এরপর ইংরেজদের কূটকৌশলে তা রহিত করার তৎপরতা শুরু হয়। পরিশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাদের মিশন সফল হয়।

আলজেরিয়া : ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের আক্রমণ ও দখলদারি প্রতিষ্ঠার পর আলজেরিয়া থেকে শরয়ি আইন বিলুপ্ত করা হয়।

তিউনিসিয়া : ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিউনিসিয়ায় ফরাসিদের ধর্মনিরপেক্ষ আইন চালু হয়।

তুরস্ক : ইসলামি খিলাফতব্যবস্থা বিলুপ্ত করার পর সকল ইসলামি নিদর্শন মুছে ফেলা হয়। তদ্রূপ, কিছুদিন যেতে না যেতেই ইসলামি সমাজটি

ধর্মনিরপেক্ষতার রঙে বিকৃত হয়ে যায়। বস্তুত, পাশ্চাত্য চিন্তাচেতনায় প্রভাবিত দেশের চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবি ও ইউরোপীয় ঝলকে ধাঁধাগ্রস্ত ধর্মীয় শিক্ষিতদের কারণে পুরো সমাজের দৃশ্যপট ও চিন্তাচেতনাই আমূল পাল্টে যায়।

তিন. ফ্রিম্যাসনরি

الماسونية বা ফ্রিম্যাসনরি শব্দটির অর্থ হলো, স্বাধীন নির্মাতাগণ। এর দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়, যারা সুলাইমান আ.-এর উপাসনালয় (সলোমন'স টেম্পল) তৈরি করেছিল। এই ফ্রিম্যাসনরা মূলত ইহুদিদের অত্যন্ত গোপনীয় ও সুশৃঙ্খল একটি সন্ত্রাসী সংগঠন, যারা বিশ্বে ইহুদি নেতৃত্ব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

তাদের বাহ্যিক স্লোগান বেশ চাকচিক্যময়। যেমন :

- বংশগতভাবে স্বাধীন, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, অসত্যের সংহারক ও সত্যের সহায়ক—এমন গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউ ফ্রিম্যাসনের সদস্য হতে পারবে না।
- ফ্রিম্যাসনরি সমাজে স্বাধীনতা, সমতা ও মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আহ্বান করে।

কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে একটি ইহুদি সংগঠন। যাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূলোৎপাটন, পাপাচার ও নিকৃষ্ট কর্মসমূহের বৈধতাদান এবং বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র পরিচালনা।

সদস্য বানানোর পন্থা

তাদের টার্গেটকৃত ব্যক্তির জন্য তারা অর্থ, ঘুষ ও নারী ব্যবহার করে থাকে। তারা গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের টার্গেট করে তার চারপাশে জাল বিছিয়ে দেয়। যেন তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তাকে নিজেদের ইচ্ছেমতো চালানো যায়। যখন সে তাদের পাতা ফাঁদে পা দেয় তখনই তাদের জাল গুটিয়ে নেয়। তাকে তারা সকল প্রকার ধর্মীয়, চারিত্রিক ও ভৌগোলিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক রাখার শর্তারোপ করে। এতে যদি কেউ পিছুটান দেখায় বা বিরোধিতা করে, তাহলে জাতির সামনে তাকে চরমভাবে অপদস্থ করার ব্যবস্থা করে কিংবা কখনো এর পরিণাম হয় মৃত্যু।

নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি সম্পন্ন হয় অত্যন্ত ভয়ানকভাবে। প্রথমে তাকে চোখবাঁধা অবস্থায় তাদের নেতার নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। গোপন বিষয় সংরক্ষণের ব্যাপারে তার থেকে শপথ নেওয়া হয়। এরপর তার চক্ষু খোলা হয়। চোখ খোলামাত্রই ঘাড়ের পাশে অনেক নাঙ্গা তরবারি দেখে সে হতবিহ্বল হয়ে যায়। এরপর তার সামনে রাখা হয় বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট। আর পাশে থাকে অন্ধকার একপ্রকোষ্ঠ, যেখানে অনেক মাথার খুলি ও কাঠের তৈরি প্রকৌশলী আসবাবপত্র থাকে। এগুলো নতুন সদস্যের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই ফ্রিম্যাসনদের উপস্থিতি রয়েছে। তারা প্রতিটি দেশের প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জিম্মি করে সেখানে তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে।

ফ্রিম্যাসন থেকে নির্গত শাখাপ্রশাখা

রোটারি বা রোটারি ক্লাব। এ নামটি التناوب (In rotation) শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ পরম্পরা, ঘূর্ণায়ন। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সদস্যদের কার্যালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয় বিধায় এর নাম রোটারি রাখা হয়েছে।

এরা চিন্তাচেতনা ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে ফ্রিম্যাসনদের মতো। কিন্তু উভয় দলে মাঝে পার্থক্য হলো, ফ্রিম্যাসনদের নেতৃত্ব ও তার প্রধানের নাম জানা যায় না, বিপরীতে রোটারি ক্লাবের নীতিমালা ও এর প্রতিষ্ঠাতাসহ তাদের অনেক কিছুই জানা যায়। ১৯০৫ সালে আমেরিকায় এ ক্লাবটির যাত্রা শুরু হয়। অতঃপর বিশ্বের অধিকাংশ দেশে তার শাখা গঠন করা হয়।

রোটারির মতো এমন আরও কিছু ক্লাব পাওয়া যায়। অল্প কিছু পার্থক্য বাদে মৌলিকভাবে সবগুলো একইরকম কাজ করে। বিষাক্ত চিন্তা ও নোংরা সভ্যতা প্রচারের উপায়-উপকরণ নানারকম হওয়ায় ক্লাবের সংখ্যাও বেড়েছে; যদিও মূলে সব এক। এরকম কয়েকটি ক্লাব হলো :

লায়ন্স ক্লাব : এর অর্থ সিংহসমূহ। ১৯১৫ সালে এটি গঠিত হয়।

বনাই ব্রিথ সোসাইটি : অর্থ চুক্তিবদ্ধ সংঘ। অনেক পুরাতন ক্লাব। ১৮৪৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফ্রিম্যাসন ও এর শাখা সংগঠনগুলো তাদের গোপন কর্মতৎপরতা ঢেকে রাখার জন্য প্রকাশ্যে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম ও চমৎকার সব স্লোগান ব্যবহার করে থাকে।

চার. জায়নিস্ট ইহুদিবাদ

২৯ আগস্ট, ১৮৯৭ সালে বিশ্বের তিনশ গোড়া ইহুদি সুইজারল্যান্ডে বাসেলের একটি হোটেলে সমবেত হয়। তাদের নেতৃত্ব দেয় অস্ট্রিয়ান ইহুদি সাংবাদিক থিওডোর হার্টজেল। সে জায়নবাদি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তাদের এ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ও আলোচ্যবিষয় ছিল, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদিদেরকে একটি দেশে সমবেত করা এবং তাদের জন্য স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। হার্টজেল সবাইকে জানায়, আগামী পাঁচ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে। তার কথা অনুযায়ী জায়নবাদী আন্দোলন সফল হয়ে ১৯৪৮ সালে অর্থাৎ ৫০ বছর পর ইহুদিরাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক্ষেত্রে সংগঠনটির মূল টার্গেট ছিল, ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য কমন ল অনুযায়ী একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এটি বাস্তবায়নের জন্য তারা চারটি মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে :

১. উপযুক্ত পথের আশ্রয়ে প্রথমে ইহুদি কৃষক ও কারিগরদের মাধ্যমে ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি স্থাপন করা।
২. আন্তর্জাতিক জায়নিস্ট সংগঠন তৈরি করা, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের আইনকানুন মেনে নিয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখবে।
৩. ইহুদি জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেনতা পুষ্ট করা।
৪. জায়নবাদী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরকারি পদসমূহ অর্জনের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

মোটকথা, জায়নবাদীরা তাদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে বিশ্বে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে হাঁটছে। তারা নিজেদের কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবিরত কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তারা বৃহত্তর দেশগুলোকে নিজেদের অনুকূলে আনার মাধ্যমে বৈশ্বিক বৃহৎ শক্তি দ্বারা সহায়তা নিতে সচেষ্ট। স্পষ্ট করে বললে, তারা সেসমস্ত দেশের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে (যেমন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংবাদমাধ্যম)

নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের সর্ববৃহৎ শক্তিটির বাগডোর তাদের অধীনস্থ করতে চায়। বস্তুত এ কারণেই, নিজেদের মিশন বাস্তবায়নের পথে হাঁটা এ জায়নবাদী সংগঠনকে প্রচ্ছন্ন সরকারের মতো মনে করা হয়। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা তাদের প্রথম উদ্দেশ্যে সফলও হয়ে গেছে। তদ্রূপ, বৃহত্তর দেশগুলোর নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে প্রবেশের মাধ্যমে তারা তাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যেও বিজয়ী হয়েছে। এই পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হওয়ায় তারা তাদের জবরদখলীকৃত রাষ্ট্র ইসরাইলের জন্য বাগিয়ে নিয়েছে আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতা।

আমরা যদি তাদের যাত্রাপথের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখতে পাব, তারা প্রথমদিকে ব্রিটিশদের ওপর নির্ভর করে, যারা তাদেরকে 'বেলফোর অঙ্গীকার' দেয় এবং আরব সৈনিকদের কবল থেকে রক্ষা করে। অনুরূপ তারা ফ্রান্সের ওপরও ভরসা করে, যারা তাদেরকে প্রথম পারমাণবিক চুল্লি সরবরাহ করে এবং সে সময়ের ভারী ভারী অস্ত্রের জোগান দিয়ে সাহায্য করে; বিশেষ করে জঙ্গিবিমান। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর-পরই তারা আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্র কংগ্রেস ও হোয়াইট হাউজে তাদের সমস্যা উত্থাপন করে। এভাবে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকল। যদি আমেরিকা তাদেরকে সহায়তা না করত, তাহলে আরবের বুকে একটি অধিকৃত অঞ্চলে কখনো তারা টিকে থাকতে পারত না।

মার্কিন প্রশাসনে ইহুদিদের বিষয়টি এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, জনৈক সাংবাদিক তা নিয়ে রসিকতায় মেতে ওঠেন। হোয়াইট হাউজ, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ ও প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে তাদের সংখ্যা দেখাতে গিয়ে অতি বাস্তবসম্মতভাবে তিনি লিখেন, 'ক্লিনটনের প্রাসাদে ইহুদিদেরই নিয়ন্ত্রণ চলে।'

দীর্ঘদিন যাবৎ আমেরিকার কেন্দ্রীয় জায়গাগুলোতে ইহুদিদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রসিদ্ধ। এটি শুধু ক্লিনটনের আমলে ছিল, এমন নয়; বরং অন্যান্য শাসনেও ছিল তাদের বিস্তৃত কর্তৃত্ব। কিন্তু ইয়েলতসিনের শাসনামলে রাশিয়ান পত্রপত্রিকা হঠাৎ বিস্ময়কর একতথ্য প্রকাশ যে,

ইহুদিরা মস্কো ক্রেমলিনের[৩০] টেবিলও নিয়ন্ত্রণ করছে। বর্তমানে তারা বৃহৎ রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও মিডিয়া সেন্টারও নিয়ন্ত্রণ করছে।

মোটকথা, জায়নবাদী ইহুদিদের অন্যতম টার্গেট ছিল, পৃথিবীর দুটি পরাশক্তি আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কেন্দ্রসমূহে গোপন ইহুদিদের অস্তিত্বের ব্যাপারে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে বর্তমানে সেখানে তাদের প্রকাশ্য অবস্থান, নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি হাতে তাদের কর্তৃত্বকামী মনোভাব, এমনকি তাদের সহায়তাপুষ্ট হয়েই রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ইয়েলতসিনের শাসনক্ষমতায় সমাসীন হওয়া—সবকিছু তাদের বিশাল প্রভাব থাকার নিদর্শন বহন করে।

উদাহরণস্বরূপ : ইহুদি বরিস নেমতসভ রাশিয়ান প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব হিসেব দায়িত্ব পালন করে। ইয়াকভ উনিসভ অর্থমন্ত্রীর পদ লাভ করে। প্রেসিডেন্ট দফতর প্রধানের সহকারী হয় আলেকজেন্ডার লেভচিস। রাশিয়ান জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সহকারী সেক্রেটারি হয় বরিস বেরেজোভস্কি। সর্বশেষ এ ব্যক্তি হলো তাদের মধ্যে সবচেয়ে আশঙ্কাজনক। বিলিয়নপতি। সে সরকারের কাছ থেকে একটি টিভি চ্যানেল ক্রয় করে। বিশাল একটি সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক।

তার অহমিকাপূর্ণ মনোভাব এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে একবার বলে, সে ও অন্য ছয়জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির (যাদের অধিকাংশই ইহুদি) হাতে রাশিয়ার ৫০% অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আছে। এমনকি সে নিঃসংকোচে ও স্পষ্টভাবে জানায়, রাশিয়ান প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব আনাতোলি চুবাইস তাদেরই (ইহুদিদের) পোষা লোক। তারা রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ইয়েলতসিনকে প্রেসিডেন্ট পদে আনার জন্য প্রচুর অর্থ যোগান দিয়েছে বলেও জানায়। (এজন্যই তারা উচ্চপদ লাভ করা এবং নিজেদের ব্যয়িত প্রচেষ্টার ফল লাভ করার পূর্ণ অধিকার রাখে।)

---

৩০. মস্কো ক্রেমলিন, সাধারণত 'দ্যা ক্রেমলিন' নামে অধিক পরিচিত। এটি মস্কোতে অবস্থিত একটি সুরক্ষিত স্থাপনা। স্থাপনাটির দক্ষিণে মস্কোদা নদী, পূর্বে রেড স্কয়ার এবং সেইন্ট ব্যাসিলস ক্যাথেড্রাল পশ্চিমে আলেক্সান্ডার গার্ডেন অবস্থিত। কমপ্লেক্সটি বর্তমানে রাশিয়া ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। [উইকিপিডিয়া থেকে] -সম্পাদক

বিভিন্ন জায়গাতে যেমন ইহুদি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তেমনই ব্যাংক ও অর্থনীতির প্রধান কেন্দ্রগুলোতেও আছে তাদের বিস্তৃত কর্তৃত্ব। এ ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলো ভ্লাদিমির গুসিন্সকি। সে রাশিয়ান ইহুদি পরিষদের প্রধান ও বিশাল কোম্পানি মোস্টের মালিক। তদুপরি সে (রাশিয়ান) এন-টিভি নামক একটি টিভি চ্যানেল এবং সেভদনয়া নামক পত্রিকারও মালিক।

আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদী চক্রটি ১৯৬৬ সালে একটি জরিপ চালায়। দেখা যায়, জরিপে মতামত প্রদানকারী অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস, বিশ্বের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ইহুদিদের বিশাল ভূমিকা আছে। এটিও স্পষ্ট হয় যে, রাশিয়ান বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ, এমনকি প্রেসিডেন্ট ইয়েলতসিনের নির্বাচনী সাফল্যের পেছনে রাশিয়ান ইহুদিদের ভূমিকা থাকার বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ায় মস্কোর অনেকেই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়; বিশেষত জায়নিস্ট ইহুদিদের বিরুদ্ধবাদীরা এবং ওইসব লোক, পুঁজিবাদি অর্থনীতি প্রবর্তনের কারণে যাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে অধঃপতিত হচ্ছিল। ফলে ইহুদি নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বমূলক প্রকাশ্য এসব কথাবার্তার বিরুদ্ধে সতর্ক করে সরকারি সংবাদমাধ্যমগুলোতে জোরালো আওয়াজ উঠতে থাকে। এটি বহির্বিশ্বের ইহুদি নেতৃত্বের দৃষ্টিগোচর হলে তারা স্বীয় দলভুক্তদের জন্য সতর্কতা অবলম্বন ও প্রকাশ্যে না আসার নির্দেশ দেয়। তাদের জন্য শেষ ও সুস্পষ্ট সতর্কবার্তা প্রকাশিত হয় ফোফর্ড নামক একটি ইহুদি আমেরিকান সংবাদপত্রে। সেখানে ইহুদিদেরকে সতর্কতা অবলম্বন ও গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

মোটকথা, বিশ্বের ওপর ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক মহলে তাদের কর্তৃত্ব বিস্তারকামী প্রচেষ্টার বিষয়টি কেবল গুজব নয়। অথবা যেমনটি কথিত আছে যে, বিভিন্ন দেশের ইহুদি এজেন্টের মাধ্যমে তারা গোপন আন্তর্জাতিক সরকার গঠন করেছে, যারা বিশ্ব পরিচালনা করে, কিংবা ফ্রিম্যাসনরি ও তাদের প্রভাব সম্পর্কে যেমনটি বলা হয়ে থাকে, সবই সঠিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অন্তত ওইসব দেশে তো নিশ্চিত, যেসব দেশের রাষ্ট্রীয় সংবাদ ও গোপনীয়তা পাচারের ক্ষেত্রে ফ্রিম্যাসন ফোরামগুলোর ভূমিকার কথা প্রকাশিত হয়েছে; যেমনটি ইতালিতে ঘটেছে।

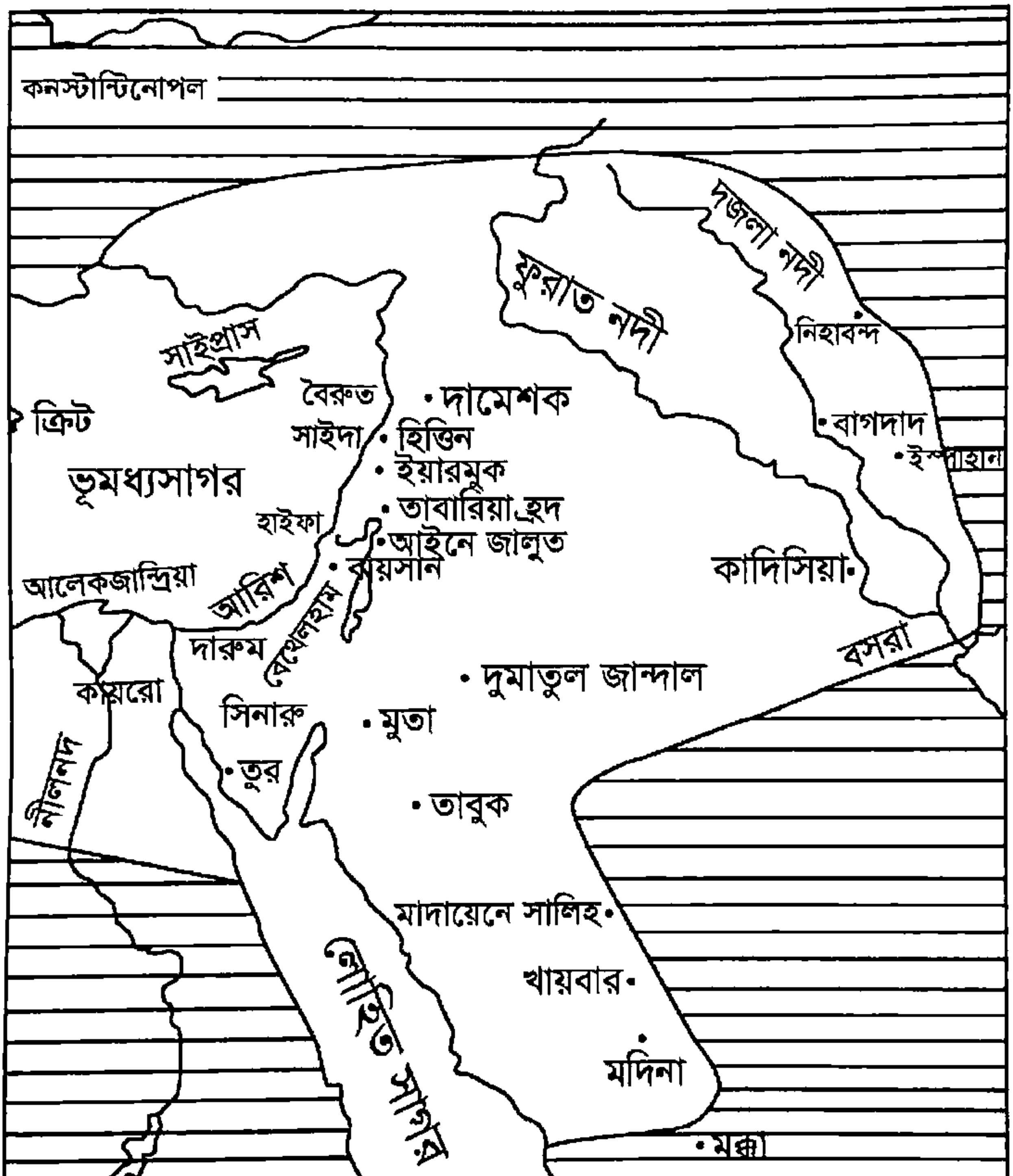
কিছু বাস্তবতা

এ কথাও সত্য যে, জায়নবাদী ইহুদিরা তাদের কিছু উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারলেও সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হয়নি। যারা জায়নিস্ট ইহুদিদের পরিকল্পনাসমূহের ব্যাপারে অবগত, তাদের হিসেবে জায়নিস্টদের যেসব লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়নি, সেগুলোর সংখ্যাই বেশি।

জায়নিস্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা সম্ভবত তাদের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৯৭ সালের মধ্যে নীলনদ থেকে ফোরাত পর্যন্ত গ্রেট ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হওয়া। অনুরূপ তাদের ব্যর্থতার তালিকায় এটিও রয়েছে যে, প্রকৃত ইহুদি নির্ধারণে সক্ষম না হওয়া। কেননা, জায়নিস্ট চিন্তাধারা মূলত ইহুদিদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব, যখন প্রকৃত ইহুদি নির্ণয় করা সম্ভব না হবে, তখন তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভিত্তিই ভেঙে পড়ল।

এমনইভাবে ইহুদিদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী স্রোতের ঝুঁকিও অস্বীকার করার উপায় নেই, যা ইহুদিবাদী প্রাচীন শিক্ষার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। এ কারণে এ ধারাটির পক্ষ থেকে জায়নবাদী চিন্তাচেতনা পুষ্ট করা ও তার পক্ষ থেকে প্রতিরোধকামী কোনো পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায় না।

তবে এর বিপরীতে পরাশক্তি দেশসমূহে বিশেষ করে আমেরিকা ও রাশিয়ায় ইহুদিদের প্রভাবও অনস্বীকার্য। আর এর ভিত্তিতেই জায়নবাদী ইহুদিরা আরব ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লাগাতার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফিলিস্তিনে টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট অংশ দখল করা, তথায় বসতি প্রতিষ্ঠা, মসজিদে আকসা ভেঙে টেম্পল নির্মাণের প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এজন্য তারা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার বিন্দুমাত্র ভয় করছে না।



মানচিত্র নং-৩১

ইহুদিদের পরিকল্পিত গ্রেট ইসরাইল রাষ্ট্রের মানচিত্র

(নীলনদ হতে ফুরাত পর্যন্ত বিস্তৃত)

পরিশিষ্ট-৩

শিক্ষা ও উপদেশ

একজন সচেতন পাঠক ইতিহাসের পাঠকে জীবনের ব্যবহারিক পাঠে রূপান্তর করতে পারেন, যা তার জীবনে উপকারে আসে। এতে করে সে অতীতকে বর্তমানের সাথে মিলাতে পারে এবং দূর-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

ইতিহাসের পাঠকের জন্য আবশ্যক হলো, সে বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন থাকবে। সন্দেহ নেই যে, স্থান, কাল ও ব্যক্তির ভিন্নতায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। কেননা, আল্লাহ তাআলার রীতিনীতির কখনো পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾

> তবে কি তারা পূর্ববর্তীদের (ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত শাস্তির) বিধানের প্রতীক্ষা করছে? কিন্তু আপনি আল্লাহর রীতিনীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতিনীতিতে কোনো ব্যতিক্রমও পাবেন না। [সুরা ফাতির : ৪৩]

এবার আমরা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশের দিকে যাব, যা পাঠকদের অবহিত করা আমাদের কর্তব্য। পাঠকদের জন্যও আবশ্যক হলো, এগুলো জানার পর তার জীবনে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাকে যতটুকু বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন সে অনুসারে আরও বিষয় সংযোজন করে নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করা। আমরা প্রথম পাঠের আলোচনায় একটি ব্যাবহারিক উদাহরণ দিয়ে শুরু করব। অতঃপর আমরা কেবল পাঠগুলো উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। পাঠকের জন্য উচিত হবে সেসবের ঐতিহাসিক প্রমাণ অনুসন্ধান করা।

প্রথম পাঠ : প্রতি বছর হাজার শহিদ

ইসলামি ইতিহাস অধ্যয়নে আমাদের কাছে মৌলিক এ বাস্তবতা স্পষ্ট হয় যে, নিশ্চয়ই এ দ্বীন আল্লাহ তাআলা সংরক্ষণ করেছেন ওইসব লোকের মাধ্যমে, যারা আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য নিজেদের জানমাল ব্যয় করেছেন। বিষয়টি এমন নয়, যেমনটি অধিকাংশ মুসলমান ধারণা করে থাকে। তাদের ধারণা যে, এটা তো আল্লাহরই দ্বীন। সুতরাং আমাদের কোনো চেষ্টা-সাধনা ছাড়াই আল্লাহ তাআলা নিশ্চিত তার দ্বীনের জন্য সাহায্য করবেন। অনেকের ধারণা যে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য মুজিজা তথা অলৌকিক পন্থায় আসবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার নীতি হলো, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, বাহ্যিক চেষ্টা-সাধনা অনুসারেই তাঁর সাহায্য আসবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾

তিনি ওই সত্তা, যিনি তোমাকে শক্তিশালী করবেন, তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের মাধ্যমে। [সুরা আল-আনফাল : ৬২]

তিনি আরও বলেন :

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। আর তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।

[সুরা আল-ফাতহ : ২৯]

ঐতিহাসিক প্রমাণাদি

আমরা যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর ১১ থেকে ৩১ হিজরি (৬৩২-৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত বিশ বছর সময়ে শহিদগণের হিসাব করি, তাহলে নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান উঠে আসে :

- রিদ্দার যুদ্ধে শহিদের সংখ্যা—১২০০ জন।
- ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহিদের সংখ্যা—৩০০০ জন।
- জিসর বা সেতুর যুদ্ধে শহিদের সংখ্যা—৪০০০ জন।

- কাদিসিয়ার যুদ্ধে শহিদের সংখ্যা—৮৫০০ জন।

এ হিসেবে সর্বমোট শহিদের সংখ্যা হলো ১৬৭০০ জন। নাহাওয়ান্দ যুদ্ধে ও রোম-পারস্য বিজয়কালে হওয়া শহিদদের হিসাব বাদই দিলাম, যাদের সংখ্যা ঐতিহাসিকরা নির্ণয় করতে পারেননি। অনুরূপ মাস্তুলের যুদ্ধের[৩১] শহিদদের হিসাবও করিনি, যে যুদ্ধের ব্যাপারে ইমাম তাবারি রহ. বলেন যে, 'এ যুদ্ধে পানির ওপর রক্ত প্রাধান্য পেয়েছিল।'

সুতরাং আমরা এ কথা বলতে পারি যে, এ বিশ বছরে মুসলিম শহিদের সংখ্যা ২০ হাজার। অর্থাৎ, প্রতি বছর গড়ে প্রায় এক হাজার শহিদ দ্বীনের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তারা মানবপূজা থেকে মুক্ত করে মানুষকে পরাক্রমশালী এক আল্লাহর উপাসনার দিকে আনার জন্য বিভিন্ন দেশ জয় করেছেন। এভাবে পারস্য সম্পূর্ণভাবে বিজিত হয়েছে। এখান থেকে বস্তুপূজা দূরীভূত হয়েছে এবং লোকজন আনুগত্য ও ভালোবাসার সাথে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে।

দ্বিতীয় পাঠ : মুসলিম জাতির ধ্বংস নেই

ইসলাম আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ শরিয়ত। এটাকে আল্লাহ তাআলা স্থায়ী দ্বীন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এ কারণেই তিনি দ্বীনের জন্য রিজাল বা অনেক মনীষী সৃষ্টি করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾

> আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তাহলে তোমাদের ভিন্ন তিনি অন্য সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন। [সুরা মুহাম্মাদ : ৩৮]

এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, যুগের পর যুগ ধরে এ ধর্মের মুজাদ্দিদ, ফকিহ ও মুজাহিদের জায়গায় কখনো শূন্যতা তৈরি হয়নি। গুণে-মানে এদের উপমা কোনো জাতির মধ্যেই পাওয়া যায় না। এটা আকস্মিক কোনো বিষয় নয়। বরং এটা এ উম্মতের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। এ উম্মতের

---

[৩১]. এটাকে জাতুস সাওয়ারি বা মাস্তুলের যুদ্ধ বলা হয়। ইসলামি ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম নৌযুদ্ধ। ৩৫ হিজরি মোতাবেক ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে উসমান রা.-এর আমলে মুআবিয়া রা.-এর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল এবং অনেক রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে মুসলমানদের অভূতপূর্ব বিজয় অর্জিত হয়েছিল। -সম্পাদক

জন্য; বরং পুরো মানবতার জন্য এটা আল্লাহর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ। কেননা, যদি এ জাতি নির্মূল হয়ে যায়, তাহলে আসমানের আমানত বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মনুষ্যত্বের আমানতও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

প্রিয় পাঠক, আমরা আপনার জন্য এ বিষয়টির সত্যতা ইতিহাসের প্রমাণাদির আলোকে সাব্যস্ত করার দায়িত্ব অর্পণ করছি।

ঐতিহাসিক প্রমাণাদি

....

....

....

তৃতীয় পাঠ : মুসলিম শাসকগণ

দুঃখের বিষয় হলো, ইসলামের শত্রুরা মুসলিম শাসকদের ওপর কলঙ্ক লেপন করেছে যে, তারা ছিলেন ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ও উদ্ধত। এ বিষয়ে কতিপয় অভিযোগ আমরা এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে খণ্ডন করেছি, তদুপরি নিম্নে আমরা কয়েকটি বিষয় সংযোজন করছি :

- নিশ্চয়ই ওই সমস্ত খলিফা ও শাসক সামান্য সময়ের জন্যও এ চিন্তা করেননি যে, শাসনব্যবস্থা থেকে ইসলামি শরিয়ত সরিয়ে দেবেন। বর্তমানে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্ম অপসারণের প্রচলিত পদ্ধতি তাদের সময়ে কখনো তৈরি হয়নি।

- প্রায়শই শাসকরা ইসলামের নির্দেশ জানার জন্য উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হতেন। তাদের নিকট উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন ছিল। শাসকদেরকে নসিহত ও উপদেশ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল তাদের। এমনকি মুসলিম শাসকরা এ কথা পর্যন্ত বলতেন যে, 'বাদশাহগণ হচ্ছেন জনগণের শাসক, আর উলামায়ে কেরাম হলেন বাদশাহদের শাসক।'

- মুসলিম সমাজের সাধারণ প্রবণতা ছিল ইসলামকে আঁকড়ে ধরা। সুতরাং দু-চারটা ব্যতিক্রম ব্যতীত সে সময়ে মুসলিম সমাজে প্রকাশ্য কোনো অশ্লীল ও গর্হিত কাজ হতো। কখনো কারও মধ্যে এমন কিছু প্রকাশ পেলে মানুষ তাকে বাধা দিত।

ঐতিহাসিক প্রমাণাদি

....

....

....

চতুর্থ পাঠ : ইসলামি জিহাদের লক্ষ্য

ইসলামি জিহাদের উদ্দেশ্য কেবল ইজ্জত ও ইসলামি ভূখণ্ড প্রতিরক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং জিহাদের মৌলিক উদ্দেশ্য, ওইসব তাগুত ও প্রতিবন্ধকতা একেবারে নির্মূল করা, যা মানুষের ইসলামকে জেনে স্বাধীনভাবে গ্রহণ করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

তোমরা তাদের (কাফিরদের) সাথে যুদ্ধ করতে থাকো; যতক্ষণ না ফিতনা অবশিষ্ট থাকে এবং দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তারপর যদি তারা এ (অন্যায়) থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায় তবে তারা যা করে, আল্লাহ তা দেখেন। [সুরা আনফাল-৩৯]

এজন্যই যখন ওই সমস্ত বাধাবিপত্তি দূরীভূত করা হলো এবং মানুষের জন্য সকল প্রভাব ও নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত হয়ে হকের আওয়াজ শোনার সুযোগ এসে গেল তখন তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের ছায়াতলে প্রবেশ করতে লাগল।

ঐতিহাসিক প্রমাণাদি

....

....

....

পঞ্চম পাঠ : ইসলামি শিক্ষা অসংখ্য মনীষী তৈরি করেছে

যেসব প্রখ্যাত খলিফা ও সুলতান যৌবনকালে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন, তারা ছিলেন শৈশবের ইসলামি শিক্ষার ফসল। পিতা সন্তানকে শৈশবকাল থেকেই কুরআনি শিক্ষার ওপর প্রতিপালন করতেন এবং বীরত্ব ও জিহাদের প্রতি ভালোবাসা শিক্ষা দিতেন।

ঐতিহাসিক প্রমাণাদি

....

....

....

ষষ্ঠ পাঠ : ইসলামে সহিষ্ণুতা

ইসলামি ইতিহাসে কাফিরদের প্রতি মুসলমানদের সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতা অপারগতা কিংবা দুর্বলতার কারণে ছিল না; বরং সেটা ছিল তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের কারণে (তথা কুরআন-হাদিসের নির্দেশনার কারণে)।

ঐতিহাসিক প্রমাণাদি

....

....

....

সপ্তম পাঠ : আমাদের ধর্ম সর্বজনীন

ইসলামের আলৌকিকতার একটি প্রমাণ হলো, অনেক সময় আরব ছাড়া অন্য জাতিও ইসলামের দায়িত্ব বহন করেছে। চাই সেটা জিহাদের অঙ্গনে হোক বা বিজ্ঞানের ময়দানে।

এতে প্রমাণ হয় যে, ইসলামের আহ্বান শুধু আরবদের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। ইসলাম সকল মানুষকেই তার ছায়াতলে আশ্রয় দিতে সক্ষম; এটাকে তারা জীবনে ধারণ করে এবং এটার জন্যই জিহাদ-মুজাহাদা করে।

ঐতিহাসিক প্রমাণাদি

....

....

....

অষ্টম পাঠ :

ইসলামের শত্রুদের প্রতি কিছু মুসলিম সেনাপতির সুধারণা পোষণ এবং তাদের ষড়যন্ত্র, ধোঁকা ও গাদ্দারি থেকে অসতর্কতার দরুন তাদের ওপর এবং পুরো উম্মতের ওপর ধ্বংস ও প্রলয় নেমে এসেছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ○ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাকো, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই প্রকাশ পায়। আর যা কিছু তাদের অন্তরে লুক্কায়িত আছে, তা আরও অনেকগুণে জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে দিলাম, যদি তোমরা বুঝতে পারো। দেখো, তোমরাই তাদের ভালোবাসো, কিন্তু তারা তোমাদের ভালোবাসে না। অথচ তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের প্রতি হিংসাবশত আঙুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মনের কথা ভালোভাবেই জানেন। তোমাদের যদি কোনো মঙ্গল হয় তবে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা আনন্দিত হয়। আর এতে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। তারা যা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। [সুরা আলে ইমরান : ১১৮-১২০]

ঐতিহাসিক প্রমাণাদি

....

....

....

নবম পাঠ : রাজনৈতিক সংঘাতসমূহ ও জাতির দুর্বলতা সৃষ্টিতে দুর্বলকরণে তার প্রভাব

ঐতিহাসিক প্রমাণাদি

....

....

....

দশম পাঠ : আমরা উসমানি খিলাফতকে ইসলামি খিলাফত বলি, এটা তুর্কি ঔপনিবেশিকতা নয় কেন?

ঐতিহাসিক প্রমাণাদি

....

....

....

মুসলমানদের পশ্চাদপসরণের কিছু কারণ

মুসলিম জাতির পশ্চাদপসরণ ও দুর্বলতার কারণসমূহকে অনেকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। আমরা সেগুলো এখানে তুলে ধরছি :

- রাজনৈতিক বা দলীয় বিরোধ এবং নেতৃত্ব ও পদমর্যাদার লোভ। অথচ এ ব্যাপারে ইসলামে কঠোর সতর্কতা এসেছে। ইসলাম স্বেচ্ছায় আগ্রহী হয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছে এবং এদিকে দৃষ্টি ফেরাতে নিষেধ করেছে। এটা মূলত দেশ ও জাতির জন্য ধ্বংস ও অধঃপতনের কারণ।
- ধর্মীয় ও মাজহাবগত বিরোধ। অন্যদিকে ধর্মের মূল বিষয় আকিদা ও আমল থেকে বিমুখ হয়ে শব্দের মারপ্যাঁচ, রুহহীন শুষ্ক পরিভাষা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা; কুরআন ও সুন্নাহ ছেড়ে দেওয়া; ব্যক্তি

বিশেষের রায় ও উক্তির ওপর একগুঁয়েমির সাথে বসে থাকা এবং ঝগড়া- বিবাদ ও বিতর্কে লিপ্ত হওয়া।

- চাকচিক্য, সৌন্দর্য ও বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়া এবং আনন্দ ও কামনা-বাসনা পূরণে নিমগ্ন থাকা। এ ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো যুগে যুগে মুসলিম শাসকদের মধ্যে যতটা পাওয়া গিয়েছে, অন্যদের বেলায় ততটা পাওয়া যায়নি।
- বিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণার ব্যাপারে অবহেলা এবং দর্শন, ফিলোসফি ও তর্কশাস্ত্রে সময় বিনষ্ট করা। অথচ ইসলাম মানুষকে মহাবিশ্ব ও সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য নিয়ে চিন্তাভাবনার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে।
- নিজেদের রাজত্ব ও ঐশ্বর্য নিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনায় ভোগা এবং অন্যান্য জাতির তুলনায় নিজ জাতির সামাজিক বিকাশ ও উন্নতির ব্যাপারে চরম উদাসীনতা প্রদর্শন। এতে অন্যান্য জাতি যখন মুসলিমদের অতিক্রম করে এগিয়ে চলে গেল, তখন তারা অবাক হয়ে গেল। অথচ কুরআন তাদেরকে পূর্বেই সতর্কতা অবলম্বন এবং উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দিয়েছে।
- তোষামোদকারী শত্রুদের চক্রান্তে ধোঁকা খাওয়া, তাদের কর্মকাণ্ড ও জীবনের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে মুগ্ধ হওয়া এবং তাদের অনুকরণের দিকে ধাবিত হওয়া, যা ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকার করে না। অথচ কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করতে মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে, পরিষ্কার ভাষায় তাদের বিরোধিতা করতে এবং মুসলিম উম্মাহর মূল বৈশিষ্ট্য ও উপাদান সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর এমন অনুকরণের পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়েছে।
- আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং নিজের ওপর থেকে আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা।
- ইউরোপীয়দের সামনে বিনীত হয়ে অধিকাংশ লোকেরই ইসলামের শান-শওকত ও ঐতিহ্যের কথা ভুলে যাওয়া।

- স্বজাতির বিপক্ষে ইউরোপীয়দের আপন করে নেওয়া এবং তাদের সব ধরনের সেবা করা।
- ত্যাগ-তিতিক্ষা ও বিসর্জনের মানসিকতা হারিয়ে ফেলা, যার ভিত্তিতে তারা ইউরোপীয়দের ওপর একসময় কর্তৃত্ব করতে পেরেছিল।
- ব্যাপকভাবে মুসলিমদের, বিশেষত শাসক ও নেতাদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটা।
- উলামায়ে কেরামের নানারকম ফিতনায় আক্রান্ত হওয়া, যারা ছিল সরকারের সকল কাজের ওয়াচিং ফোর্স বা পর্যবেক্ষক দল সদৃশ।

প্রিয় পাঠক, ইতিহাসের এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন শেষে আপনার জন্য আমরা আরও অতিরিক্ত কিছু পাঠ, তার উপকারিতা ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সংযোজন করার দায়িত্ব রেখে গেলাম। আশা করি, আপনি তা পূরণ করবেন। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন সকল পাঠককে এ থেকে উপকৃত করেন এবং এর প্রচার-প্রসারে যারা প্রচেষ্টা করেছেন তাদের সবাইকে ক্ষমা করেন। আমিন।

অঞ্চল পরিচিতি

আকাবা : আরবিতে সংকীর্ণ গিরিপথকে 'আকাবা' বলা হয়। মক্কা থেকে মিনায় গমনের পথে মিনার ময়দানের পশ্চিমে অবস্থিত একটি সংকীর্ণ পাহাড়ি পথ 'আকাবা' নামে খ্যাত ছিল। উল্লেখ্য, হজের সময় মিনায় যে তিনটি স্তম্ভকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করা হয়, তার প্রথমটি অর্থাৎ জামারায়ে আকাবা এই গিরিপথটির প্রান্তেই অবস্থিত।

আদানা : তুরস্কের দক্ষিণের বৃহৎ একটি শহর।

আনা : জাযিরা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত রাক্কা ও হিতের মধ্যবর্তী প্রসিদ্ধ একটি নগরী। নগরীটির অবস্থান ফুরাত নদীর তীরঘেঁষে হাদিসাতুল ফুরাত এলাকার নিকটে।

আন্দালুস : স্ক্যান্ডিনেভিয়ান উপদ্বীপ (The Scandinavian Peninsula)-এর পর ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপদ্বীপ হলো আইবেরিয়ান উপদ্বীপ (Iberian Peninsula)। ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ত্রিভুজ-সদৃশ আইবেরিয়ান উপদ্বীপের আয়তন প্রায় ছয় লক্ষ বর্গকিলোমিটার (৫,৮৩,২৫৪ বর্গ কি. মি. বা ২,২৫,১৯৬ বর্গমাইল)। আধুনিক রাষ্ট্রসীমার স্পেন, পর্তুগাল ও অ্যান্ডোরা এই তিনটি দেশের পাশাপাশি ফ্রান্সের কিছু অংশ আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। আইবেরিয়ান উপদ্বীপকেই অতীতে আন্দালুস বলা হতো।

আবওয়া : মদিনা হতে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত একটি এলাকার নাম।

আরব উপদ্বীপ : আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আরব উপদ্বীপ সাতটি রাষ্ট্রে বিভক্ত—সৌদি আরব, ইয়ামেন, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার ও বাহরাইন।

আয়তনের দিক থেকে জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ বিশ্বের সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। আরব উপদ্বীপের আয়তন ১২,৫০,০০০ বর্গমাইল (৩২,৩৭,৫০০ বর্গকিলোমিটার)। তবে সাধারণ অনুমানে আরব

উপদ্বীপের প্রায় ৯৫% এলাকা বসবাসের অনুপযুক্ত মরু অঞ্চল আর বাকি ৫% এলাকা বসবাস উপযোগী।

আরিক : রাবাহ দুর্গ হতে উত্তর-পশ্চিমে বিশ কিলোমিটার দূরে ওয়াদিয়ে আনা নদীর একটি শাখার তীরে অবস্থিত এক দুর্গের নাম। বর্তমানে এর অবস্থান আধুনিক স্পেনের সিউডাড রিয়াল (Ciudad Real) নগরীর পশ্চিমে স্ট্যা মারিয়া ডি অ্যালারকোস (Sta Maria de Alarcos) অঞ্চলে। তৎকালে আরিক ছিল আন্দালুস ও ক্যাস্টোলা রাষ্ট্রের সীমান্তরেখায় অবস্থিত একটি এলাকা।

আরূদ : আরব উপদ্বীপের পূর্ব অংশ।

আলজাস : উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের, জার্মানির সীমান্তে অবস্থিত একটি প্রদেশ।

আলেপ্পো : অতি প্রাচীন একটি নগরী। নগরীটির আরবি নাম حَلَب (হালাব), ইংরেজি নাম Aleppo (আলেপ্পো)। আধুনিক সিরিয়ার অন্তর্গত আলেপ্পো নগরী দেশটির রাজধানী দামেশক হতে প্রায় ৩১০ কিলোমিটার দূরে দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত।

আসির প্রদেশ : সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রদেশ।

আহসা : সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় একটি জেলা শহর। রাজধানী রিয়াদ থেকে দূরত্ব ৩২৮ কিলোমিটার।

ইফ্রিকিয়া : মধ্যযুগে আরবগণ ইফ্রিকিয়া (Ifriqiya) দ্বারা আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তৃত একটি অঞ্চলকে বোঝাত। বর্তমান তিউনিসিয়ার উত্তরাঞ্চল, আলজেরিয়ার পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিম লিবিয়ার ত্রিপোলি অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং ইফ্রিকিয়া দ্বারা বর্তমানের বৃহত্তর আফ্রিকা মহাদেশকে উদ্দেশ্য গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

ইয়ামেন : আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশ।

ইলখানাত : (ফারসি : ایلخانان, *Ilkhanan*; Mongolian : Хүлэгийн улс, *Hulagu-yn Ulus*) ছিল মোঙ্গল সাম্রাজ্য হতে উদ্ভূত একটি খানাত (রাজ্য)। এটি মোঙ্গল হালাকু খানের পরিবার কর্তৃক শাসিত হয়। খ্রিষ্ট ১৩ শতাব্দীতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরান ছিল এর প্রাথমিক ভিত্তিভূমি। এ

ছাড়াও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যেমন বর্তমান আজারবাইজান এবং তুরস্কের মধ্য ও পূর্বাঞ্চল এর অন্তর্গত ছিল। ইলখানাত মূলত চেঙ্গিস খানের খোয়ারিজমীয় সাম্রাজ্য অভিযানের ওপর ভিত্তি লাভ করে এবং হালাকু খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। হালাকু খান চেঙ্গিস খানের নাতি ছিলেন। সাম্রাজ্যের শেষ সীমায় বর্তমান ইরান, ইরাক, তুর্কমেনিস্তান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয়া, তুরস্ক, পশ্চিম আফগানিস্তান ও দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তান এর সীমানাভুক্ত ছিল। মাহমুদ গাজান থেকে শুরু করে পরবর্তী ইলখানাত শাসকরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

ইসলামি প্রাচ্য ও ইসলামি প্রতীচ্য : আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল ও আন্দালুস বিজিত হওয়ার পর ঐতিহাসিকগণ ইসলামি বিশ্বকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দু-ভাগে বিভক্ত করেন। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হতে পূর্বে ইরানি মালভূমি পর্যন্ত ইসলামি ভূখণ্ডকে বলা হতো ইসলামি প্রাচ্য আর ভূমধ্যসাগর হতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামি ভূখণ্ডকে বলা হতো ইসলামি প্রতীচ্য। মিশরকে ইসলামি বিশ্বের উভয় অংশের মধ্যবর্তী সংযোগস্থল বিবেচনা করা হতো। আধুনিক রাষ্ট্রসীমা অনুসারে ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্দান, লেবানন, সৌদি আরব, কুয়েত, আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, ওমান ও ইয়ামেন ছিল ইসলামি প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত আর (আইবেরিয়ান উপদ্বীপসহ) মৌরিতানিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, (মরক্কো অধিকৃত) পশ্চিম সাহারা, (স্পেন অধিকৃত) বন্দরনগরী সিউটা (Ceuta) ও ম্যালিলা (Mellila) ছিল ইসলামি প্রতীচ্যের অন্তর্ভুক্ত।

উবুল্লা : আধুনিক বসরার যে অংশটি 'আশার' নামে পরিচিত, সেখানেই ছিল উবুল্লার অবস্থান। ইবনে সিরিন রহ.-এর মতে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মুসা আ. ও খিযির আ. কর্তৃক জনপদবাসীর কাছে খাবার প্রার্থনার ঘটনা উবুল্লাতেই সংঘটিত হয়।

এডেসা : আরবি নাম الرُّهَا (রুহা)। তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত এডেসা নগরী দেশটির সানলিউরফা প্রদেশ (Şanlıurfa Province)-এর রাজধানী। বর্তমানে নগরীটি উরফা (Urfa) নামে পরিচিত।

এন্টিয়ক : ভূমধ্যসাগরের উপকূল হতে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পূর্বে আছি

নদী (Orontes river)-এর তীরে অবস্থিত অতি প্রাচীন একটি নগরী এন্টিয়ক (Antioch)। আধুনিক তুরস্কের হাতায় প্রদেশ (Hatay Province)-এর অন্তর্গত নগরীটির বর্তমান নাম এন্টাকিয়া (Antakya)। আরবিতে নগরীটির নাম أَنْطَاكِيَة (আনতাকিয়া)।

এরজুরাম : তুরস্কের অন্তর্গত একটি প্রদেশ।

এশিয়া মাইনর : এশিয়া মহাদেশের একটি বিশেষ অংশের নাম এশিয়া মাইনর। ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ অঞ্চলটি আনাতোলিয়া নামেও পরিচিত ছিল। এ অঞ্চলটিই বর্তমানে আধুনিক তুরস্ক রাষ্ট্র। অঞ্চলটির উত্তরে কৃষ্ণসাগর, পশ্চিমে এজিয়ান সাগর, দক্ষিণে আধুনিক সিরিয়া ও ভূমধ্যসাগর। আর পূর্ব সীমান্তে আছে বিস্তৃত পাহাড়ি অঞ্চল, যা আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় আর্মেনিয়া ও ইরানের মধ্যে পড়েছে।

ওয়াজহে কাবলি : মিশরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের একটি অঞ্চলের নাম ওয়াজহে কাবলি বা সাইদে মিশর, ইংরেজিতে Upper Egypt।

ওয়াজহে বাহরি : মিশরের উত্তরাঞ্চলে বদ্বীপ সদৃশ একটি অঞ্চলের নাম ওয়াজহে বাহরি বা দালতান নীল; ইংরেজিতে The Nile Delta।

ওরান : আলজেরিয়ার অন্তর্গত একটি শহর।

কাদিসিয়া : বর্তমান ইরাকের কুফা ও হিল্লা নগরী হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক নগরীর নাম কাদিসিয়া। ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত কাদিসিয়া নগরী ইসলামি বিজয়াভিযানের পূর্বে ক্ষুদ্র একটি জনপদ ছিল।

কায়সেরি : তুরস্কের মধ্য আনাতোলিয়ার অন্তর্গত বৃহৎ শিল্পনগরী।

কুদস : ঐতিহাসিকগণের মতে আল-কুদস পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরী। কয়েক হাজার বছর ব্যাপ্ত কালের এই দীর্ঘ পরিক্রমায় আল-কুদস বিভিন্ন ভাষা ও জাতির সংস্পর্শ লাভ করে এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হলো ১. সালিম ২. মুরইয়া ৩. ইয়াবুস ৪. আরিয়েল ৫. ইলিয়া ৬. আল-কুদস ৭. বায়তুল মুকাদ্দাস ৮. বালাত ৯. রাবাত ১০. জেরুজালেম।

কুমানিয়া : আধুনিক কাজাখস্তানের অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল।

কুর্দফান : মধ্য সুদানে অবস্থিত একটি এলাকা। এর আয়তন তিন লক্ষ আশি হাজার বর্গকিলোমিটার।

কোনিয়া : তুরস্কের আনাতোলিয়া সীমান্তের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় বৃহত্তম শহর।

কোর্সিকা : ভূমধ্যসাগরের অন্তর্গত একটি দ্বীপ। যা বর্তমানে ফ্রান্সের অধিভুক্ত একটি অঞ্চল।

ক্রিট : ক্রিট (Crete) গ্রিসের সর্ববৃহৎ দ্বীপ।

ক্রিমিয়া : ইউক্রেনের অন্তর্গত একটি স্বশাসিত প্রজাতন্ত্র।

গ্যালিপলি : তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চলে ইউরোপীয় অংশে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর পশ্চিমেই জিয়ান সাগর এবং পূর্বে দার্দানেলিস প্রণালি অবস্থিত।

জাযিরা : 'আল-জাযিরাতুল ফুরাতিয়া' বা সংক্ষেপে 'জাযিরা' একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম। অঞ্চলটির সীমানা পূর্ব দিকে (পশ্চিম ইরানের) জাগ্রোস পর্বতমালা (The Zagros Mountains) পর্যন্ত, উত্তরে (দক্ষিণ তুরস্কের) তোরোস পর্বতমালা (The Taurus Mountains) এবং দক্ষিণে শামের সামাওয়া মরুভূমি (The Syrian Desert) ও (ইরাকের) থার্চার হ্রদ (Lake Tharthar) পর্যন্ত। বর্তমান সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ, ইরাকের উত্তর-পশ্চিম অংশ এবং তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরেজিতে অঞ্চলটিকে Upper Mesopotamia (মেসোপটেমিয়া উচ্চভূমি) বলা হয়।

টারাকিয়া বা থ্রেস : বলকানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক শহর। এটি গ্রিসের পূর্বাঞ্চল, বুলগেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল এবং তুরস্কের ইউরোপীয় অংশকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

টলেডো : স্পেনের অন্যতম প্রাচীন নগরী। টলেডো আইবেরিয়ান উপদ্বীপের মধ্যভাগে বর্তমান স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ থেকে ৯১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। সুগভীর উপত্যকা-বেষ্টিত ও উচ্চভূমিতে অবস্থিত টলেডো নগরীর তিনদিকেই আছে ট্যাজু নদী (Tagus River)। টলেডো ছিল তৎকালীন আন্দালুস রাষ্ট্রের রাজধানী।

টিমবাক্‌টা : বর্তমানে আফ্রিকান রাষ্ট্র মালির একটি নগরী।

টিম্বাকুট : টিম্বাকুট হলো পশ্চিম আফ্রিকার মালির উত্তর অংশে অবস্থিত একটি বিস্ময়কর শহর। ফরাসি ভাষায় এটি টোম্বৌকুট নামে অভিহিত। অরফিক আফ্রিকান শহরটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এটি ধারণা করা হয় যে, দ্বাদশ শতকে তুয়ারেগ যাযাবররা এই শহরটির প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তীকালে এটি লবণ ও পরিবহন-সাহারার স্বর্ণ বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে উঠেছিল। এখানে প্রচুর মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করা হয়েছিল।

ট্রাবজোন : তুরস্কের উত্তরপূর্বাঞ্চলে কৃষ্ণসাগর উপকূলীয় একটি শহর।

তাউরুস : তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত পর্বতমালা।

তাবরিজ : ইরানের অন্তর্গত একটি শহর।

তারুজা : আধুনিক মিশরের বুহায়রা প্রদেশের অন্তর্গত আবুল মাতামির প্রশাসনিক অঞ্চলের একটি জনপদ।

তিবিলিসি : বর্তমান জর্জিয়ার রাজধানী।

তিহামা : আরব উপদ্বীপের পশ্চিম অংশে লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত সমতল ভূমি।

তুয়ানা ও আম্মুরিয়া : তুয়ানা (Tyana) আধুনিক তুরস্কের সেন্ট্রাল আনাতোলিয়া অঞ্চলে অবস্থিত, অপরদিকে আম্মুরিয়া তুরস্কের ফ্রিজিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। আম্মুরিয়ার বর্তমান নাম আমোরিয়াম (Amorium)।

তুর্কিস্তান : মধ্য এশিয়ার একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। অঞ্চলটির সীমানা উত্তরে উরাল পর্বতমালা ও সাইবেরিয়া অঞ্চল হতে দক্ষিণে তিব্বত, কাশ্মীর, আফগানিস্তান ও ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বে গোবি মরুভূমি (The Gobi Desert) হতে পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তীকালে সুবিশাল ও সুবিস্তৃত এ অঞ্চলটি পূর্ব তুর্কিস্তান ও পশ্চিম তুর্কিস্তান নামে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব তুর্কিস্তান বর্তমানে চীনের দখলে আছে এবং সেখানে উইঘুরসহ অন্যান্য মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর অমানবিক ও বর্ণনাতীত রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চলছে। অপরদিকে পশ্চিম তুর্কিস্তান বর্তমানে পাঁচটি দেশে বিভক্ত—তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান,

কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান ও কাজাখস্তান। পশ্চিম তুর্কিস্তানের কিছু অংশ আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলেও আছে। উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চল ছিল তুর্কিস্তানেরই অংশ।

ত্রিপোলি : এটি লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি নয়; বরং লেবানিজ নগরী। রাজধানী বৈরুতের পর ত্রিপোলি লেবাননের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। উল্লেখ্য, লেবাননের ত্রিপোলি ও লিবিয়ার ত্রিপোলি উভয়টির আরবি নাম طرابلس (তারাবুলুস) এবং উভয়টির ইংরেজি নাম Tripoli (ত্রিপোলি)। আরবিতে পার্থক্যকরণের জন্য প্রথমটিকে طرابلس الشام (শামের তারাবুলুস) এবং দ্বিতীয়টিকে طرابلس الغرب (পশ্চিমা তারাবুলুস) বলা হয়।

থেসালোনিকি : গ্রিসের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।

দার্দানেলিস প্রণালি : এই প্রণালি মারমারাকে ভূমধ্যসাগর ও এজিয়ান সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে।

দারফুর : দারফুর হচ্ছে সুদানের একটি অঞ্চল। কয়েকশ বছর ধরে এখানে সুলতানাতের শাসন বিদ্যমান। অঞ্চলটি তিনটি স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ নিয়ে গঠিত। এই তিনটি প্রদেশ হচ্ছে: পশ্চিম দারফুর, দক্ষিণ দারফুর এবং উত্তর দারফুর এবং এগুলো ট্রাঞ্জিশনাল দারফুর রিজিওনাল অথরিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ২০০৩ সাল থেকে যুদ্ধের কারণে অঞ্চলটিতে চরম মানবিক বিপর্যয় বিদ্যমান।

দিরিইয়াহ : সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের নিকটবর্তী শহর।

দেইর ইয়াসিন : ফিলিস্তিনের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম। এটি জেরুজালেম থেকে পশ্চিমে অবস্থিত।

দেবল : পাকিস্তানের বৃহত্তম নগরী করাচীই তখন দেবল নামে পরিচিত ছিল।

দুমাতুল জানদাল : আধুনিক সউদি আরবের আল-জাওফ প্রদেশের একটি নগরী।

নজদ : আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগে অবস্থিত বিস্তৃত টিলাবিশিষ্ট অঞ্চল। পশ্চিমে হিজায হতে পূর্বে দাহনা মরুভূমি পর্যন্ত এবং দক্ষিণে হায়ান থেকে উত্তরে নাফুদ মরুভূমি পর্যন্ত নজদের বিস্তৃতি।

নাখলা : মক্কা ও তায়েফের মধ্যে অবস্থিত একটি স্থানের নাম নাখলা। এই অভিযানে যৎসামান্য সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

নুবিয়া : মিশরের দক্ষিণাঞ্চল ও সুদানের উত্তরাঞ্চল তথা নীলনদের পূর্ব তীরে অবস্থিত মিশরের আসওয়ান নগরী হতে সুদানের দক্ষিণ খার্তুম পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম নুবিয়া। আধুনিক সুদানের অধিকাংশ এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নাফার : নাফার রাষ্ট্রের অবস্থান ছিল আধুনিক মানচিত্রের বাসকিউ অঞ্চলজুড়ে। প্রায় বিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের বাসকিউ অঞ্চল (The Basque Country) স্পেন ও ফ্রান্সের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। অঞ্চলটি দীর্ঘদিন যাবৎ স্পেন ও ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য আন্দোলন করে আসছে।

নিকিয়া : আরবিতে نِيْقِيَة (নিকিয়া), ইংরেজিতে Nicaea (নিকায়া) এশিয়া মাইনর অঞ্চলের পশ্চিম উপকূলে মর্মর সাগরের নিকটে অবস্থিত সুপ্রাচীন একটি নগরী। আধুনিক তুরস্কের বুরছা প্রদেশে অবস্থিত অঞ্চলটির বর্তমান নাম ইজনিক (İznik)। ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টধর্মের প্রথম সর্বজনীন মহাসভা নিকিয়াতে অনুষ্ঠিত হয় বলে খ্রিষ্টধর্মীয় ইতিহাসে নগরীটির বিশেষ অবস্থান রয়েছে।

নীলনদ : আফ্রিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদ। বিশ্বের দীর্ঘতম নদও বলা হয় একে। যদিও ব্রাজিল দীর্ঘতম হিসেবে অ্যামাজন নদীকে দাবি করে। নীলনদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৬৫০ কি. মি.। আফ্রিকায় মোট এগারোটি দেশ তথা তানজানিয়া, উগান্ডা, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, কঙ্গো, কেনিয়া, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, দক্ষিণ সুদান, সুদান ও মিশরে প্রবাহিত হচ্ছে নীলনদের পানি। তবে বিশাল মরুভূমি অঞ্চল সুদান ও মিশরের পানির মূল উৎস এই নদ বিধায় এ দুটি দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে নীলনদের নাম অধিক উচ্চারিত হয়। নীলনদের দুটি উপনদ রয়েছে : শ্বেত নীলনদ ও নীলাভ নীলনদ। শ্বেত নীলনদ দীর্ঘতম। এর উৎপত্তি আফ্রিকার মধ্যভাগের হ্রদ

অঞ্চল থেকে এবং নীলাভ নীলনদের উৎপত্তি টানা হ্রদ থেকে যা ইথিওপিয়ায় অবস্থিত।

সুদানের দক্ষিণাঞ্চল দিয়ে শ্বেত নীলনদ এবং পূর্বাঞ্চল দিয়ে নীলাভ নীলনদ প্রবাহিত হয়ে সুদানের রাজধানী খার্তুমে এসে মিলিত হয়ে দেশটির উত্তরাঞ্চল দিয়ে মিশরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। মিশরের দক্ষিণাঞ্চল থেকে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার অতিক্রম করে নীলনদ দেশটির উত্তরাঞ্চলে নদী মোহনায় বিশাল ব-দ্বীপ সৃষ্টি করে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে।

নীলনদের প্রবাহ সম্পূর্ণ মানচিত্র লিংক : https://bit.ly/3kgnTkC

ফাদাক : খায়বারের নিকটবর্তী একটি সবুজ-শ্যামল এলাকার নাম।

ফিলিস্তিন : ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন অঞ্চল মূলত শাম অঞ্চলেরই একটি অংশ। তবে ঐতিহাসিক পটভূমিসহ বিভিন্ন গুরুত্ব বিবেচনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকায় অঞ্চলটি আলাদাভাবেও আলোচিত হয়। অতীতে ফিলিস্তিন শব্দটি শাম অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের জন্য ব্যবহৃত হতো। শামের এ অংশটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম অংশে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। সাধারণত ফিলিস্তিন বলে পশ্চিমের ভূমধ্যসাগর হতে পূর্বের মৃত সাগর ও জর্দান নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকে বোঝানো হতো।

বলকান : বলকান অঞ্চল বলতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলকে বোঝায়। এর পূর্বে কৃষ্ণ সাগর, পশ্চিমে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর। দানিয়ুব, সাভা ও কুপা নদীগুলো অঞ্চলটির উত্তর সীমানা নির্ধারণ করেছে। বুলগেরিয়া থেকে পূর্ব সার্বিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বলকান পর্বতমালার নামেই অঞ্চলটির নামকরণ হয়েছে।

বাগদাদ : ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি.-এর খিলাফতকালে মুসলিম বাহিনী যখন ইরাক জয় করে, তখন বাগদাদ ছিল ক্ষুদ্র ও অখ্যাত একটি বসতি। উমর রাযি.-এর খিলাফতকালে ইরাকে কুফা ও বসরার মতো গুরুত্বপূর্ণ দুই নগরীর পত্তন হলেও বাগদাদ পূর্বের ন্যায় ছোট ও সাধারণ বসতিই রয়ে যায়। আল-মানসুর খলিফা হওয়ার পর অনিবার্য বিভিন্ন কারণে নতুন দারুল খিলাফাহ ও রাজধানী প্রতিষ্ঠার মনস্থ করেন। তিনি নতুন রাজধানীর স্থান নির্বাচনের জন্য কুফা হতে মসুল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা ভ্রমণ করে অবশেষে বাগদাদ এলাকাকে পছন্দ করেন।

বাগদাদকে পছন্দ করার কারণ ছিল—এর এক দিকে ছিল দজলা নদী আর অপর দিকে ফুরাত নদী। দজলা নদীর মাধ্যমে চীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সহজ ছিল আর ফুরাত নদীর কারণে শাম অঞ্চলের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব ছিল। খলিফা মানসুরের নির্দেশে দজলা নদীর পূর্ব তীরে নির্মিত হয় বাগদাদ নগরী। পরবর্তী সময়ে মানসুর-পুত্র মাহদি নদীর পশ্চিম তীরে সেনাছাউনি স্থাপন করেন এবং ধীরে ধীরে নদীর পশ্চিম তীরও বাগদাদ নগরীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত অংশের নামকরণ করা হয় 'কারখ' (Karkh) আর পূর্ব তীরে অবস্থিত অংশের নামকরণ করা হয় 'রুসাফা' (Al-Rusafa)। বর্তমানেও এলাকা-দুটির এই নামই প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, জনৈক পারস্য সম্রাট তার আস্থাভাজন এক ক্রীতদাসকে উক্ত এলাকা জায়গির হিসেবে দান করেছিলেন। উক্ত ক্রীতদাস 'বাগ' নামক একটি মূর্তির পূজা করত। জায়গির প্রাপ্ত হওয়ার পর সে বলে ওঠে, 'বাগদাদ!' (বাগপ্রদত্ত); অর্থাৎ আমার মূর্তি বাগ আমাকে এ এলাকাটি দান করেছে। এভাবেই এলাকাটির নাম হয়ে যায় বাগদাদ। খলিফা মানসুর প্রাচীন সেই ছোট্ট বসতির স্থানে রাজধানী নগরী নির্মাণ করার পর এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন 'মদিনাতুস সালাম' বা শান্তির নগরী।

বাজার্ট : তিউনিসিয়ার অন্তর্গত একটি শহর।

বারকা : বর্তমান লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলকে বারকা বলা হতো। ইংরেজিতে অঞ্চলটির নাম Cyrenaica।

বেসারাবিয়া : বর্তমান মোলদাভিয়া প্রজাতন্ত্র, ইউক্রেনের কিছু অংশ এবং রোমানিয়া প্রজাতন্ত্রের দুবরুজা অঞ্চল নিয়ে গঠিত প্রাচীন একটি অঞ্চল।

বুওয়াত : মদিনা হতে শাম যাওয়ার পথে জুহায়না অঞ্চলের একটি পাহাড়ের নাম।

বুছরা ও বসরা : ভিন্ন দুটি নগরীর নাম। বুছরা (بصرى) বর্তমান সিরিয়ার অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক নগরী। সিরিয়ার রাজধানী দামেশক হতে এর দূরত্ব প্রায় ১৪০ কিলোমিটার। বুছরা তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। অপরদিকে বসরা (البصرة) হলো বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত ইরাকের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী। দ্বিতীয় খলিফা

উমর রাযি.-এর খিলাফত আমলে বিখ্যাত বদরি সাহাবি উতবা বিন গাযওয়ান রাযি. বসরা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরবর্তী ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে বসরার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জ : আন্দালুসের পূর্ব উপকূলে ভূমধ্যসাগরের বুকে বেশ কয়েকটি দ্বীপ আছে, যেগুলোকে ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জ (Balearic Islands) বলা হয়। এসব দ্বীপের মধ্যে সামরিক কৌশলগত দিক থেকে তিনটি দ্বীপের অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; মায়োর্কা (Palma de Mallorca), ম্যানোর্কা (Menorca) ও ইবিজা (Ibiza) দ্বীপ। প্রাচীন আরবি উৎস-গ্রন্থসমূহে এসব দ্বীপকে 'প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ভার্না : বুলগেরিয়ার কৃষ্ণসাগর উপকূলীয় বন্দর নগরী।

ভ্যানল্যাক : তুরস্কের সবচেয়ে বড় লেক। আনাতোলিয়ার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত।

মাওয়ারাউন নাহার : মধ্য এশিয়ার একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম মাওয়ারাউন নাহার বা ট্রান্সঅক্সিয়ানা (Transoxiana)। এর বিস্তৃতি পশ্চিমে মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম ও বিখ্যাত নদী আমু দরিয়া হতে পূর্বে মধ্য এশিয়ার আরেক বিখ্যাত নদী সির দরিয়া পর্যন্ত। আধুনিক রাষ্ট্রসীমার উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাখস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ও কিরগিজস্তানের দক্ষিণ অংশজুড়ে ছিল অঞ্চলটির বিস্তৃতি। মুসলিম অভিযাত্রীগণ খোরাসান থেকে আমু দরিয়া পাড়ি দিয়ে এ অঞ্চল জয় করেন এবং অঞ্চলটিকে মাওয়ারাউন নাহার «بلاد ما وراء النهر» বা 'নদীর ওপারের অঞ্চল' নামে অভিহিত করেন।

প্রথম হিজরি শতকের শেষ দিকে ষষ্ঠ উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের আমলে বিখ্যাত মুসলিম বীর সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম বাহিলি রহ.-এর হাতে অঞ্চলটি বিজিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। বুখারা, সমরকন্দ, বায়কান্দ, ফারাব, ফারগানা, শাশ, তিরমিজ, কাসান, খোয়ারিজম, কাশগর, দাবুসিয়াসহ বিভিন্ন সুবিখ্যাত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র এ অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল।

মাগরিব : বর্তমানে আফ্রিকান রাষ্ট্র মরক্কোকে আরবিতে 'মাগরিব' বলা হলেও অতীতে মাগরিব বলে উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত একটি অঞ্চলকে বোঝানো হতো। বর্তমান মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার যেসব অংশ সুউচ্চ অ্যাটলাস পর্বতমালার উত্তরে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত, সেগুলোকে বলা হতো 'মাগরিব'। ব্যাপকতর অর্থে কেউ কেউ লিবিয়া ও মৌরিতানিয়াকেও এর অন্তর্ভুক্ত ধরতেন। অ্যাটলাস পর্বতমালা ও সাহারা মরুভূমির কারণে মাগরিব অঞ্চলটি ছিল আফ্রিকার বাকি অংশ থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং অতীত ইতিহাসের মাগরিবকে বর্তমান মরক্কোর পরিসরে সীমাবদ্ধ মনে করা ঠিক হবে না।

মাগরিবুল আদনা, মাগরিবুল আওসাত ও মাগরিবুল আকছা : মাগরিব অঞ্চলের পরিচিতি ইতিপূর্বে দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী হতে আরবগণের ভাষা-ব্যবহারে মাগরিব অঞ্চলকে তিন ভাগে বিভক্তিকরণ পাওয়া যায়—

১. (মাগরিবুল আদনা) নিকট-মাগরিব অঞ্চল

২. (মাগরিবুল আওসাত) মধ্য-মাগরিব অঞ্চল ও

৩. (মাগরিবুল আকছা) দূর-মাগরিব অঞ্চল।

মাগরিবুল আদনার বিস্তৃতি ছিল পূর্বে ত্রিপোলি হতে পশ্চিমে বিজায়া নগরী পর্যন্ত; আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় যার অবস্থান লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও পূর্ব আলজেরিয়াজুড়ে। মাগরিবুল আওসাতের বিস্তৃতি ছিল পূর্বে তিয়ারিত নগরী হতে পশ্চিমে মাওলাওয়া নদী (The Moulouya River) ও তাজা (Taza) পর্বতমালা পর্যন্ত; আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় যার অবস্থান আলজেরিয়ার বাকি অংশ ও মরক্কোর কিছু অংশজুড়ে। আর মাগরিবুল আকছার বিস্তৃতি ছিল পূর্বে মাওলাওয়া নদী হতে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত; আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় যার অবস্থান মরক্কো রাষ্ট্রজুড়ে।

মাদায়েন : বর্তমান বাগদাদ থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত সালমান পাক (Salman Pak) নামক এলাকায় ছিল তৎকালীন মাদায়েন বা টেসিফোন নগরী।

মারজদাবেক : সিরিয়ার আলেপ্পোর নিকটবর্তী একটি স্থান।

মিশর : মানবজাতির ইতিহাসে অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা হচ্ছে মিশরকেন্দ্রিক সভ্যতা। মিশরের অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে। অবশ্য মিশরের সিনাই উপদ্বীপ অংশটুকু এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অধীনে থাকার পর ডিক্টেটর জুলিয়াস সিজারের আমলে (শাসনকাল : খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯-৪৪ সন) মিশর রোমানদের অধিকারে আসে। সুপ্রাচীন সভ্যতা ও জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ মিশর রোমানদের হাতে আসার পর তারা এর উন্নতিতে মোটেও নজর দেয়নি। রোমান রাজপরিবারের কাছে মিশর ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের চাহিদা পূরণে একটি শস্য-ঝুড়িমাত্র! রোমান সম্রাট তার একজন প্রতিনিধিকে গভর্নর হিসেবে মিশরে প্রেরণ করতেন আর উক্ত গভর্নর আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করে পুরো মিশরের আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়াদি দেখাশোনা করত। গভর্নরকে সরাসরি রোমান সম্রাটের কাছে আর্থিক হিসাব প্রদান করতে হতো। গভর্নরদের মেয়াদ হতো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তাই তারা মিশরের উন্নতির চিন্তা বাদ দিয়ে নিজেদের আখের গোছানোতেই বেশি ব্যস্ত থাকত। মিশরের জনগণকেও নিজেদের অঞ্চলের উন্নয়নে কাজ করার বা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো না। এসব কারণে জনগণ মাঝেমধ্যেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত এবং বিদ্রোহের চেষ্টা করত। তখন মিশরের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োজিত রোমান বাহিনী তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করত। রোমান শাসনে থাকা অবস্থায়ই মিশরে খ্রিষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে।

মেসোপটেমিয়া : দজলা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী সুবিস্তৃত একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম। আধুনিক ইরাক, সিরিয়ার উত্তরাংশ, তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল এবং ইরানের খোজিস্তান প্রদেশ মিলে ছিল তৎকালীন বিলাদুর রাফিদাইন বা মেসোপটেমিয়া (Mesopotamia)।

মেসোপটেমিয়ার উত্তর অংশকে বলা হতো জাযিরাতুল ফুরাত (সংক্ষেপে জাযিরা) বা মেসোপটেমিয়া উচ্চভূমি (Upper Mesopotamia)।

মাহদিয়া : তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিস থেকে ২০৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি উপকূলীয় নগরী। প্রথম উবায়দি শাসক

উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি নগরীটির পত্তন করেন এবং একে উবায়দি সাম্রাজ্যের রাজধানী নির্ধারণ করেন।

মোম্বাসা : কেনিয়া উপকূলের একটি শহর। রাজধানী নাইরোবির পর এটি দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।

রামলা ও রামাল্লা : দুটি ভিন্ন নগরীর নাম। রামলা (Ramla) বর্তমান অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক নগরী, যা আল-কুদস হতে ৩৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অপরদিকে রামাল্লা (Ramallah) (জর্দান নদীর) পশ্চিম তীরে অবস্থিত ফিলিস্তিনের প্রধান প্রশাসনিক নগরী। এর অবস্থান আল-কুদস থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে।

লরেইন : আলজাস সংলগ্ন ফ্রান্সের আরেক প্রদেশ।

শাম : বর্তমানে যদিও আধুনিক সিরিয়াও শাম নামে পরিচিত; কিন্তু প্রাচীন শাম একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম, যার বিস্তৃতি ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর হতে মেসোপটেমিয়া অঞ্চল পর্যন্ত। বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন (ইসরাইল অধিকৃত অঞ্চলসহ পশ্চিম তীর ও গাজা) এবং আধুনিক সউদি আরবের আল-জাওফ প্রদেশ ও উত্তর সীমান্ত অঞ্চল শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও ১৯২১ সালে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত আঙ্কারা চুক্তি অনুযায়ী বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের যেসব এলাকা তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেগুলোও ঐতিহাসিক শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুরস্কের সানজাকে ইসকানদার (The Sanjak of Alexandretta) অঞ্চলও শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও বর্তমান মিশরের সিনাই উপদ্বীপ ও বর্তমান ইরাকের মসুল অঞ্চলের কিছু অংশ শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একদল ঐতিহাসিকের মতে পুরো সিনাই উপদ্বীপ ও সাইপ্রাসও ঐতিহাসিক শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শারকাসিয়া : শারকাস বলা হয় ককেশাসের উত্তরাঞ্চলের আদিগা, চেচনিয়া, আভারস এবং লাযজিনের অধিবাসীদেরকে। তাদের আবাসস্থলকেই বলা হতো শারকাসিয়া।

সরনদ্বীপ : বর্তমানে শ্রীলঙ্কা নামে পরিচিত দ্বীপরাষ্ট্রটিই হলো অতীতের সরনদ্বীপ। অঞ্চলটি সিলন নামেও পরিচিত ছিল।

সাওয়াদ : ফুরাতের পূর্ব তীর ও দজলার পশ্চিম তীরের মধ্যে অবস্থিত সুবিস্তৃত সবুজ-শ্যামল গ্রামীণ ভূমিকে সাওয়াদ বলা হতো।

সামান : সমরকন্দের নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম।

সামাররা : বর্তমান বাগদাদ নগরী হতে ১২৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি নগরী। ২২১ হিজরিতে (৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ নগরীটি নির্মাণ করেন। তখন এর নাম ছিল সুররা মান রআ (যে দেখবে, সে-ই আনন্দিত হবে!)। মুতাসিম বিল্লাহ আব্বাসি খিলাফতের দারুল খিলাফাহ বাগদাদ থেকে সামাররায় স্থানান্তর করেন।

সালাহুদ্দিন দুর্গ : মিশরের কায়রোতে আল-মুকাত্তাম পাহাড়ের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত একটি দুর্গ। এটি আল-জাবাল দুর্গ ও কায়রো দুর্গ (The Citadel of Cairo) নামেও পরিচিত। প্রথম আইয়ুবি সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি দুর্গটির নির্মাণকাজ শুরু করেন আর পঞ্চম আইয়ুবি সুলতান আল-কামিলের হাতে এর নির্মাণ সমাপ্ত হয়। আল-কামিলের শাসনকাল থেকে পরবর্তী ছয় শতকের অধিক কাল ধরে সালাহুদ্দিন দুর্গই ছিল মিশর শাসকের সরকারি বাসভবন। সালাহুদ্দিন দুর্গকে মধ্যযুগে নির্মিত অন্যতম দুর্ভেদ্য সামরিক দুর্গ মনে করা হয়।

সিউটা : জিব্রালটার প্রণালির তীরে অবস্থিত মরক্কোর একটি নগরী, যা বর্তমানে স্পেন জবরদখল করে রেখেছে। মরক্কোর আরও একটি বন্দর-নগরী ম্যালিলাও স্পেনের দখলে রয়েছে। আরবিতে 'সিউটা' নগরীকে 'সাব্তাহ' (سبتة) এবং তাঞ্জিয়ারকে 'তানজাহ' (طنجة) বলা হয়।

সিদোন (স্থানীয় ভাষায় সাইদা) : লেবাননের তৃতীয় বৃহত্তম শহর।

সিফফিন : রোমান আমলে প্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন একটি জনপদ। আধুনিক সিরিয়ার রাক্কা নগরীতে ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে ছোট্ট এই জনপদটির অবস্থান।

সুসতার : বর্তমান ইরানের খোজিস্তান প্রদেশের অন্তর্গত আহওয়ায নগরীর উত্তরে অবস্থিত একটি নগরীর নাম সুসতার (Shushtar)। ফার্সিতে নগরীটির নাম شوشتر (শুশতার), আর আরবিতে تُستَر (তুসতার)।

হাইল : নজদের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত সৌদি আরবের একটি শহর।

হাবশা : আরব উপদ্বীপ হতে সরাসরি দক্ষিণে অবস্থিত একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল হাবশা বা আবিসিনিয়া। বর্তমান ইরিত্রিয়া, উত্তর ইথিওপিয়া, সোমালিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ, জিবুতি, মিশরের দক্ষিণাঞ্চল, সুদানের পূর্বাঞ্চল ও ইয়ামেনজুড়ে এর বিস্তৃতি ছিল।

হামরাউল আসাদ : মদিনা হতে প্রায় বারো কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহরতলির নাম।

হিজায : উপদ্বীপের পশ্চিম অংশে অবস্থিত সারাত পর্বতমালা অধ্যুষিত অঞ্চল। হিজায অঞ্চল নজদের টিলাবিশিষ্ট অঞ্চলকে তিহামা হতে পৃথক করে রেখেছে।

* * *

তথ্যপঞ্জি

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া—ইবনু কাসির

২. আত-তারিখুল ইসলামি—মাহমুদ শাকির

৩. তারিখু ইবনি খালদুন—আবদুর রহমান বিন খালদুন

৪. আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম—আবু বকর ইবনুল আরাবি

৫. ফাতহুল বারি শরহু সহিহিল বুখারি—ইবনে হাজার আসকালানি

৬. আল-কামিল ফিত-তারিখ—ইবনুল আসির

৭. ফুতুহুশ শাম—ওয়াকিদি

৮. হুরুবুর রিদ্দাহ—মুহাম্মাদ আহমাদ বাশামিল

৯. কাদিসিয়া ও মাআরিকুল ইরাক—মুহাম্মাদ আহমাদ বাশামিল

১০. আল-খিলাফাতু ওয়াল খুলাফাউর রাশিদিন বাইনাশ শুরা ওয়াদ দিমুকরাতিয়্যা—সালিম ভানসাভি

১১. তারিখুল খুলাফা—জালালুদ্দিন আবদুর রহমান আস-সুয়ুতি

১২. ইমবারাতুরিয়্যাতুল আরব—জন বাজুট জালুব

১৩. ফাতহুল আরব লি-মিশর—ড. আল ফারদাজ বাটলার

১৪. সিলসিলাতুল মাআরিকিল কুবরা ফিল ইসলাম—শাওকি আবু খলিল

১৫. আদ-দাওলাতুল উমাইয়া—মুহাম্মাদ আল-খুদরি বেগ

১৬. আদ-দাওলাতুল আব্বাসিয়া—মুহাম্মাদ আল-খুদরি বেগ

১৭. তারিখু গাজওয়িল আরাবি ফি ফারানসা ওয়া সুয়িসরা ওয়া ইতালিয়া ওয়া জাযায়িরুল বাহরিল মুতাওয়াসসিত—আমির শাকিব আরসালান

১৮. কাদাতু ফাতহিল মাগরিবিল আরাবি—মাহমুদ শিত খাত্তাব

১৯. ফাজরুল আন্দালুস—ড. হুসাইন মুনিস

২০. মাওসুআতু তারিখিল আন্দালুস—ড. হুসাইন মুনিস

২১. মায়ার রায়িলিল আওয়াল—আল্লামা মুহিবুদ্দিন আল-খতিব

২২. আল-আদারিসাহ—ড. মাহমুদ ইসমাইল

২৩. শুবহাতু হাওলাল আসরিল আসরিল আওয়াল—ড. মুআইয়িদ ফাজিল

২৪. আখবারু মুলুকি বনি উবাইদ ওয়া সিরাতুহুম—আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আলি বিন হাম্মাদ

২৫. আত-তারিকু ইলাল কুদস—ড. জামাল আবদুল হাদি

২৬. খালিদ বিন ওয়ালিদ—মুহাম্মাদি সাদিক উরজুন

২৭. জাওলাতুন তারিখিয়াতুন ফি আসরিল খুলাফায়ির রাশিদিন—ড. মুহাম্মাদ সাইয়িদ ওয়াকিল

২৮. কিতাবুল মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার—তাকিউদ্দিন মাকরিজি

২৯. তারিখুদ দাউলাতিল ফাতিমিয়্যা—ড. মুহাম্মাদ জামালুদ্দিন সুরুর

৩০. আলগাজউস সালিবি ওয়াল আলামুল ইসলামি—ড. আবদুল হালিম মাহমুদ

৩১. মাওসুয়াতুত তারিখিল ইসলামি—ড. আহমাদ শালবি

৩২. কাসামাতুল আলামিল ইসলামি—মোস্তফা মুমিন

৩৩. আল-আলামুল ইসলামি—মাহমুদ শাকির

৩৪. আতলাসু তারিখিল ইসলাম—ড. হুস্যাইন মুনিস

৩৫. আল-ইসলাম ওয়া হারাকাতুত তারিখ—আহমাদ আনওয়ার জুনদি

৩৬. হাজিরুল আলামিল ইসলামি—আল-মারকাজুল আলামি লিল কিতাবিল ইসলামি

৩৭. আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া— ড. জামাল আবদুল হাদি এবং অন্যান্য

৩৮. মিন রাওয়ায়ি হাজারাতিনা—ড. মোস্তফা সিবায়ি

৩৯. জাওয়ানিবুন মুজিয়াতুন ফি তারিখিল উসমানিয়িনাল আতরাক—জিয়াদ আবু গানিমাহ

৪০. আস-সুলতানু আবদুল হামিদ ওয়াল খিলাফাতুল ইসলামিয়াহ—আনওয়ার জুনদি

৪১. সুক্কানুল আলামিল ইসলামি—মাহমুদ শাকির

৪২. তুরাসুল আরাবিল ইলমি ফির রিয়াজিয়াতি ওয়াল ফালাক—কাদরি হাফিজ তুকান

৪৩. মুআমালাতু গাইরিল মুসলিমিন ফি দাওলাতিল ইসলামিয়াহ—ড. নারিমান আবদুল করিম

৪৪. আত-তাসামুহু ফিল ইসলামি—ড. শাওকি আবু খলিল

৪৫. মারিকাতুত তাবশিরি ওয়াল ইসলাম—ড. আবদুল জলিল শালবি

৪৬. গাইরুল মুসলিমিনা ফিল মুজতামায়িল ইসলামি—ড. ইউসুফ আল-কারজাভি

৪৭. মাজমুয়াতুর রাসায়িলি—শহিদ হাসানুল বান্না

৪৮. আরবাউনা সাবাবান ফি সুকুতিল আন্দালুস—ড. আবদুল হালিম উইস

৪৯. আসবাবুদ দুফি ফিল উম্মাতিল ইসলামিয়াহ—ড. মুহাম্মাদ সাইয়িদ ওয়াকিল

৫০. রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াতি ফিল ইসলামি—আবুল হাসান আলি নাদাবি

৫১. মালামিহু মিন হাজারাতিনাল আলামিয়াতি ওয়া আলামুহাল মুসলিমিন—ড. কারিম সাইয়েদ গানিম

৫২. হাজিরুল আলামিল ইসলামি—লর্ড সোদার্দ আমেরিকা

৫৩. তালিকুল আমির—শাকিব আরসালান

৫৪. মাজা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন—আবুল হাসান আলি নাদাবি

৫৫. তারিখু মিশর ইলাল ফাতহিল উসমানি—উমর ইসকান্দারি

৫৬. মানহাজুস সুন্নাতি ফিল আলাকাতি বাইনাল হাকিম ওয়াল মাহকুম—ড. ইয়াহইয়া ইসমাইল

৫৭. সিরাতুল ইমামিল আহমাদ ইবনি হাম্বল—আবুল ফজল সালিহ আহমাদ বিন হাম্বল

৫৮. আল-হারাকাতুল বাতিনিয়্যাতু ফিল আলামিল ইসলামি—ড. মুহাম্মাদ আহমাদ আল খতিব

৫৯. আল-মাওসুয়াতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদয়ান ওয়াল মাজাহিবিল মুআসিরাহ—আন-নাদওয়াতুল আলামিয়াহ লিশশাবাবিল ইসলামিয়াহ

৬০. তারিখুল মাজাহিবিল ইসলামিয়্যাহ—ইমাম মুহাম্মাদ আবু যাহরাহ

৬১. ফিরাকুন মুআসিরাতুন তুনতাসাবু ইলাল ইসলাম—গালিব বিন আলি আওয়াজি

৬২. নিসাউন মুমিনাতুন—ড. ইউসুফ কারজাবি

৬৩. আল-মুজতামাউল ইসলামিউল মুআসিরাহ বিআফরিকিয়া—ড. জামাল আবদুল হাদি

৬৪. আল ইসলামুল ফাতিহ—ড. হুসাইন মুনিস

৬৫. বাইনাল আকিদাতি ওয়াল কিয়াদাতি—মাহমুদ শিত খাত্তাব

৬৬. তারিখুদ দাওলাতিল উলিয়্যাতিল উসমানিয়াহ—মুহাম্মাদ ফরিদ বেগ

৬৭. আল-হাজারাতুল ইসলামিয়াতু মুকারানাতান বিল হাজারাতিল গারবিয়াহ— ড. তাওফিক ওআয়ি

৬৮. ফি হিওয়ারি হাওলাল হাজিরি বিলমাজি আবরাল আন্দালুস—ড. রুশদি ফিকার

৬৯. দিরাসাতুন লিসুকুতি সালাসিনা দাওলাতান ইসলামিয়াহ—আবদুল হালিম উওয়াইস

৭০. খুলাসাতু তারিখিত তাশরিয়িল ইসলামি—আবদুল ওয়াহহাব খালাফ

৭১. হাজমাতুন মুজাদ্দাতুন ফি তারিখিল ইসলামি—ড. ইমাদুদ্দিন আবু খলিল

৭২. মাওসুয়াতু সাফিরিন লিততারিখিল ইসলামি

৭৩. মুজামুল বুলদান—ইয়াকুত হামাবি

৭৪. শামসুল আরাবি তাসতাউ আলাল গারবি—সিগরিদ হোংকে

৭৫. আল-মানহাজু ফি কিতাবাতিল গারবিয়িন আনিত তারিখিল ইসলামি—ড. আবদুল আজিম মাহমুদুদ দিব

৭৬. কাইফা নাকতুবুত তারিখাল ইসলামি—মুহাম্মাদ কুতুব

৭৭. সাকাফাতুদ দায়িয়াহ—ড. ইউসুফ কারজাবি

।। **পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত** ।।

৫ম খণ্ড

ইসলামপূর্ব যুগ থেকে নিকট অতীত

ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

অনুবাদ : আবু তালহা সাজিদ
শিহাবুদ্দীন খান

